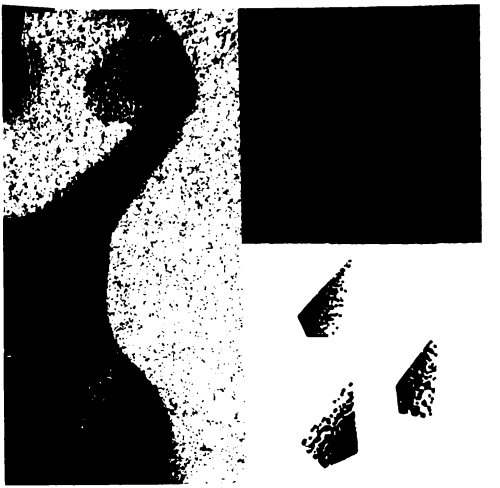

অলাতচক্র

উৎসর্গ

আমার জার্মান বন্ধু

পিটার জেবিৎসকে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ ॥ প্রকাশক : মুক্তধারা, ঢাকা

১

আমি যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছলাম, সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। মনুমেন্টের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নামছে। রবীন্দ্রসদনের এদিকটাতে মানুষজন গাড়িঘোড়ার উৎপাত অধিক নয়। মহানগর কলকাতার এই বিশেষ স্থানটি অপেক্ষাকৃত শান্ত নিরিবিলি। বিশেষ করে এই ক্ষণটিতে, যখন গোধূলির সঙ্গে বিদ্যুতের আলোর দৃষ্টি বিনিময় হয়।

ঝাঁকড়া গাছগুলোর ছায়া রাস্তার ওপর বাঁকা হয়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে নগর কাকের কয়েকটি জলসা চোখে পড়ল। পরিবেশের প্রভাব বলতে হবে। বায়সকুলের সমবেত কাংসাধ্বনিও মোলায়েম কর্কশতাবর্জিত মনে হয়। ট্রাফিকের মোড়টা বাঁয়ে রেখে পি. জি. হাসপাতালে ঢোকার পর মনে হল, লাল ইটের তৈরি কমপ্লেক্স বিল্ডিং আমাকে আস্ত গিলে খাওয়ার জন্য যেন উদ্যত হয়ে রয়েছে।

হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ারের সময় শেষ হয়ে আসছে। মানুষজন চলে যেতে শুরু করেছে। আমার কর্তব্য কী ঠিক করতে না পেরে কম্পাউন্ডের প্রাচীরঘেঁষা নিমগাছটির তলায় দাঁড়িয়ে একটা চারমিনার জ্বালালাম। আমি একজনের খোঁজ করতে এসেছি। কিন্তু জানিনে কোন ওয়ার্ডে কত নম্বর বেডে আছে। তার ওপর নতুন জায়গা এবং আমি পরিশ্রান্ত। সুতরাং সিগারেট খেয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হল।

এই যে দাদা আগুনটা দেবেন? একজন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলল। গায়ে হাসপাতালের ইউনিফরম। আমার যা অবস্থা মনে হল অকূলে কূল পেয়ে গেলাম। মানুষটা লম্বাটে, বাঁ চোখটা একটু ট্যারা। দারোয়ান হতে পারে, ওয়ার্ডবয় হতে পারে, আবার মেল নার্স হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি ম্যাচ জ্বালতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিল লোকটি। আহা শুধুশুধু একটা কাঠি নষ্ট করবেন কেন? দিন না সিগারেটটা। আমার হাত থেকে আধপোড়া সিগারেটটি নিয়ে লোকটি নিজের সিগারেট জ্বালাল।

ভাগ্যটা যে ফর্সা একথা মানতেই হবে। না চাইতে হাসপাতালের একজন কর্মী মানুষ পেয়ে যাওয়ায় মনে হল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি জিগগেস করলাম, আচ্ছা

দাদা, আপনি কি এই হাসপাতালের লোক? নাকে মুখে প্রচুর ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করে জানাল, আমি চোদ্দ নম্বর ফিমেল ওয়ার্ডে আছি। তারপর আমার দিকে একটা তেরছা দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, আপনি বুঝি জয়বাংলার মানুষ। আমার জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কাপড়চোপড় মুখভর্তি দাড়ি এসব পরিচয়পত্রের কাজ করল। লোকটা এরই মধ্যে হাতের সিগারেটটি শেষ করে একটুখানি আমার কাছে ঘেঁষে এল। তারপর নিজে নিজেই বলতে থাকল, মশায় আজ সারাদিন কী হ্যাঙ্গামটাই না পোহাতে হল। তিন তিন ব্যাটা অ্যাবসেন্ট। ডবল ডিউটি করতে হচ্ছে। দিন আপনার একখানি চারমিনার। এখখুনি আবার ডাক পড়বে। এমন একটা মোক্ষম মওকা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। পারলে গোটা প্যাকেটটাই দিয়ে দিতাম। আপাতত সেরকম কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়ায় একটি শলাকাতেই আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। লোকটার সিগারেট টানার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। অসন্তুষ্ট বিরক্ত শিশু যেমন মাতৃস্তনে মুখ লাগিয়ে গিসগিসিয়ে টান মারে সেরকম একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হতে চায়। কপালের বলিরেখাগুলো জেগে ওঠে, চোখের মণি দুটো বেরিয়ে আসতে চায়। বোধ হয় আমাকে খুশি করার জন্যই বলল, জানেন দাদা, আমাদের ওয়ার্ডে আপনাদের জয়বাংলার একটি ফিমেল পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। লোকটা এ পর্যন্ত দু দুবার জয়বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করল। কলকাতা শহরের লোকদের মুখে ইদানীং জয়বাংলা শব্দটি শুনলে আমার অস্তিত্বটা যেন কুঁকড়ে আসতে চায়। শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে সবচে সস্তা, সবচে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয়বাংলা স্যান্ডেল। এক হপ্তার মধ্যে যে-গেঞ্জি শরীরের মায়া ত্যাগ করে তার নাম জয়বাংলা গেঞ্জি। জয়বাংলা সাবান, জয়বাংলা ছাতা কতকিছু জিনিস বাজারে বাজারে ছেড়েছে কলকাতার ব্যবসায়ীরা। দামে সস্তা, টেকার বেলায়ও তেমন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ট্যাঁকের দিকে নজর রেখে এ সকল পণ্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিছুদিন আগে যে চোখওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা। এই সকল কারণে খুব ভদ্র অর্থেও কেউ যখন আমাদের জয়বাংলার মানুষ বলে চিহ্নিত করে অল্পস্বল্প বিব্রত না হয়ে উপায় থাকে না।

সে যাকগে। আমি জিগগেস করলাম, আপনার ওয়ার্ডের বাংলাদেশের পেশেন্টটির কী নাম জানেন? নামধাম জানিনে। উনি আছেন উনত্রিশ নম্বর বেডে। বললাম, আমি এসেছি একজন রোগিণীর খোঁজে। কী অসুখ, কোথায় ভর্তি হয়েছে কিছুই বলতে পারব না। আপনি কি এ ব্যাপারে কোনো উপকার করতে পারেন? চারমিনারের অবশিষ্ট সিগারেটগুলো তার হাতে তুলে দিলাম। লোকটা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, চলুন না চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে, উনত্রিশের পেশেন্টটি যদি হয়ে যায়, তা হলে তো পেয়েই গেলেন। উনত্রিশের পেশেন্ট জয়বাংলার অন্য কোনো পেশেন্ট থাকলে সে খবরও হয়তো বলতে পারবে।

পিছে পিছে এল টাইপের একতলা বিল্ডিংটির লনের কাছে এলাম। লোকটি বলল, একটু দাঁড়ান, জিগগেস করে দেখি। চার পাঁচজন মহিলা লনে পায়চারি করছে। সেদিকে লক্ষ্য করেই হাঁক দিল, এই যে জয়বাংলার দিদিমণি। আপনাদের দেশের এক ভদ্দরলোক একজন ফিমেল পেশেন্টের খোঁজ করছেন। দেখুন তো সাহায্য করতে

পারেন কি না। আমি তাকিয়ে দেখলাম, কপালের দিকে সরে আসা চুলের গোছাটি সরাতে সরাতে তায়েবা সুরকি বিছানো পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকে ডাকছ নাকি গোবিন্দদা! আজ্ঞে দিদিমণি আপনাদের জয়বাংলার এক ভদ্দরলোক একজন ফিমেল পেশেন্ট তালাশ করছে। আপনি একটু কথা বলে দেখুন তো।

এতক্ষণে জানা গেল লোকটির নাম গোবিন্দ। তায়েবা এরই মধ্যে তার পুরোনো সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারটি চালু করে ফেলেছে দেখছি। আমার চোখে চোখ পড়তেই তায়েবার চোখ জোড়া আনন্দে চকচক করে উঠল। পিঠের ওপর ঢলের মতো নেমে আসা ছড়ানো চুলের রাশিতে একটা কাঁপন জাগিয়ে বলল, এঁকে কোথায় পেলে গোবিন্দদা। দিদিমণি আপনার অতসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, আমি চললাম। ড. মাইতি আমাকে ওয়ার্ডে না পেলে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। ড. মাইতির কাঁচা খাওয়া থেকে বাঁচার জন্যই গোবিন্দ চলে গেল।

তায়েবাকে দেখাচ্ছে সুন্দর। এই কমাস তার চেহারায় একটা বাড়তি লাবণ্য ফুটেছে। তার পিঠঝাঁপা অবাধ্য চুলের রাশি। চোখে না দেখলে চিনে নিতে কয়েক মিনিট সময় নিত। তায়েবার এমন সুন্দর, সুগঠিত শরীরের কোথায় রোগ ঢুকে তাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে জিগগেস করল, দানিয়েল ভাই, এতদিন আসেননি কেন? সেকথার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন যে? যান আপনার সঙ্গে কোনো কথা নেই। যান চলে যান। পরক্ষণে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এই যে আরতিদি, শিপ্রা, মঞ্জুলিকা, উৎপলা দেখে যাও কে এসেছে। তায়েবাকে কোনোদিন বুঝতে পারিনি। বোঝার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছি। পায়ে পায়ে চারজন নারীমূর্তি এগিয়ে এল এবং আমার মনে একটা খারাপ চিন্তা জন্ম নিল। এ সমস্ত মহিলা রোগ সারাতে হাসপাতালে এসেছে না বিউটি কম্পিটিশন করতে এসেছে। তায়েবা বলল, আসুন আরতিদি পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন দানিয়েল ভাই, ভীষণ প্রতিভাবান মানুষ। এস. এস. সি. হতে এম. এ. পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছেন। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাবার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল, তাই। আর আরতিদির বাড়ি ছিল আপনাদের চাটগাঁয়ে। আমার পাশের কেবিনে থাকেন। এ হচ্ছে শিপ্রা গুহঠাকুরতা। বরিশালের বানারী পাড়ার মেয়ে। আর যে মঞ্জুলাকে দেখছেন তারও আসল বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। পোড়ারমুখী তিন বছর ধরে এই হাসপাতালে ডেরা পেতে আছে। অবশেষে উৎপলার হাত ধরে বলল, এর পরিচয় আপনি জানতে পারবেন না। ওর সাতপুরুষের কেউ কস্মিনকালেও পদ্মার হেপাড়ে যায়নি। একেবারে জাত ঘটি তার ওপর আবার ব্রাহ্মণকন্যা। এখন ঠেকায় পড়ে এই মেলেচ্ছনির সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হচ্ছে। রাত্রিবাস শব্দটি এমন এক বিশেষ ভঙ্গিসহকারে উচ্চারণ করল সকলে হো হো করে হেসে উঠল। এই ঘটা করে পরিচয় করানোটা যে আমার ভালো লাগেনি তায়েবার অজানা থাকার কথা নয়। তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে দেখানোর ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। কিন্তু আজকের বাড়াবাড়িটা সমস্ত সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। জীবনে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড কোনোদিনই হতে পারিনি। একবার উত্তীর্ণ ছাত্রমণ্ডলীর তালিকায় ওপরের দিক থেকে লাস্ট এবং শেষের দিক থেকে ফার্স্ট

হয়েছিলাম। গোটা ছাত্রজীবনে সাফল্যের সেই ধারাটিই আমি মোটামুটিভাবে রক্ষা করে আসছি। এজন্য আফসোসও নেই। বরঞ্চ পরীক্ষায় যারা ভালোটালো করে, তাদের প্রতি রয়েছে আমার মুদ্রাগত আক্রোশ। মুখে সাত আট দিনের না-কামানো দাড়ি। পায়ে জয়বাংলা চপ্পল, জামাকাপড়ও তেমনি। অনাহার অর্ধাহার অনিদ্রার ছাপ মুখে ধারণ করে আমি জয়বাংলার মূর্তিমান শিলাস্তম্ভে পরিণত হয়েছি। এটাই আমার বর্তমান, এটাই আমার অস্তিত্ব। এই কলকাতা শহরে অনেক মানুষ আমাদের সমাদর করেছে, আশাতীত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছে, অনেকে হেলাফেলাও করেছে। ভালো লাগুক, খারাপ লাগুক সব নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। কিন্তু তায়েবার আজকের আচরণ আমার কাছে একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা বলে মনে হল। তার ঠিকানা সংগ্রহ করে হাসপাতাল অবধি আসতে আমাকে কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে! পারলে মুখে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সোজা পা ঘুরিয়ে ফেরত চলে যেতাম। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া শরীরে মনে এতদূর ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত ছিলাম যে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় আনকোরা একটি অভাবিত নাটক জমিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

তায়েবা আমাকে তার কেবিনে নিয়ে গেল। দুটো মাত্র খাট, পানির বোতল, গ্লাস ইত্যাদি রাখার একটা কাঠের স্ট্যান্ড, স্টিলের একটা মিটসেফ জাতীয় বাক্স, যেখানে প্রয়োজনমতো কাপড়চোপড় রাখা যায় এবং ভিজিটরদের জন্য একটি টুল ... এই হল আসবাবপত্তর। তায়েবা বিছানায় উঠে বালিশটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমাকে টুলটা দেখিয়ে বলল, বসুন। জানেন তো ভিজিটরদের রোগীর বিছানায় বসতে নেই। তা ছাড়া আপনার পায়ে সব সময়ে রাজ্যের ময়লা থাকে, কোনো সুস্থ মানুষও যদি আপনাকে বিছানায় বসতে দেয়, পরে পস্তাতে হয়। কথাটা সত্যি। তায়েবারা গেন্ডারিয়ার বাসায় আমাকে কোনোদিন সরাসরি বিছানায় বসতে দেয়নি। আমি বাসায় গেলে, আগেভাগে আরেকটি চাদর বিছিয়ে দিত। তারপর আমি বসতাম। এভাবে খাটজোড়া ধবধবে শাদা চাদরের অকলঙ্ক শুভ্রতা রক্ষা করা হত।

এই সময়ে হাসপাতালের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। না চাইতেই একটা সুযোগ আমার হাতে এসে গেল। আমতা আমতা করে বললাম, জায়গাটি তো চেনা হল, আরেকদিন নাহয় আসা যাবে। আজ চলি। যতই মৃদুভাবে বলিনা কেন, আমার কথাগুলোতে রাগ ছিল, ঝাঁঝ ছিল। এটুকু না বুঝতে পারার মতো বোকা নিশ্চয়ই তায়েবা নয়। সে শশব্যস্তে বলল, সেকী, কতদিন পরে এলেন, এখখুনি চলে যাবেন? বসুন, দুচারটা কথাবার্তা বলি। আমি বললাম, শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন যাওয়াই উত্তম। তায়েবা শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, সেজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি মাইতিদাকে বলে সব ম্যানেজ করে নেব। আমি স্পষ্টতই অনুভব করলাম, আমার বুকের ভেতরে ঈর্ষার একটা কুটিল রেখা। জানতে চাইলাম, মাইতিদাটি কে? জবাবে বলল মাইতিদা হচ্ছে ড. মাইতি। অসম্ভব ভালো মানুষ কিন্তু বাইরে ভদ্রলোক ভীষণ কড়া। একটু পরেই আসবেন, আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন কী সুন্দর মন। তার কথায় আমি স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলাম। দোহাই তায়েবা উদ্ধার করো। দিদিমণিদের সামনে তুমি আগে একটা সার্কাস দেখিয়ে ফেলেছ। আরো একটা সার্কাস তুমি তোমার মাইতিদার সামনে দেখাবে বলে যদি মনস্থ করে থাক, আমি তাতে

রাজি হতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমি চলি। সুন্দর মনের মানুষদের নিয়ে তুমি থাকো। তোমার সুন্দর মনের মানুষদের গুণপনা এই সময়ে গোটা কলকাতা জেনে ফেলেছে।

তায়েবা হঠাৎ সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আপনি আমার অসুখের সংবাদ নিতে এসেছেন, নাকি যেসব কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে, সেগুলো পাঁচ কাহন করে বলতে এসেছেন। চলে যান, আপনি এখখুনি চলে যান। একখানা লাউড স্পিকার ভাড়া করে আমার লোকদের কথা কলকাতা শহরে ঘটা করে প্রচার করুন। ভাড়ার টাকা আমি দেব। এই আচমকা বিস্ফোরণে আমি দমে গেলাম। টুলটা নেড়ে বিছানার কাছে এসে বসতে বসতে বললাম, তুমি এই মহিলাদের সামনে আমাকে এমনভাবে অপমানটা করলে কেন? কই অপমান করলাম, কোথায় অপমান করলাম? মনটা আপনার অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই যে বললে প্রতি বছরে আমি ফার্স্ট হয়ে আসছি। বারে, অন্যায় কী করেছি। আপনি তো অনেক কাজ করে পড়াশোনা করেন। সব ছেড়েছুড়ে একটুখানি মন লাগালে আপনিও অনায়াসে ফার্স্টটাস্ট কিছু একটা হতেন। আর যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তারা আপনার চাইতে ভালো কিসে? নিজের তারিফ শুনতে কার না ভালো লাগে। মনের উষ্মার ভাবটি কেটে গেল। আমি হাসিমুখে বললাম, আর বিলেত যাওয়ার ব্যাপারটি। আরে দূর দূর ওটা একটা ব্যাপার নাকি, আজকাল কুকুর বেড়ালেরাও হরদম বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে। আপনিও চাইলে অবশ্যই যেতে পারেন। তা ছাড়া ...। আমি বললাম, তা ছাড়া আর কী। তা ছাড়া আপনি একটা গেঁয়োভূত। একেবারে মাঠ থেকে সদ্য-আসা একটি মিষ্টি কুমোড়। আমি বললাম, আমি যে মিষ্টি কুমোড় সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কুকুর বেড়ালও বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে একথা সত্যি। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ টিকিট করে ওসব দেশে যেতে হয়। আপনি সব কথার কুষ্ঠিনামা বের করতে চান। চাল বোঝেন চাল? ঐ মেয়েরা প্রতিদিন কথায় কথায় আমার সঙ্গে চাল মারে। আজ নাহয় আমিও একটা চাল মারলাম। আপনি এটুকুও বোঝেন না? তুমি তো পরিচয় করিয়ে দিলে, তোমার দিদি, তোমার সই, তোমার বান্ধবী,—এখন বলছ সব চালবাজ। আমার দিদি, আমার সই, আমার বান্ধবী ঠিক আছে, কিন্তু চাল মারতে অসুবিধেটা কোথায়? আপনি মেয়েদের সম্পর্কে জানেন কচু। সে বুড়ো আঙুলটি উঠিয়ে দেখাল।

শুনুন দানিয়েল ভাই, তায়েবা ঝলমল করে উঠল। সেদিন হাসপাতালে একটি কাণ্ড ঘটে গেছে। এখানকার ধনী ঘরের এক মহিলা সেদিন বিউটি পারলারে গিয়ে ছাতার মতো এক মস্ত খোঁপা তৈরি করিয়ে আনে। বাড়ি আসার পরে কী হল জানেন, মহিলার মনে হল তার মগজের ভেতর কিছু একটা নড়ছে, লাফ দিচ্ছে। এরকম একটা আজগুবি অসুখের কথা কেউ কখনো শোনেনি। সকলের খুব দুশ্চিন্তা। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। কেউ বিশেষ কিছু করতে পারল না। মহিলাকে নাকি স্যার নীলরতন হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। সেখানে ডাক্তারেরা কিছু করতে পারেনি। অবশেষে তাকে একরকম ফেন্ট অবস্থায় এ হাসপাতালে আনা হয়। ডাক্তারেরা স্থির করেন, মহিলার খোঁপাটি খুলে যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখতে হবে মগজের ঘটনাটি কী। সত্যি সত্যি নার্সরা যখন মাথার খোঁপাটি খুলতে লেগে গেল, মহিলা ফেন্ট অবস্থায়ও দুহাত দিয়ে খোঁপা খুলতে বাধা

দিচ্ছে। পরে যখন খোঁপা খোলা হল অমনি এক টিকটিকি বাহাদুর লেজ দুলিয়ে লাফ দিল। খোঁপা বাঁধার কোন ফাঁকে আটকা পড়ে গেছে টের পায়নি। সেই থেকে টিকটিকিটি যতই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, মহিলার মনে হয়েছে, মাথার মগজ খুলি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সত্যি ঘটনা, বুঝলেন মেয়েরা কেমন হয়? আমি বললাম, যতদূর জানি, তুমিও তো একজন মেয়ে, তোমার বিষয়েই বা অন্যরকম হবে কেমন করে। তায়েবা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল, আপনি এখনো মিষ্টি কুমোড়ই থেকে গেছেন। কিছু শিখতে পারেননি।

এই সময়ে ডান হাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে এক ভদ্রলোক কেবিনে প্রবেশ করলেন বয়েস খুব বেশি হবে না। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের কোঠায়। চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ধারালো। চিকন করে কাটা একজোড়া শাণিত গোঁফ। ধারালো চিবুক। একহারা গড়নের চেহারাখানা ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে খোলা তলোয়ারের মতো ঝকঝক করছে। সন্ধ্যার এ আলো-আঁধারিতেও আমার দৃষ্টি এড়াল না। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই যে এদিকে আসুন তো। আমি এগিয়ে গেলে তিনি অনেকটা ধমকের ভঙ্গিতে জিগগেস করলেন, কি-বেল বাজল আওয়াজ শুনতে পাননি? আমি মৃদুস্বরে বললাম, পেয়েছি। পেয়েছেন তো হাসপাতালে বসে আছেন কেন? আপনাদের ঘাড় ধরে বের করে না দিলে শিক্ষা হবে না দেখছি। এই যে মাইতিদা থামুন, থামুন। আমাদের দুজনের মাঝখানে তায়েবা এসে দাঁড়িয়েছে। আপাতত আপনার চোখাচোখা কথাগুলো তুলে টুলে রাখুন। আমি কত বলেকয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়ার জন্য দানিয়েল ভাইকে সেই বিকেল থেকে আটকে রেখেছি। এদিকে আপনি তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছেন। ড. মাইতি স্মিত হেসে বললেন, এই তোমার দানিয়েল ভাই, যিনি ফার্স্ট ছাড়া কিছুই হন না। মশায় আপনার অসাধারণ কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে তো পাগল হবার উপক্রম। অধীর আগ্রহে দিন গুনছি, কখন এসে দর্শনটা দেবেন। শুনেছি মশায়ের কলকাতা আগমনও ঘটেছে, তায়েবার অনেক আগে। যাক ভাগ্যে ছিল, তাই দেখা হল। তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওয়ার্ডে একটা রাউন্ড দিয়ে আসি।

উৎপলা এখনো বাইরে থেকে ফেরেনি। কেবিনে আমরা দুজনা, এই ফাঁকে আমি জিগগেস করলাম, তায়েবা, তোমার শরীর কেমন? কেমন আছ? রোগের অবস্থা কী? তায়েবা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, ওসব কথা থাকুক। আমার শরীর ভালো, আমি ভালো আছি। আমি বললাম, আগরতলা আসার সময় তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা। তোমরা তো আমার সঙ্গে এলে না, কলকাতা এসে খবর পেলাম, তোমরাও আগরতলা এসে একটা ক্যাম্পে উঠেছ। কলকাতায় নানাজনের কাছ থেকে নানাভাবে তোমার খবর পেয়েছি। একজন বলল, তোমাকে তিনদিন পার্ক সার্কাসের কাছে রাস্তা পার হতে দেখেছে। আরেকজন বলল, তুমি সকাল বিকেল তিনটি করে টিউশনি করছ। শেষ পর্যন্ত নির্মল একদিন এসে জানাল, তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কোন হাসপাতাল, কী রোগ কিছুই জানাতে পারল না। তোমার ঠিকানা জোগাড় করতে যেয়ে প্রায় একটা খুনখারাবি বাধিয়ে বসেছিলাম। তায়েবা বলল, সেসব কথাও থাকুক। আপনার খবর বলুন, কোথায় আছেন, কখন এসেছেন? দুবেলা চলছে কেমন করে? বাড়িঘরের খবর পেয়েছেন? আপনার মা বোন এবং ভায়ের ছেলেরা কেমন আছে?

আমার তো বলবার মতো কোনো খবর নেই। তায়েবাকে জানাব কী? কলকাতা শহরে আমরা কচুরিপানার মতো ভেসে ভেসে দিন কাটাচ্ছি, বিশেষ করে মুসলমান ছেলেরা। আমাদের সঙ্গে মা বোন বা পরিবারের কেউ আসেনি। সে কারণে শরণার্থী শিবিরে আমাদের ঠাঁই হয়নি। আমরাও শিবিরের মানুষদের প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে মানে মানে শহরের দিকে ছিটকে পড়েছি এবং কলকাতা শহরে গুলতানি মেরে সময় যাপন করছি। একজন আরেকজনকে ল্যাং মারছি। বাংলাদেশের ফর্সা কাপড়চোপড় পরা অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন বেকারজীবন যাপনের ক্লেদ কলকাতার হাওয়া দূষিত করে তুলছে। আমরা সে হাওয়াতে শ্বাস টানছি। সীমান্তে একটা যুদ্ধ হচ্ছে, দেশের ভেতরেও একটা যুদ্ধ চলছে। অবস্থানগত কারণে আমরা সে ভয়ংকর ব্যাপারটি ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কই? যুদ্ধে চলে গেলে ভালো হত। দেশের স্বাধীনতার কতটুকু করতে পারতাম জানিনে। তবে বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। আমার যুদ্ধে যাওয়া হয়নি। যুদ্ধকে ভয় করি বলে নয়। আমাদের দেশের যে সকল মানুষের হাতে যুদ্ধের দায়দায়িত্ব, তাঁরা আমাকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠাবার যথেষ্ট উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেননি। আমি তিন তিনবার চেষ্টা করেছি। প্রতিবারই মহাপুরুষদের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছে। অবশ্য আমাকে বুঝিয়েছেন, আপনি যুদ্ধে যাবেন কেন? আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষের ইউজফুল কত কিছু করবার আছে। যান কলকাতা যান। সেই থেকে কলকাতায় আছি। হাঁটতে বসতে চলতে ফিরতে মনে হয়, আমি শূন্যের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি। এসব কথা তায়েবাকে জানিয়ে লাভ কী? কোন বাস্তব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তাকে এই হাসপাতাল অবধি আসতে হয়েছে সবটা না হলেও অনেকটা আমি জানি। তাকে খুশি করার জন্য বললাম, আমরা বাংলাদেশের বারো চোদ্দজন ছেলে বৌবাজারের একটা হোস্টেলে খুব ভালোভাবে আছি। তুমি তো দাড়িঅলা নরেশদাকে চিনতে। এই হোস্টেলে তাঁর তিন ভাই আগে থেকে থাকত। আমাদের অসুবিধে দেখে তারা দুটো আস্তরুম ছেড়ে দিয়েছে। রান্নাবান্না বাজার সবকিছু নিজেরাই করি। আমি এখানকার একটা সাপ্তাহিকে কলাম লিখছি। শিগগির নরেশদা একটা কলেজে চাকরি পেতে যাচ্ছেন। এখানে বাংলাদেশের লক্ষীছাড়া ছন্নছাড়াদের নিয়ে একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছি। আর শুনেছি বাড়িতে সবাই বেঁচে-বর্তে আছে। তায়েবা আমার হাতে হাত রেখে বলল, দানিয়েল ভাই আপনি একটা পথ করে নেবেন, একথা আমি নিশ্চিত জানতাম।

এরই মধ্যে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। তায়েবা অবলীলায় বলে দিল, ওই যে মাইতিদা আসছেন। সত্যি সত্যি ড. মাইতি এসে কেবিনে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, দানিয়েল সাহেব, আমি রসকষহীন মানুষ। রোগী ঠেঙিয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করি। শুনেছি আপনি একজন জিনিয়স, আপনার সঙ্গে কী নিয়ে আলাপ করা যায় ভেবে স্থির করে একদিন জানাব। আজ ভয়ানক ব্যস্ত, ক্ষমা করতে হবে। এখন আমি উঠব।

তায়েবা বিছানা থেকে তড়াক করে নেমে ড. মাইতির ঝোলানো স্টেথেসকোপটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, মাইতিদা আপনাকে দুমিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দানিয়েল ভাই, কালও কি আপনি হাসপাতালে আসবেন?

আমি মাথা নাড়লাম। তা হলে আমার জন্য অল্প কটা ভাত আর সামান্য ছোট মাছের তরকারি রান্না করে নিয়ে আসবেন। মরিচ দেবেন না, কেবল জিরে আর হলুদ। ছোট্ট মেয়েটির মতো আবদেরে গলায় বলল, মাইতিদা আমাকে আগামীকাল ভাত খেতে না দিলে আপনাদের কথামতো আমি ইনজেকশন দেব না, ক্যাপসুল খাব না, হেন টেস্ট তেন টেস্ট কিছুই করতে দেব না। ড. মাইতির হাত ধরে বলল, আপনি হ্যাঁ বলুন, মাইতিদা। ড. মাইতি বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বেশ তো দানিয়েল সাহেব, কালকে ভাত মাছ রান্না করে নিয়ে আসুন। কিন্তু আমি ভাবছি, পুরুষমানুষের হাতের রান্না তোমার মুখে রুচবে কি না। তায়েবা বলল, রুচবে খুব রুচবে। দানিয়েল ভাই ট্যাংরা মাছ পান কি না দেখবেন। ড. মাইতি ঘড়ি দেখে বললেন এবার আমি উঠব। দানিয়েল সাহেব, আপনিও কেটে পড়ুন। এমনিতে অনেক কনসেশন দেয়া হয়েছে।

তায়েবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে একবার হাসপাতাল কমপ্লেক্সটির দিকে তাকালাম। ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে বিরাট বাড়িটাকে নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্তির মতো দেখাচ্ছে। মৃত্যু এবং জীবনের সহাবস্থান বাড়িটার শরীরে এক পোঁচ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য মাখিয়ে দিয়েছে মনে হল। হাসপাতাল কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের পথ ধরলাম। পনেরো নম্বর ট্রাম ধরে আমাকে বৌবাজারে নামতে হবে। উল্টোপাল্টা কতরকমের চিন্তা মনের ভেতর ঢেউ তুলছিল। তায়েবার অসুখটা কি খুব সিরিয়স? তার মা কি দিনাজপুর থেকে কলকাতা আসতে পেরেছে? ডোরা শেষ পর্যন্ত পিলে-চমকানো এমন একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করল। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটাবার পরেও জাহিদ নামের মাঝবয়েসী মানুষটি কী করে, কোন সাহসে হুলো বেড়ালের মতো গোঁফ জোড়া বাগিয়ে তায়েবাকে হাসপাতালে দর্শন দিতে আসে আমি তো ভেবে পাইনে। ট্রাম দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে চড়তে যাচ্ছি, এমন সময় পেছনে ঘাড়ের কাছে কার করস্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি ড. মাইতি। তিনি বললেন, দানিয়েল সাহেব, একটা কথা বলতে এলাম। মাছ রান্না করার সময় একেবারে লবণ ছোঁয়াবেন না। আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন, গেন্ডারিয়ার বাসাতেও তায়েবা কখনো লবণ খেত না। তিনি জানতে চাইলেন, আপনি কতদিন তায়েবাকে চেনেন? আমি বললাম, তা বছর চারেক তো হবেই। তিনি আমাকে জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন, তার কী রোগ আপনি জানেন? বললাম, জানিনে, মাঝে মাঝে দেখতাম নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিছুদিনের জন্য হাসপাতালে যেত। আবার ভালো হয়ে চলে আসত। শুধু এটুকু জানি সে লবণ খেত না আর চা-টা ঠাণ্ডা করে খেত। তিনি বললেন, এর বেশি আপনি কিছু জানেন না? বললাম, বা রে জানব কী করে, মহিলাদের রোগের কি কোনো সীমা সংখ্যা আছে? তা ছাড়া তায়েবা আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি, আসলে তার অসুখটা কী? তিনি বললেন, উচিত কাজ করেছে, এসব আপনাকে পোষাবে না। আপনি অন্যরকমের মানুষ। আর শুনুন ভাত তরকারি আনার সময় লুকিয়ে আনবেন। ড. ভট্টাচার্য জানতে পেলে ওকে হাসপাতালে থাকতে দেবেন না। এটুকু কষ্ট করে মনে রাখবেন। তারপর নিজে নিজে বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটি তো ফুরিয়েই যাচ্ছে। যা খেতে চায় খেয়ে নিক। ড. মাইতি একটা চাপা নিশ্বাস ছাড়লেন। আমার বুকটা ভয়ে আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠল। ড. মাইতি বললেন, আপনার ট্রাম, আমি চলি।

২

বৌবাজারের স্টপেজে ট্রাম থামতেই লোড-শেডিং শুরু হয়ে গেল। সেই কলকাতার বিখ্যাত লোড শেডিং। এটা এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে এখনো আমাদের ঠিক গা-সওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেক কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেখি দারোয়ান পাঁড়েজী কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে কম্বলের ওপর দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। বিরাট উদরটা আস্ত একখানি ছোট্ট টিলার মতো নিশ্বাসের সাথে সাথে ওঠানামা করছে। নাক দিয়ে মেঘ ডাকার মতো শব্দ হচ্ছে। সকালবেলা বেরুবার সময় পাঁড়েজীকে টিকিতে একটা লাল জবাফুল গুঁজে কপালে চন্দন মেখে সুর করে হিন্দিতে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তে দেখেছি। তাঁর যে এতবড় একটা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আছে, তখন কল্পনাও করতে পারিনি। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পাঁড়েজী ধড়মড় করে জেগে হাঁক দিল, কৌন? আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে একটুখানি হেসে বলল, আমি তো ভাবলাম কৌন না কৌন। আপনি তো জয়বাংলার বাবু আছেন, যাইয়ে।

দোতলায় পা দিতে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। এ লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনে বচসা ঝগড়া এসবই আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি। আমার শরীরটা আজ ক্লান্ত। মনটা ততোধিক। ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকব। কিছু সময় একা একা থাকা আমার বড় প্রয়োজন। বাইরে কোথাও পার্কে টার্কে বসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসব কি না ভাবাগোনা করছি, এ সময়ে আলো জ্বলে উঠল। সুতরাং ঘরের দিকে পা বাড়ালাম, মেঝের ওপর পাতা আমাদের ঢালাও বিছানার ওপর নরেশদা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিপরীত দিকে দুজন অচেনা তরুণ, দুজনেরই গায়ে মোটা কাপড়ের জামা। একজনের হাতা কনুই অবধি গুটানো। জামার রং বাদামি ধরনের, তবে ঠিক বাদামি নয়। বুঝলাম এরা কোনো ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসে থাকবে। হাত গুটানো তরুণের গায়ের রং হয়তো একসময়ে উজ্জ্বল ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। আরেকজনা একবারে কুচকুচে কালো। নরেশদা বললেন, এসো দানিয়েলের পরিচয় করিয়ে দিই। ফর্সা তরুণটির দিকে অঙ্গুলি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এর নাম হচ্ছে আজহার, আমার ছাত্র। আর ও হচ্ছে তার বন্ধু হিরন্ময়। দুজনেই জলাঙ্গী ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসেছে। আজ রাত সাড়ে বারোটার সময় ট্রেনিং নেয়ার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে দেরাদুন চলে যাচ্ছে। নরেশদা জিগগেস করলেন, আজহার, তোমরা কিছু খাবে? না স্যার, হোটেলে খেয়েই তো আপনার কাছে এলাম। নরেশদা বললেন, তারপর খবরটবর বলো, এখানে এসে কী দেখলে আর কী শুনলে? আজহার বলল, দেখলাম স্যার ঘুরে ঘুরে প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থিয়েটার রোডের সাহেবরা খেয়েদেয়ে তোফা আরামে আছেন। অনেককে তো চেনাই যায় না। চেহারায় চেকনাই লেগেছে। আমাদের ক্যাম্পগুলোর অবস্থা যদি দেখতেন স্যার। কী বলব, খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার তরুণ রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজছে, রোদে পুড়ছে। কারো অসুখবিসুখ হলে কী করুণ অবস্থা দাঁড়ায় নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না স্যার। আমরা কলকাতা এসেছি চারদিন হল। এ সময়ের মধ্যে অনেক কিছু

দেখে ফেলেছি। একেকজন লোক ভারত সরকারের অতিথি হিসেবে এখানে জামাই আদরে দিন কাটাচ্ছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, ফুর্তি করা, কোনোকিছুর অভাব নেই। আরেক দল বাংলাদেশের ব্যাংক থেকে সোনা লুট করে কলকাতা এসে ডেরা পেতেছে। আবার অনেকে এসেছে বিহারিদের পুঁজিপাট্টা হাতিয়ে নিয়ে। আপনি, এই কলকাতা শহরের সবগুলো বার, নাইট ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। দেখতে পাবেন ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশের মানুষ দুহাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। এদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের কর্তা-ব্যক্তিদের কোনো যোগাযোগ নেই বলতে পারেন? কথায় কথায় আজহার ভীষণ রেগে উঠল। আগে আমরা ফিরে আসি, দেখবেন এই সমস্ত হারামজাদাদের কী কঠিন শিক্ষাটা দিই। স্যার আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা সিগারেট খেতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমারই অফার করা উচিত ছিল। কিন্তু মাস্টার ছিলাম তো, সংস্কার কাটতে কাটতেও কাটে না। আজহার একটা সিগারেট ধরাল।

এই ফাঁকে হিরন্ময় মুখ খুলল। স্যার আমি একটা গল্প শুনেছি। তবে গল্পটা খুব ভালো নয়। যদি বেয়াদবি না ধরেন বলতে পারি। বেয়াদবি ধরার কী আছে, বলে যাও। এই যুদ্ধ মান অপমান, ভালোমন্দ ন্যায় অন্যায় সবকিছু বানের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেসকল মানুষকে দেশে থাকতে শ্রদ্ধা করতাম, কলকাতায় তাদের অনেকের আচরণ দেখে সরল বাংলায় যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়—তাই হতে হচ্ছে। এখনো তোমরা স্যার ডাকছ তার বদলে শালা বললেও অবাক হবার কিছু ছিল না। অতএব বিনা সংকোচে বলে যেতে পারো তোমার গল্প। ঠিক গল্প নয় স্যার। এখানকার একটা সাপ্তাহিক খবরটা ছেপেছে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী নাকি সোনাগাছিতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। চেনেন তো স্যার সোনাগাছি কীজন্য বিখ্যাত। নরেশদা দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, এই নিরীহ মাস্টার অন্য কিছু বলতে না পারলেও সোনাগাছি কীজন্য বিখ্যাত সেকথা অবশ্যই বলতে পারে। কেননা কলকাতা আসার অনেক আগেই তাকে প্রেমেন মিত্তিরের অনেকগুলো ছোটগল্প পাঠ করতে হয়েছিল। এবার তোমার গল্পটা শুরু করতে পারো। হিরন্ময়ও একটা সিগারেট জ্বালাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, পুলিশ অফিসারের জেরার মুখে ভদ্রলোককে কবুল করতেই হল, তিনি ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী। পুলিশ অফিসার তখন বললেন, তা হলে স্যারের গুডনেমটা বলতে হয়। মন্ত্রী বাহাদুর নিজের নাম প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টেলিফোন করে ভেরিফাই করে দেখে যে বক্তব্য সঠিক। পুলিশ অফিসারটি দাঁতে জিব কেটে বললেন, স্যার কেন মিছিমিছি সোনাগাছির মতো খারাপ জায়গায় গিয়ে নাহক ঝুট ঝামেলার মধ্যে পড়বেন। আর ভারত সরকারের আতিথেয়তার নিন্দে করবেন। আগেভাগে আমাদের স্মরণ করলেই পারতেন, আমরা আপনাকে ভি. আই. পি.-র উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম।

নরেশদা বললেন, চারদিকে কতকিছু ঘটছে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি। তবে একথাও মিথ্যে নয় যে এসব একেবার অস্বাভাবিক নয়। আমরা তো সবাই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। নিজের প্রাণ ছাড়া আর কিছু যেখানে বাঁচাবার নেই, সেখানে এ ধরনের বিকৃতিগুলো আসবে, আসতে বাধ্য। চিন্তা করে দেখো জানুয়ারি থেকে পঁচিশে

মার্চের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের দিনগুলোর কথা। আর মানুষদের কথা চিন্তা করো। প্রাণপাতালের তাপে জেগে-ওঠা সেই মানুষগুলো। একেকটা ব্যক্তি যেন একেকটা ঝরনা। আর আজ দেখো সেই মানুষদের অবস্থা। এই তোমরা আসার একটু আগেই আমি বনগাঁ থেকে ফিরলাম। বাংলাদেশের মানুষ কী অবস্থার মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে, নিজের চোখেই তো দেখে এলাম। ওপরের দিকে কিছু মানুষ কী করছে না-করছে সেটা এখন আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। শরণার্থী শিবিরগুলোতে কী অবর্ণনীয় কষ্ট এই বিজুলির আলো জ্বলা কলকাতা শহরে বসে কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিদিন বেশির ভাগ মারা যাচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধ। সৎকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বনগাঁ থেকে শেয়ালদা প্রতিটি স্টেশনে তুমি দেখতে পাবে বাংলাদেশের মানুষ। খোলা প্ল্যাটফর্মের তলায় কী চমৎকার সংসারই না পেতেছে তারা। পুরুষরা সব বসে আছে নির্বিকার। তাদের চোখের দৃষ্টি মরে গেছে। চিন্তা করবার, ভাবনা করবার, স্বপ্ন দেখবার কিছু নেই। সকলেরই একমাত্র চিন্তা আজকের দিনটি কেমন করে কাটে। তাও কি সকলের কাটে! মরণ যখন কাউকে করুণা করে পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারো মনে রেখাপাত পর্যন্ত করে না। মৃতদেহ প্ল্যাটফর্মের পাশে পড়ে থাকে, অথচ দেখতে পাবে পাশের পরিবারটি অ্যালুমিনিয়ামের থালায় মরিচ দিয়ে বাসি ভাত খাচ্ছে। এমন অনুভূতিহীন মানুষের কথা আগে তুমি কল্পনা করতে পেরেছ? মেয়েগুলোকে দেখো। সকলের পরনে একেকখানি তেনা। চুলে জট বেঁধেছে। পুষ্টির অভাবে সারা শরীর কাঠি হয়ে গেছে। এদের মধ্যে এমনও অনেক আছে, জীবনে রেলগাড়ি দেখেছে কি না সন্দেহ। এখন সাধ মিটিয়ে রেলগাড়ি চলাচলের পথের ধারে তাদের অচল জীবন কাটাচ্ছে। এ অবস্থা কেন হল? সবাই বলছে একটা সংগ্রাম চলছে। আমিও মেনে নিই। হ্যাঁ সংগ্রাম চলছে। কিন্তু আমার কথা হল সংগ্রাম চলছে অথচ আমি বসে আছি। আমি তো দেশকে কম ভালোবাসিনে। দেশের জন্যে মরতে আমি ভয় পাইনে। কিন্তু লড়াই করে মরে যাওয়ার সুযোগটা নেই কেন? গলদটা কোথায় জান আজহার, এই মানুষগুলো লড়াইর ময়দানে থাকলে সকলেরই করবার মতো কিছু না কিছু কাজ পাওয়া যেত। দেশ যুদ্ধ করছে, কিন্তু যুদ্ধের ময়দান না দেখেই এদের দেশত্যাগ করতে হয়েছে। সচল জীবন্ত মানুষ এখানে এসে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। সেখানেই দুঃখ। নেতা এবং দল এসব মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করল। কিন্তু তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে ব্যর্থ হল। নেতা গেল পাকিস্তানের কারাগারে। আর আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণের মুখে দেশ ছেড়ে চলে এলাম। সেখানেই আফসোস। নানা হতাশা এবং বেদনার মধ্যেও স্বীকার করি একটা যুদ্ধ হচ্ছে। একদিন না একদিন আমাদের মাটি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের চলে যেতেই হবে। কিন্তু আমার তো বাবা এ তক্তপোশের ওপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিঠে বাত ধরে গেল। নরেশদা একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন। কিছু মনে কোরো না বাবা, মাস্টার মানুষ। একবার বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে পারিনে।

হিরন্ময় জানতে চাইল, স্যার, বনগাঁ কেন গিয়েছিলেন? নরেশদা জবাবে বললেন, আমার বুড়ো মা এবং বাবা কয়েকজন আত্মীয়স্বজনসহ আজকে বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে পৌঁছানোর কথা। বনগাঁর আশেপাশে যে-কটা শরণার্থী শিবির আছে, সবগুলোতেই

তালাশ করলাম। পরিচিত আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। কিন্তু মা-বাবাকে পাওয়া গেল না। হয়তো এসে পড়বেন দুচার দিনের মধ্যে নইলে ... নরেশদা চুপ করে গেলেন। কথাটার অশুভ ইঙ্গিত সকলকেই স্পর্শ করল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। হাতের আধপোড়া সিগারেটটি ছুড়ে ফেলে দিল আজহার। স্যার, আপনার এই মানসিক অবস্থায় বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত। আসলে প্রথমেই আপনার মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের সংবাদ নেয়াই উচিত ছিল। আমাদের মুসলমান ছেলেদের বেশির ভাগই একা একা এসেছি কিনা, তাই পরিবারের কথাটা মনে থাকে না। সেজন্য এমনটি ঘটেছে। আশা করছি, অবশ্যই তাঁরা দুচার দিনের মধ্যে এসে পড়বেন। আপনি চিন্তা-ভাবনা করবেন না স্যার। আমি দেরাদুনে পৌঁছেই আপনাকে চিঠি দেব। আপনি অবশ্যই জানাবেন, তাঁরা পৌঁছুলেন কি না। আজহার ঘড়ি দেখে প্রায় একরকম লাফিয়ে উঠল। স্যার, এবার আমাদের উঠতে হয়। মেজর হরদয়াল সিংয়ের কাছে হাওড়া স্টেশনে হাজিরা দিতে হবে। তার আগে অনেকগুলো ফর্মালিটি পালন করতে হবে। কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায় রিপোর্ট করতে হবে। আজহার এবং হিরন্ময় উঠে দাঁড়াল। তাদের পিছুপিছু আমি এবং নরেশদা বিদেয় জানাতে নিচতলার গেট পর্যন্ত এলাম। আজহার নত হয়ে নরেশদার পা ছুঁয়ে সালাম করল। তারপর বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ফেলল। নরেশদা মমতা মেশানো কণ্ঠে বললেন, ছি বাবা কাঁদতে নেই। আজহার কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বলল, আমার দুভাই পাকিস্তানের মারিতে আটকা পড়ে আছে। এক বোন এবং ভগ্নীপতি লাহোরে। এতদিন মনেই পড়েনি। আপনার মা-বাবার কথা শুনে তাদের কথা মনে পড়ল। রাস্তার ফুটপাত ধরে দুজন হনহন করে চলে গেল। আমরা দুজন কিছুক্ষণ সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সকলেরই একেকটা করুণ কাহিনী রয়েছে।

নরেশদা জানতে চাইলেন, দানিয়েল তুমি খেয়েছ? আমি মাথা নাড়লাম। চলো ওপরে যেয়ে কাজ নেই, একেবারে খেয়েই আসি। বললাম, চলুন। তিনি জিগগেস করলেন, কোথায় যাবে? আমার অত বেশি খাওয়ার ইচ্ছে নেই, যেখানেই হোক চলুন। নরেশদা বললেন, এত দুঃখ, এত মৃত্যু, এসবের যেন শেষ নেই। যাই হোক চলো আজ মাছ ভাত খাই। আজ আমার একটুখানি নেশা করতে ইচ্ছে করছে। নরেশদা এমনিতে হাসিখুশি ভোজনবিলাসী মানুষ। কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁকেও আমাদের সঙ্গে দুবেলা মাদ্রাজি দোকানে দোসা খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাঙালি দোকানে সামান্য পরিমাণ মাছ, ডাল এবং ভাত খেতে কম করে হলেও ছয় টাকা লেগে যায়; সেখানে মাদ্রাজি দোকানে দেড় দুটাকায় চমৎকার আহারপর্ব সমাধা করা যায়।

ভীমনাগের মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে আমরা রাস্তা পার হলাম। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর ছবিটিতে কড়া আলো পড়েছে। স্যার আশুতোষ ভীমনাগের মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন, বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার করার জন্য ভীমনাগ স্যার আশুতোষের পোর্ট্রেটটা ঝুলিয়েছে। কিন্তু পোর্ট্রেটটি দেখে এরকম ধারণা হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক যে ভীমনাগের মিষ্টির গুণেই স্যার আশুতোষ এত বৃহদায়তন ভুঁড়ির অধিকারী হতে পেরেছেন। অতএব যাঁরা ভুঁড়ির আয়তন বড় করতে চান, পত্রপাঠ ভীমনাগের দোকানে চলে আসুন।

আমরা দুজন সামান্য একটু ডাইনে হেঁটে বঙ্গলক্ষ্মী হোটেলে ঢুকলাম। খদ্দেরের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। একটা টেবিলের দুপাশে বসলাম। নরেশদা বললেন, চলো আজ মাংস খাওয়া যাক। আমি জিগগেস করলাম, পয়সা আছে? তিনি টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আজ কিছু পয়সা পাওয়া গেছে। এটা তো আশ্চর্য ব্যাপার। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলেন নাকি? রাস্তায় কি আর টাকা-পয়সা কুড়িয়ে পাওয়া যায়? মাদারীপুরের এক ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে শ তিনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। আজকে বনগাঁ স্টেশনের কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা। অবশ্য তিনি জিপে চড়ে রিফিউজি ক্যাম্পে দর্শন দিতে এসেছিলেন। তাঁর হাতে অনেক টাকা, অনেক প্রতাপ। মাদারীপুর ব্যাংকের লুট করা টাকাও নাকি তাঁর হাত দিয়ে বিলিবন্টন হয়েছে। ভাবলাম, এই সময়ে পাওনা টাকাটা দাবি না করাই হবে বোকামো। আমি জিপের সামনে দাঁড়াতেই তিনি ঝট করে জিপ থেকে নেমে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কত কী জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাইনি। আমাদের দিনকাল খারাপ যাচ্ছে শুনে পকেট থেকে একটি পাঁচশো টাকার নোটের তাড়া অন্য কেউ দেখতে না পায় মতো বের করে, সেখান থেকে একখানি নোট আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি তো বিপদেই পড়ে গেলাম। খুচরো কোথায় পাই! তাই বললাম, আপনি বরং তিনশোই দিন। আমার তো খুচরো করার কোনো উপায় নেই। তিনি বললেন, রাখুন প্রফেসর বাবু, আপনার খুচরো সে পরে দেখা যাবে। জিপে স্টার্ট দিয়ে দলবলসহ বারাসত রিফিউজি ক্যাম্প ভিজিট করতে চলে গেলেন। বেয়ারা এলে তিনি পাঠার মাংস, ভাত ডাল দিতে বললেন।

খেতে খেতে জিগগেস করলাম, মা-বাবার কোনো খোঁজ পেলেন? খবর তো পাচ্ছি রোজ পথে আছেন, পথে আছেন। কিন্তু কোন পথ সেটা তো ভেবে স্থির করতে পারছিনে। আজই তো এসে যাওয়ার কথা ছিল। গোটা দিন অপেক্ষা করলাম, কিন্তু অপেক্ষাই সার। হঠাৎ করে নরেশদার হিক্কা উঠল। প্রাণপণ সংযমে হিক্কার বেগ দমন করে আবার খেতে লেগে গেলেন। আমি ফের জানতে চাইলাম, কল্যাণীরও কোনো খবর পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, তার একটা খবর আছে বটে। তবে সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না, সে নাকি কীভাবে পশ্চিম দিনাজপুরে তার এক আত্মীয়বাড়ি এসে উঠেছে। ঠিকানা পেয়েছেন? নরেশদা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে দুয়েক দিনের মধ্যে নিজে গিয়ে দেখে আসুন অথবা ক্ষিতীশকে পাঠিয়ে দেন। নরেশদা আমাকে ধমক মারলেন। আরে রাখো তোমার পশ্চিম দিনাজপুর। যাওয়া-আসার খরচ কত জান? এই কল্যাণীর সঙ্গে নরেশদার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তারিখটা ছিল একুশে এপ্রিল। এরই মধ্যে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্র্যাক ডাউন করে বসল। খরচ যতই হোক ম্যানেজ করা যাবে। আপনি ঘুরে আসুন। সেকথা এখন রাখো। তোমার খবর বলো। সকাল থেকে কোথায় কোথায় গেলে এবং কী করলে।

গোটা দিনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একদম ভুলেই ছিলাম। নরেশদার কথায় সমস্ত দিনের ঘটনারাজি একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মতো প্রাণবান হয়ে উঠল। আমি বললাম, সকাল দশটার দিকে তো গেলাম লেনিন সরণিতে। তিনি জানতে চাইলেন, লেনিন সরণিতে কেন? বললাম, জাহিদুলের কাছে তায়েবার ঠিকানা চাইতে। জাহিদুল তোমাকে তায়েবার ঠিকানা দিলেন? তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন। দিতে কি চায়, শেষ

পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হল। কী করে? তিনি জানতে চাইলেন। জবাবে বললাম, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দেখি একেবারে সিঁড়ির গোড়ার রুমটিতে জাহিদুল মটকার পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি ফরাশের একপাশে। রিহার্সেল জাতীয় কিছু একটা হয়ে গেছে অথবা হবে। জাহিদুলের সঙ্গে আরো চার পাঁচজন মানুষ। একজন বাংলাদেশের। বাকিরা কলকাতার। আপনি তো জানেন মওকা পেলেই জাহিদুল ন্যাকা ন্যাকা ভাষায় চমৎকার গল্প জমাতে পারে। সেরকম কিছু একটা বোধহয় করছিল। সেখানে আরো তিনজন মহিলার মধ্যে ডোরাকেও দেখলাম। আমাকে দেখেই দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করেছে। তার মুখের শিশুর মতো অম্লান সরলতা তেমনি আছে। কোনো দুশ্চিন্তার রেখা, কোনো ভাবান্তর নেই। গেন্ডারিয়ার বাসায় যেমন সেজে-গুজে থাকত অবিকল তেমনি। যেন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কোথাও কিছু ঘটেনি। জানেন তো ডোরাটা বরাবরই বোকা এবং পরনির্ভরশীল। নিশ্চয়ই এই সময়ের মধ্যে সে জাহিদুলের মধ্যে একটা নির্ভর করার মতো ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। জাহিদুল সে সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে মেয়েটিকে একেবারে নিকে করে ফেলেছে। জাহিদুলের বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে, তবু তার সৎসাহসের তারিফ করি। বিয়ে না করে অন্যভাবেও মেয়েটিকে সে ব্যবহার করতে পারত। জানেন তো জাহিদুলের আসল বউয়ের সংবাদ? শশীভূষণ তার মেয়েটির ট্যুইশনি করত না, জাহিদুলকে একটা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শশীকে বগলদাবা করে শান্তিনিকেতন চলে গেছে। এক্কেবারে ক্ষুরের মতো ধারালো মহিলা। যেদিকে যায়, ফাঁক করে যায়। তুমি কোন শশীর কথা বলছ? আমাদের জগন্নাথ হলের ছোট্টমতো সুন্দর ছেলেটি নয়তো! সে তো অত্যন্ত সুশীল ছেলে, সে কেন যাবে রাশেদা খাতুনের সঙ্গে? খাতুনেরও তো প্রচুর সুনাম শুনেছি, তিনিও বা এরকম বাজে কাজ করতে যাবেন কেন? এসব ব্যাপারে নরেশদার মাথাটা আস্তে আস্তে কাজ করে। তাই বিরক্ত না হয়েই বললাম, যুদ্ধস্রোতে ভেসে যায় ধনমান জীবন যৌবন। আমি আর আপনি করলে যা অপকর্ম হয়, মহাপুরুষেরা করলেই সেসব লীলা হয়ে দাঁড়ায়। নরেশদা বললেন, ওসব কথা রাখো, তোমার খবর বলো। আমি বললাম, রাশেদা খাতুন যখন শশীকে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর পুরে তীর্থযাত্রা করল, ওদিকে জাহিদুল ভেবে দেখল, সে কিছু একটা করে যদি না বসে, তা হলে লোকে তাকে মরদ বলবে না। তাই কোনো কালবিলম্ব না করে ডোরাকে নিকে করে বসল। তাতে তার কোনো বেগই পেতে হয়নি। সে ওদেরই তো অভিভাবক ছিল। সুতরাং 'আপনা উদ্যান ফল, তাতে কিবা বলাবল'। স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত সংগ্রামে ডোরাকে বলি হতে হয়েছে। আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লেগেছে তায়েবার। সে ছোট বোনটাকে প্রাণের চাইতে ভালোবাসত আর জাহিদুলকে বাবারও অধিক শ্রদ্ধা করত। তায়েবার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত মানসিক আশ্রয় ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় ওটাই তার অসুখ শুরুতর হয়ে ওঠার মূল কারণ। নরেশদা কিছুক্ষণের জন্য মুখের ভেতর পুরে দেয়া গ্রাসটা চিবুতে পারলেন না। দুমিনিটের মতো ঝিম মেরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার ঠিকানা সংগ্রহের বৃত্তান্তটা বলো।

আমি শুরু করলাম। জাহিদুল আমাকে দেখার পর ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। জানেন নরেশদা, ওঁকে এখন বেশ স্লিম দেখায়। ভুঁড়িটাও কোথায় যেন

আত্মগোপন করেছে। গোঁফজোড়া এমন কায়দা করে ছেঁটেছেন, কাছে থেকে না দেখলে পাকনা অংশ চোখেই পড়ে না। নরেশদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আবার আজেবাজে কথা বলছ। কী ঘটেছে সেটাই বলো। সুতরাং আরম্ভ করলাম। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মুখ খুলতেই পারিনি। কী জানি কেউ যদি কিছু মনে করে। শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আপনি কি একটু বাইরে আসবেন? জাহিদুল উঠে এলে আমি তাঁকে সিঁড়ির গোড়ায় ডেকে নিয়ে বললাম, আপনার কাছ থেকে আমি তায়েবার ঠিকানাটি সংগ্রহ করতে এসেছি। জাহিদুল অত্যন্ত উষ্মা এবং ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, আমি কি পকেটে পকেটে তায়েবার ঠিকানা বয়ে বেড়াই নাকি? আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানালাম, আপনার কাছে আমি তায়েবার ঠিকানা নিতে এসেছি এবং আপনি জানেন তার ঠিকানা। ভালোয় ভালোয় যদি না দেন চিৎকার করব, চেঁচামেচি করব। একেবারে বিফল হলে অন্য কিছু করব। আমি প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে লম্বা চ্যাপ্টা জিনিসটির অস্তিত্ব তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। ধমকের সুরে আমাকে বলল, এক মিনিট দাঁড়াও। আমি তো ভয়ে অস্থির। এই বুঝি পুলিশের কাছে টেলিফোন করে বলবেন পাকিস্তানি গুপ্তচর পকেটে ছুরি নিয়ে বাংলাদেশের একজন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করতে এসেছে। কিন্তু তিনি ওসব কিছুই করলেন না, সিঁড়ি থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে ভেতরের কাগজটা বের করে নিলেন এবং সেটা দেয়ালে ঠেকিয়ে তায়েবার হাসপাতালের নাম, ওয়ার্ড এবং বেড নম্বর লিখে আমাকে দিলেন। আমার কেমন অনুভূতি হয়েছিল? দেশ থেকে আসার পর এই প্রথম একটা কাজের মতো কাজ করলাম। করুণার ওপর বাঁচতে বাঁচতে নিজের অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমরা যখন নিচে নামলাম, তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কলকাতা শহরের যন্ত্রযানের চলাচল একেবারে কমে এসেছে। তথাপি একথা বলা যাবে না কলকাতা শহর বিশ্রাম নিচ্ছে। নোংরা ঘেয়ো রাস্তা, মান্ধাতার আমলের পাতা ট্রামলাইন, উন্মুক্ত ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষজনের গাদাগাদি ঠেসাঠেসি ভিড় দেখলে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এই নগরী বিশ্রাম কাকে বলে জানে না, শুধু যন্ত্রণায় কঁকায়। আচমকা ছুটে-চলা নৈশ ট্যাক্সিগুলোর আওয়াজ শুনলে একথাই মনে হয়। ডানদিকের উঁচু বিল্ডিংটার ফাঁকে একখানি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার গর্তের জমা পানিতে চাঁদের ছায়া পড়েছে। আহা তা হলে কলকাতা শহরেও চাঁদ ওঠে। নরেশদা পানের দোকান থেকে পান এবং সিগারেট কিনলেন। পকেটে পয়সা থাকলে দুনিয়ার ভালো জিনিস যত আছে কিনতে তাঁর জুড়ি নেই। আমার হাতে একটা তবক দেয়া পানের খিলি তুলে দিয়ে বললেন, নাও খাও। কাল আবার পয়সা নাও থাকতে পারে। তারপর নিচুসুরে আবৃত্তি করলেন, নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও। হোস্টেলের গেটে এসে দেখলাম দারোয়ান গেটে তালা চাবি লাগাচ্ছে। সেই আগের দারোয়ানটিই। বলল, বাবুজি আওর একটু হোলে গেট বন্ধ হোয়ে যেত। তখন তো খুব অসুবিধে হোয়ে যেত। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওপরে এলাম। আজ হোস্টেল একেবারে ফাঁকা। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের যে ছেলেরা থাকে, সবাই বারাসত রিফিউজি ক্যাম্পে নাটক করতে গেছে। নরেশদার ভাই দুজনও বাংলাদেশের ছেলেদের সঙ্গে গেছে। অঢেল জায়গা, ইচ্ছে করলে

আমরা দুজন দুরুমে কাটাতে পারি। অন্যদিন যে প্রাইভেসির অভাবে অন্তরে অন্তরে গুমরাতে থাকি আজ সেই প্রাইভেসিটাই বড় রকমের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। আমরা দুজন পরস্পরকে এত ভালোভাবে চিনি যে হাঁ করলে একে অপরের আলজিভ পর্যন্ত দেখে ফেলি।

নরেশদা বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ে পুরোনো কথার খেই ধরে জিগগেস করলেন, তায়েবাকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে? জবাব দিলাম, পি, জি.-তে। তা তুমি দেখতে গিয়েছিলে? গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। দেখে তো ভালোই মনে হল, সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। আগের মতোই আছে, জেদি, বেপরোয়া। কিন্তু ডাক্তার যা বললেন, তাতে মনে হল অসুখটা খুব একটা সাংঘাতিক। আমার কেমন জানি ভয় হচ্ছে। নরেশদা জিগগেস করলেন, ডাক্তার কী রোগ বললেন। উলটো ডাক্তারই আমাকে জিগগেস করলেন, তায়েবার কী রোগ হয়েছে আমি জানি নাকি। বলেছি, আমি কেমন করে বলব। তায়েবা কখনো তার রোগের কথা আমাকে বলেছে নাকি! এটা তার প্রাইভেট ব্যাপার। নরেশদা বললেন, আমি তো কোনো কারণ খুঁজে পাইনে কেন তোমার কাছে তায়েবার রোগের বিষয়ে জানতে চাইবেন। আমি বললাম, রহস্য টহস্য কিছু নেই। তা হলে গোটা ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

তায়েবা বলেছে, আগামীকাল যদি হাসপাতালে যাই তার জন্য কিছু ভাত এবং ছোট মাছ মরিচ না দিয়ে শুধু জিরে আর হলুদ দিয়ে যেন রান্না করে নিয়ে যাই। তাকে নাকি এক মাস থেকে ভাতই খেতে দেয়া হয়নি। আমি ভাত বেঁধে নিয়ে গেলে সেটা সে খাবে। এ ব্যাপারে ডা. মাইতির কাছে আবদার ধরেছিল। ডা. মাইতি এক শর্তে রাজি হয়েছেন। ডা. ভট্টাচার্যি যেন জানতে না পারেন। তিনি জানতে পারলে তায়েবাকে নাকি হাসপাতালে থাকতে দেবেন না। তিনি ট্রাম স্টপেজের গোড়ায় এসে একথা আমাকে জানিয়েছেন। আরো বলেছেন, রান্না করার সময় কিছুতেই যেন লবণ না দিই। পরে অবশ্য তাঁকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনেছি, মেয়েটা তো শেষই হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যা খেতে চায় খেয়ে নিক না। এই শেষের কথাটি শুনে আমার ভয় ধরে গেছে। তায়েবার যদি ভয়ানক কিছু ঘটে, সে যদি আর না বাঁচে।

নরেশদা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা ধমক দিলেন। কীসব আবোল-তাবোল বকছ। বাঁচবে না কেন, চুপ করো। মরণ কি খেলা নাকি! পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এতদূর যখন আসতে পেরেছে, দেখবে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। হয়তো একটু সময় নেবে। এই ভাত মাছ রান্নার ব্যাপারটি নিয়ে কিছু ভেবেছ কি? না এখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনি। আপনি বনগাঁ থেকে ফেরার পর আমি এলাম। সারাক্ষণ হাসপাতালেই তো কাটিয়ে এলাম। সত্যিই রান্না করাটাও দেখছি একটা অসম্ভব ব্যাপার। আচ্ছা নরেশদা একটা কাজ করলে হয় না। আমার বান্ধবী অর্চনা আছে না। গোলপার্কের কাছে যার বাসা। সে বাসায় তো আপনিও গিয়েছেন। তাকে গিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলব, ভাবছি কাল সকালে তার বাসায় যাব। অবশ্যই অর্চনা কোনো একটা উপায় বের করবে। নরেশদা বললেন, তিনি তো সকালবেলা কলেজে যান। দেখা করবে কেমন করে। আর কলেজ থেকে যদি সোজা বান্ধবীর বাসা বা অন্য কোথাও চলে যান, তখন কী করবে? একবারে ফাঁকার উপর লাফ দেয়া যায় নাকি?

আমার বোধোদয় হল। সত্যিই তো এরকম ঘটতে পারে। আমি মাথা চুলকে বললাম, আরো একটি ভালো আইডিয়া এসেছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে কাকাবাবু মুজফফর আহমদের কাছে যাব। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁর কাছে সব খুলে টুলে বললে, একটা উপায় অবশ্যই বের করে দেবেন। তোমার মাথায় যতসব উদ্ভট জিনিস জট পাকিয়ে রয়েছে। নিজে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারেন না তাঁর কাছে যাবে ভাত আর ছোট মাছের আবদার করতে। তোমার বয়েস বাড়ছে না কমছে। আমি তো কোনো পথ দেখছিনে। কী করব আপনি নাহয় বলুন।

একটু অপেক্ষা করো। হোস্টেলের রান্নাঘরে গিয়ে নরেশদা কয়েকবার চিত্ত চিত্ত করে ডাকলেন। চিত্ত জবাব দিল, যাই বাবু, অত চিৎকার করবেন না। রাত বাজে বারোটা, এখনো রান্নাঘর ধোয়া শেষ করতে পারিনি। নরেশদা বললেন, বাবা কোনো কাজ নয়, এই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। রান্নাঘর থেকে কালিঝুলি মাখা অবস্থায় চিত্ত আমাদের রুমে এসে বলল, আজ্ঞে বাবু বলেন। নরেশদা বললেন, বাবা কাল তিনটের মধ্যে একপোয়া সরু চাল এবং কিছু ছোট মাছ মরিচ না দিয়ে শুধু হলুদ জিরে দিয়ে রান্না করে দিতে পারবে? একটা রোগীর জন্য। তুমি না পারলে অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখব। তা বাবু হয়তো পারা যাবে। কিন্তু বাজারটা আমি করব না আপনারা করবেন? সেটাও বাবা তোমাকে করতে হবে। ট্যাংরা মাছ পাওয়া যায় কিনা দেখবে। এই নাও, নরেশদা আস্ত একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট চিত্তের হাতে তুলে দিলেন। চিত্তের মুখমণ্ডলে একটা প্রফুল্লতার ছোঁয়া দেখা গেল।

নরেশদা বললেন, ঘুমোবে? বললাম, ঘুম যে আসতে চাইছে না। চোখ বন্ধ করে থাকো, একসময় আসবে। তিনি বাতি নিভিয়ে মশারি টাঙিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরে নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু আমি চোখের পাতা জোড়া লাগাতে পারছিলাম না। কোথায় একটা মস্তবড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তায়েবা, ডোরা, জাহিদুল, আমি, নরেশদা—আমাদের সকলেরই জীবন অন্যরকম ছিল এবং অন্যরকম হতে পারত। মাঝখানে একটা যুদ্ধ এসে সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে গেল। যতই চিন্তা করতে চেষ্টা করিনে কেন কোনো একটা সূত্রের মধ্যে বাঁধতে পারিনে। সবকিছুই এলোমেলো ছাড়াছাড়া হয়ে যায়। এই দু আড়াই মাস সময়, এরই মধ্যে কীরকম হয়ে গেল আমাদের জীবন। সাতই মার্চের শেখ মুজিবের সে প্রকাণ্ড জনসভার কথা মনে পড়ল। লক্ষ লক্ষ মানুষ, কী তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা! চোখে কী দীপ্তি! কণ্ঠস্বরে কী প্রত্যয়! আন্দোলনের সে উত্তাল উত্তুঙ্গ জোয়ার, সব এখন এই কলকাতায় রাতে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। অথচ এখনো দু আড়াই মাস পার হয়নি! সে পঁচিশে মার্চের রাতটি আহা সেই চৈত্র রজনী। সেই বাংলাদেশের চৈত্র মাসের তারাজ্বলা, চাঁদজ্বলা আকাশ। বাংলাদেশের জনগণের বর্ধিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আরো প্রসারিত, আরো উদার-হওয়া আকাশ। মানুষের ঘ্রাণশক্তি কী তীক্ষ্ণ! কিছু একটা ঘটবে সকলের মনের ভেতর একটি খবর রটে গেছে। দলে দলে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আপনাআপনি তৈরি হয়ে উঠছে ব্যারিকেড। জনগণের সৃজনীশক্তির সে কী প্রকাশ। রাত এগারোটা না বাজতেই রাস্তায় নামল ট্যাঙ্ক। কামান, বন্দুক, মেশিনগানের শব্দে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ভারী ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড়

ঘটাং ঘটাং শব্দে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো সরে যাচ্ছে ব্যারিকেডের বাধা। সেই চৈত্র রজনীর চাঁদের আলোতে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমাদের রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কের ওপর দাঁড়ানো দুজন সৈন্যের বাদামি উর্দির কথা আমি ভুলতি পারছিনে। ভুলতে পারছিনে তাদের ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল, আর কটমটে চোখের দীপ্তি।

তারপর কী ঘটল? তারপর? একটা ঘটনার পাশে আরেকটা ঘটনা সাজিয়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চিন্তা করতে পারিনে। আগামীকাল কী ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আঁচটুকুও করতে পারিনে। তায়েবা যদি মারা যায়, কী করব জানিনে। আমার মা, বোন, ভাইয়ের ছেলেরা বেঁচে আছে কি না জানিনে। যেদিক থেকেই চিন্তা করিনে কেন, একটা বিরাট 'না'-এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সব ব্যাপারে এতগুলো না নিয়ে মানুষ বাঁচে কেমন করে? সাবধানে উঠে বাতি না জ্বালিয়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস পানি গড়িয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিলাম। একটা ট্যাক্সি ঘটাং ঘটাং করে শিয়ালদার দিকে ছুটে গেল। আমি সন্তর্পণে দরোজা খুলে ব্যালকনিতে চলে এলাম। কলকাতায় একসঙ্গে আকাশ দেখা যায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে থাকা নক্ষত্ররাজি, এদের কি আমি আগে কখনো দেখিনি? ছায়াপথে ফুঠে থাকা অজস্র তারকারাজির মধ্যে আমার প্রিয় এবং পরিচিত তারকারাজি কোথায়? চোখের দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

৩

পরের দিন আমার ঘুম ভাঙল দেরিতে। ঘড়িতে দেখি বেলা সাড়ে দশটা বাজে। আমাদের ছেলেরা বারাসত থেকে ফিরে এসেছে। তাদের চিৎকার কোলাহলই বলতে গেলে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছে। নইলে আমি আরো ঘুমোতে পারতাম। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সিগারেটের প্যাকেটে দেখি একটাও সিগারেট নেই। মাসুমকে বললাম, দে তো একটা সিগারেট। সে নীরবে প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। একটা টান দিতেই আমার চোখের দৃষ্টি সতেজ হয়ে উঠল। মাসুমকে জিগগেস করলাম, কখন এলে, অন্যেরা কোথায়, কেমন নাটক করলে? আমার মনে হল সে কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। বোঝা গেল নরেশদার সঙ্গে কথা বলে বিশেষ যুত করতে পারেনি। কারণ তিনি বরাবর ঠাণ্ডা মানুষ। হঠাৎ করে কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করতে পারেন না। মাসুম চাঙা হয়ে বলল, দানিয়েল ভাই আপনি থাকলে দেখতেন কী ট্রিমেন্ডাস সাকসেস হয়েছে। আমরা ক্যারেকটরের মুখ দিয়ে 'এহিয়া ইন্দিরা এক হ্যায়' এ স্লোগান পর্যন্ত দিয়েছি। দর্শক শ্রোতারা কী পরিমাণ হাততালি দিয়েছে সে আমি প্রকাশ করতে পারব না। আমি জানতে চাইলাম, অন্যান্যরা কোথায়? মাসুম জানাল ক্ষিতীশ আর অতীশ টিফিন করে কলেজে চলে গেছে। বিপ্লব গেছে তার বোন শিখা আর দীপাকে মামার বাসায় রেখে আসতে। সালামটা তো পেটুক। একসঙ্গে টিফিন করার পরও ফের খাবারের লোভে একজন সি. পি. এম. কর্মীর সঙ্গে তার বাসায় গেছে। সঙ্গে জহিরকেও নিয়ে গেছে। আমি বললাম, ওরা ফিরে এসেছে, একথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন আপনি ওকথা বলছেন?

সকলে একসঙ্গে এসেছি, সবাই দেখেছে। বললাম, আমার কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছে বারাসতের লোকেরা সবাইকে একসঙ্গে খুন করে মাটির নিচে পুঁতে রেখে দিয়েছে। কেন, খুন করবে কেন, আমরা কী অপরাধ করেছি। আমি জবাব দিলাম, যদি খুন না করে থাকে এবং তোমরা একসঙ্গে নিরাপদে ফিরে এসে থাক, তা হলে ধরে নিতে হবে, সেখানকার লোকেরা তোমাদের পাগলটাগল ঠাউরে নিয়েছিল। সেজন্য কোনোকিছু করা অনাবশ্যক বিবেচনা করেছে। মাসুম বলল, অত সোজা নয় খুন করা। আমরা তো রিফিউজি ক্যাম্পের ভেতরে নাটক করিনি। কে না জানে সেখানে কংগ্রেসের রাজত্ব। আমরা নাটক করেছি ক্যাম্প থেকে একটু দূরে। সি. পি. আই. (এম)-এর তৈরি করা স্টেজে। অথচ রিফিউজি ক্যাম্পের সমস্ত লোক নাটক দেখতে এসেছে। নাটক যখন চরম মুহূর্তটির দিকে এগুচ্ছিল, একজন সি. পি. এম. কর্মী পরামর্শ দিলেন, দাদা এই জায়গায় একটু প্রম্পট করে দিন 'এহিয়া ইন্দিরা এক হ্যায়।' তাই দিলাম। কথাটা যখন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হল, সে কী তুমুল করতালি আর গোটা মাঠভর্তি মানুষের মধ্যে কী তীব্র উত্তেজনা! জানেন তো বারাসত হল সি. পি. আই. এম.-এর সবচে মজবুত ঘাঁটি। কংগ্রেসের মাস্তানরা এসে কোনো উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টা যদি করত, তা হলে একটাও জান নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত না। উত্তেজনার তোড়ে পানির জগটা মুখে নিয়ে ঢকঢক করে অনেকখানি পানি খেয়ে ফেলল। এরই মধ্যে মাসুমের উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে কলকাতার লোকের মতো টানটোন লক্ষ করা যাচ্ছে। গালের বাঁ দিকটা মুছে নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করল, এহিয়া ইন্দিরার মধ্যে কি কোনো বেশকম আছে। এহিয়ার সৈন্যরা সরাসরি খুন করছে। শ্রীমতী বাংলাদেশ ইস্যুটাকে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছেন। এতে তাঁরই লাভ। বিরোধী দলগুলোকে কাবু করার এমন সুযোগ তিনি জীবনে কি আর কোনোদিন পাবেন? নকশালদের তৎপরতা এখন কোথায়? এখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বোমা ফাটে না কেন? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার জনগণের যে জাগ্রত সহানুভূতি, ইন্দিরাজি সেটাকেই নিজের এবং দলের আখের গুছাবার কাজে লাগাচ্ছেন। এতকাল সি. পি. এম. বলত শাসক কংগ্রেস বাংলাদেশের মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে। তাদের দেশে ফেরত পাঠাবার কোনো বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে না। এখন সেকথা সবাই বলছে। এই তো সেদিন যুগান্তরের মতো কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ সাংবাদিকও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা তুঙ্গে উঠেছে। আর ওদিকে শ্রীমতী ইউরোপ, আমেরিকায় 'বাবু' ধরে বেড়াচ্ছেন। মাসুমের কলকাতায় এসে অনেক উন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল জিভটি অত্যন্ত ধারালো এবং পরিষ্কার হয়েছে। এখন যে-কোনো সভাসমিতিতে দাঁড় করিয়ে দিলে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা লেকচার ঝাড়তে পারে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমার এই মূল্যবান বক্তৃতার বাকি অংশ নাহয় আরেকদিন শোনা যাবে। আজকে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। এখনো দাঁত মাজিনি। মুখ ধুইনি। কিছু মুখেও তো দিতে হবে। খালিপেটে কি আর লেকচার ভালো লাগে? স্পষ্টতই মাসুম বিরক্ত হল। তার জ্বলন্ত উৎসাহে বাধা পড়েছে। আপনি যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, ভেতরে ভেতরে একটি পেটি বুর্জোয়া। আমি বললাম,

তোমার এই শ্রেণী বিশ্লেষণের কাজটিও আরেকদিন করতে হবে। আপাতত নরেশদা কোথায় আছেন, সংবাদটা জানিয়ে আমাকে বাধিত করো। কী জানি এখন কোথায় আছেন। কিছুক্ষণ আগে তো দেখলাম রাঁধুনি চিত্তের সঙ্গে ঘুটুর ঘুটুর করে কীসব কথাবার্তা বলছেন। দানিয়েল ভাই জানেন, এই নরেশদা লোকটার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হয়। আপনার সঙ্গে তবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলা যায়, নরেশদা গাছের মতো মানুষ। কোনো ব্যাপারেই কোনো রিঅ্যাকশন নেই।

আমি গামছাটা কাঁধে দুলিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেলাম। চাপাকলের গোড়ায় দেখি কোনো ভিড় নেই। দুটো মাত্র চাপাকল। একশো দেড়শোজন ছাত্রের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। গোসলের সময়টিতেও একটা তীব্র কম্পিটিশন লেগে যায়। প্রথম প্রথম এখানে গোসল করতে আসতে ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করতাম। কারণ, হোস্টেলের ছাত্রদের অনেকেরই আসল নিবাস পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ। কারো কারো মা, ভাই, আত্মীয়, স্বজন এখনো বাংলাদেশে রয়ে গেছে। তবে একথা সত্যি যে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশের অত্যাচারে এদের দেশ ছাড়তে হয়েছে। অনেকের গায়ে টোকা দিলেই গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, ঝিনাইদহ এসকল এলাকার গন্ধ পাওয়া যাবে। জীবন্ত ছাগল থেকে চামড়া তুলে নিলে যে অবস্থা হয়, এদের দশাও অনেকটা সেরকম। কলকাতা শহরে থাকে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে ঢেউ খেলছে পূর্ববাংলার দীঘল বাঁকের নদী, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, হাট-ঘাট ক্ষেত, ফসল, গরু-বাছুর। আমি গোসল করতে গেলেই নিজেরা বলাবলি করত, কীভাবে একজনের বোনকে মুসলমান চেয়ারম্যানের ছেলে অপমান করেছে। অন্যজন বলত পাশের গাঁয়ের মুসলমানেরা এক রাতের মধ্যে ক্ষেতের সব ফসল কেটে নিয়ে গেছে। ছোটখাটো একটি ছেলে তো প্রায় প্রতিদিন উর্দু পড়াবার মৌলবিকে নিয়ে নিত্যনতুন কৌতুক রচনা করত। ভাবতাম আমাকে নেহায়েত কষ্ট দেওয়ার জন্যই এরা এসব বলাবলি করছে। অথচ মনে মনে প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। প্রায় প্রতিটি ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উঃ সংখ্যালঘু হওয়ার কী যন্ত্রণা! তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হত সুলতান মাহমুদ, আলাউদ্দিন খিলজী থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত, যত অত্যাচার হিন্দুদের ওপর হয়েছে তার জন্য যেন আমিই অপরাধী। মাঝে মাঝে ভাবতাম, বার্মা কি আফগানিস্তান কোথাও চলে যাওয়া যায় না। এখন অবশ্য আমার নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন এসেছে। যেখানেই পৃথিবীর দুর্বলের ওপর অত্যাচার হয়, মনে হয়, আমি নিজেও তার জন্য অল্পবিস্তর দায়ী। কেন এসব অনুভূতি হয় বলতে পারব না। এখন আমাকে সবাই সমাদর করে। আমি অসুস্থ মানুষ বলে কেউ কেউ আমাকে বালতিতে পানি ভরতি করে দিয়ে যায়। সম্যক পরিচয়ের অভাবই হচ্ছে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের মূল।

আমি গোসল সেরে এসে দেখি, নরেশদা কাপড়-জামা পরে একমাত্র কাঠের চেয়ারখানার ওপরে ব্যালকনির দিকে মুখ করে বসে রয়েছেন। ঘরে আমার পূর্বপরিচিত জয়সিংহ ব্যানার্জী তাঁর যজমানের মেয়েটিকে নিয়ে মুখ নিচু করে বসে আছেন। এই জয়সিংহ ব্যানার্জীর সঙ্গে বাংলাবাজারে আমার পরিচয়। একটা ছোট বইয়ের দোকান চালাত। ব্রাহ্মণ জানতাম। কিন্তু যজমানি পেশাটাও একই সঙ্গে করছে, জানতে পারলাম

কলকাতা এসে। প্রিন্সেপ স্ট্রিটে দেখা, সঙ্গে একটি মেয়ে। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যজমান-কন্যা। নরেশদা বোধ হয় জয়সিংহ ব্যানার্জী মানুষটিকে ঠিক পছন্দ করতে পারেননি। এই অপছন্দের কারণ, জিগগেস করতে যেয়েও করতে পারিনি। কতজনের কত কারণ থাকে। ওদের আজকে যে আসার কথা দিয়েছিলাম, সেকথা মনেই ছিল না। আমার পায়ের শব্দে নরেশদা পেছন ফিরে তাকালেন। এত দেরি করলে যে। আমি বললাম, দেরি আর কোথায় করলাম। ঘুম থেকে উঠতেই দেরি হয়ে গেল। তার ওপর মাসুমের আস্ত একখানি লেকচার হজম করতে হল। টিফিন করতে যাবে না? সেকী, আপনি সকাল থেকে কিছু না খেয়েই বসে আছেন? তিনি বললেন, তুমি কী মনে কর? মনে করাকরি নিয়ে কাজ নেই। চলুন।

জয়সিংহ ব্যানার্জীকে বললাম, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এই আমরা কিছু খেয়েই চলে আসব। নরেশদা বললেন, উনারাও সঙ্গে চলুন। আমাকে তো রুম বন্ধ করে যেতে হবে। আর তো কেউ নেই। পাহারা দেবে কে? আমি যাব আমার কাজে, তোমাকেও বোধ হয় বেরোতে হবে। অতএব কাপড়চোপড় পরে একেবারে তৈরি হয়ে নেয়াই উত্তম। মনে আছে তো তিনটের সময় তোমাকে কোথায় যেতে হবে? আমার শরীরে একটা প্রদাহ সৃষ্টি হল। বললাম, চলুন, চলুন, রাস্তার ওপাশের ছোট্ট অবাঙালি দোকানটিতে যেয়ে পুরি তরকারি খেয়ে নিলাম। জয়সিংহ ব্যানার্জী এবং তাঁর যজমান কন্যা কিছুতেই খেতে রাজি হলেন না। তাঁরা বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখলেন।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই দেখছি আকাশে বড় বড় মেঘ দৌড়াদৌড়ি করছে। তখনো মাটির ভাঁড়ের চা শেষ করিনি। ঘন কালো মেঘে মেঘে কলকাতার আকাশ ছেয়ে গেছে। একটু পরেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এল। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের আর বেরুবার কোনো উপায় রইল না। নরেশদা বললেন, এর পরে তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, এদের নিয়ে প্রিন্সেপ স্ট্রিটে সোহরাব সাহেবের কাছে যাব। তিনি যদি একটি স্লিপ ইস্যু করে দেন, তা হলে এঁরা কলকাতা শহরে থেকেই রেশন ওঠাতে পারবেন। তিনি জবাব দিলেন না। পাজামা অনেক দূর অবধি গুটিয়ে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই—তোমরা একটু বসো আমি ছাতাটি নিয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেলেন। গিয়ে আবার তিন চার মিনিটের মধ্যে ছাতাসহ ফিরে এলেন। জিগগেস করলাম, এত প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে আপনি কোথায় চললেন? তিনি বললেন, শেয়ালদা। ওমা শেয়ালদা কেন? মধ্যমগ্রামে গিয়ে প্রণব আর সুব্রতবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। আমার হাতে চাবি দিয়ে বললেন, ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। চিত্তের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। দেখবে তক্তপোশের নিচে দুটো বাটি আর টেবিলের ওপর একটি ব্যাগ। ওসব ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে যাবে। আস্ত ব্যাগটাই তায়েবার কাছে রেখে আসবে। আর ধরো এই ত্রিশটা টাকা রইল। তিনি হাঁটু অবধি পাজামা গুটিয়ে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মধ্যমগ্রামের সুব্রতবাবু নরেশদাকে স্কুলে একটা চাকরি দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেই ভরসায় এই বৃষ্টি বাদল মাথায় করে তিনি মধ্যমগ্রাম যাচ্ছেন। আমাদের বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ভেতরে ভেতরে কী তীব্র চাপ অনুভব করলেই না নরেশদার মতন আরামপ্রিয় স্থবির মানুষ শেয়ালদার

রেলগাড়িতে এই ঝড়-জল তুচ্ছ করে ভিড় ঠেলাঠেলি উপেক্ষা করে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত ছুটে যেতে পারন। বাইরে যতই নির্বিকার হোন না কেন, ভেতরে ভেতরে মানুষটা ভেঙে খান-খান হয়ে যাচ্ছেন।

নরেশদা চলে যেতেই আমরা তিনজন অপেক্ষাকৃত হালকা বোধ করলাম। তাঁর উপস্থিতির দরুন জয়সিংহ ব্যানার্জী স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। আমরা টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। বাইরে বিষ্টি পড়ছে বলে তো আর দোকানে বসে থাকা যায় না। দোকানের মালিকের আড়চোখে চাওয়ার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরো তিন ভাঁড় চা চেয়ে নিলাম। একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলাম। আমাদের ভাবখানা এই, বিষ্টিথামা অবধি এই ভাঁড় দিয়েই চালিয়ে যাব। পঁচিশ পয়সা দামের চায়ের ভাঁড় তো আর সমুদ্র নয়। একসময়ে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বিষ্টি থামল না। দোকানি এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলল, বাবুজি এবার উঠতে হোবে। আমার দোসরা কাস্টমারকে জায়গা দিতে হোবে। আমি বললাম, এই বিষ্টির মধ্যে আমি যাব কেমন করে। দোকানি মোক্ষম জবাব দিল, বাবু বিষ্টি তো আমি মন্তর পড়ে নামায়নি। আপনারা বোলছেন যাব কেমন করে, ওই দেখুন। মাথা বাড়িয়ে দেখলাম শত শত মানুষ এই প্রবল বিষ্টির মধ্যেও এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। ওদিক থেকে এদিকে আসছে। মেয়েদের শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট ভিজে শপ শপ করছে। ট্রাক বাস দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের নিরন্তর পথ চলার কোনো বিরাম নেই।

অগত্যা আমাদেরও উঠতে হল। কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ির রোয়াকে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তারপর আর কিছুদূর গিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বাঁকে ড. বিধান রায়ের বাড়ির কাছে চলে এলাম। কিন্তু বর্ষণের বেগ আমাদের থামতে দিচ্ছিলো না। আমরা আরেকটা চালার নিচে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার ছল করে আরেকটু আশ্রয় চুরি করলাম। চা খেতে খেতেই বিষ্টির বেগ একটু ধরে এল। এই সুযোগেই আমরা প্রিন্সেস স্ট্রিটের অফিসটিতে চলে এলাম। ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। ঠেলাঠেলি, কনুই মারামারি করছে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু কেউ কাউকে পথ দিচ্ছে না। সকলেই অসহায়। সকলেই একটুখানি আশ্রয় চায়। অফিস বিল্ডিংয়ের পাশের খালি জায়গাটিতে প্রতি রাতে হাজার হাজার বাংলাদেশের তরুণ ঘুমোয়। একখানি চাদর বিছিয়ে লুঙ্গিটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে কেউ কেউ। যার তাও নেই, কাঁকর বিছানো মাটিকেই শয্যা হিসেবে মেনে নিয়ে রাত গুজরান করে। এদের মধ্যে ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ তরুণ যেমন আছে, আছে ধাড়ি নিষ্কর্মার দল। চোর ছ্যাঁচড় এমনকি কিছু কিছু সমকামী থাকাও বিচিত্র নয়। অন্যান্য দিন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। গোটা সংখ্যাটা একসঙ্গে দেখা যেত না। আজ বাসাভাঙা কাকের মতো সবাই অফিস বিল্ডিংটিতে একটুখানি ঠাঁই করে নিতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। যেদিকেই তাকাই না কেন শুধু মাথা, কালো কালো মাথা। ওপরে ওঠা প্রথমে মনে হয়েছিল অসম্ভব। ভিড়ের মধ্যে একটি আঙুল চালাবার মতোও খালি জায়গা নেই। কেমন করে যাব, একটি মেয়ে বয়সে যুবতী তার গায়ের কাপড় ভিজে গায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে লেগে গেছে, এই অবস্থায় এতগুলো মানুষ তাকে দেখছে, দেখে আমি নিজেই ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেলাম। এরই মধ্যে দেখি মানুষ ওপরে উঠছে এবং ওপর থেকে নিচে নামছে।

আমরা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপরে উঠে এলাম। কী করে ওপরে এলাম, সেটা ঠিক ব্যক্ত করা যাবে না। যে কষ্টকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তার সঙ্গে এই ওপরে ওঠার কিঞ্চিৎ তুলনা করা চলে। অফিসের খোপ খোপ কাউন্টারগুলোতে আজ আর কোনো কাজ চলছে না। সর্বত্র মানুষ গিসগিস করছে। এখানে সেখানে মানুষ ঝাঁক ঝাঁক মৌচাকের মতো জমাট বেঁধে আছে। জয়সিংহ ব্যানার্জীকে বললাম, এত কষ্ট করে আসাটা বৃথা হয়ে গেল। এই ভিড় ঠেলাঠেলির মধ্যে আমি সোহরাব সাহেবকে খুঁজব কোথায়? এই সময়ে দেখা গেল তিনতলার চিলেকোঠার দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে এবং ইশারা করে ডাকছে। কাকে না কাকে ডাকছে। প্রথমে বিশেষ আমল দিইনি। সিঁড়িতেও মানুষ, তিল ধারণের স্থান নেই। লোকজন এই জল অচল ভিড়ের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এই যে, আপনাকে ওপরে ডাকা হচ্ছে। ওপরে গিয়ে দেখলাম সোহরাব সাহেব পাজামা হাঁটুর ওপর তুলে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে চারমিনার টানছেন আর শেখ মুজিবের মুণ্ডুপাত করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আজ বঙ্গবন্ধু শব্দটি তিনি উচ্চারণ করলেন না। আরেকজন ছাত্রনেতা নীরবে বসে বসে সোহরাব সাহেবের কথামৃত শ্রবণ করছে। ছাত্রনেতাটিরও ইয়তো জরুরি কোনো ঠেকা আছে। অথবা হতে পারে সোহরাব সাহেবের খুব রিলায়েবল লোক। নইলে নির্বিবাদে এমন বিরূপ মুজিবচর্চা এই প্রিন্সেপ স্টিটের অফিসে কেমন করে সম্ভব। আমি বললাম, চুটিয়ে তো নেতার সমালোচনা করা হচ্ছে। যদি আমি চিৎকার করে জনগণকে জানিয়ে দিই তখন বুঝবেন ঠেলাটা। তখখুনি আমার দৃষ্টি সোহরাব সাহেবের হাঁটুর দিকে ধাবিত হল। যতটুকু পাজামা গুটিয়েছেন, দেখা গেল কালো কালো লোমগুলো সোজা দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে লোমের বন। ঘরে একজন মহিলা আছে দেখেও তিনি পাজামাটা ঠিক করে নিলেন না। বসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না স্বল্পপরিসর কক্ষটিতে। তাই দাঁড়িয়ে রইলাম। সোহরাব সাহেব বললেন, নেতাকে বকব না তো কাকে বকব। নেতার ডাকেই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। আজকে আসার সময় দেখলাম, বাচ্চাটার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। যে ঘরটিতে থাকি পানি উঠেছে। আর কত কষ্ট করব। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেললেই হয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। আমি বললাম, আপনি যদি একথা বলেন, তা হলে গোটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা দাঁড়াবে কিসের ওপর।

সোহরাব সাহেব বললেন, সাধে কি আর এরকম কথা মুখ দিয়ে আসে। কতদিকে কতকাণ্ড ঘটছে সেসবের হিসেব রাখেন? আমি বললাম, কোনো হিসেবই রাখিনে সোহরাব সাহেব। কী করে রাখব। সোহরাব সাহেব আমার হাতে একটা লিফলেট দিয়ে বললেন, আপনি হার্মলেস মানুষ, তাই বিশ্বাস করে পড়তে দিচ্ছি। লিফলেটটি আগরতলা থেকে বেরিয়েছে। সংক্ষেপে তার মর্মবস্তু এরকম : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়বার আগে এক ঘরোয়া সভা ডেকেছিলেন। তাতে তিনি যদি পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন, কী কী করতে হবে সেসকল বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই সভায় একজন নাকি শেখ সাহেবের কাছে সাহস করে জিগগেস করছিল, বঙ্গবন্ধু, আপনার অবর্তমানে আমরা কার নেতৃত্ব মেনে চলব? শেখ সাহেব আঙুল তুলে শেখ মনিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, তোমরা এর নেতৃত্ব মেনে চলবে।

লিফলেটটা ফেরত দিলে তিনি পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে একটা জেন্ট সাইজের পকেট রুমালের মতো পত্রিকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই দাগ দেয়া অংশটুকু পাঠ করুন। তারপর বিশুদ্ধ বাঙাল উচ্চারণে বললেন, নেতাকে কি আর সাধে গাইল্যাই। পত্রিকাটিও পড়ে দেখলাম। সংক্ষেপে সারকথা এই, আগরতলাতে নেতৃত্বের দাবিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রের দল একরকম সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল। তার প্রতিবাদে আগরতলার জনসাধারণ প্রকাশ্য সভা করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আগরতলার মাটিতে বাংলাদেশের মানুষদের এই মারামারি হানাহানি তারা বরদাস্ত করবে না। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে চায় নিজেদের দেশে গিয়ে করুক। কাগজটা ফেরত দিয়ে সোহরাব সাহেব আমাকে জিগগেস করলেন, ভালো লেখেনি? আমি মাথা নাড়লাম। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে বাত ধরে গেছে। সুতরাং অধিক কথা না বাড়িয়ে বলে ফেললাম, সোহরাব সাহেব আপনার কাছে এদের জন্য একটা রেশনকার্ড ইস্যুর স্লিপ নিতে এসেছিলাম। আমি জয়সিংহ ব্যানার্জী এবং তার যজমানের মেয়ে সবিতাকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আরে সাহেব আপনি আমায় মুশকিলে ফেললেন। এই ভিড় হট্টগোলের সময় আমি কাগজ কোথায় পাই, কী করে কলম জোগাড় করি। আমি পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে বললাম, এই নিন, আপনি লিখে দিন। তিনি খসখস করে গতবাঁধা ইংরেজিতে লিখে দিলেন, প্লিজ ইস্যু রেশন কার্ড ফর মি. সো অ্যান্ড সো ... ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাঁদিকের কাউন্টারে যে লোক বসে তাকে দেখালে একটা স্লিপ দিয়ে দেবেন। ওরা চলে গেল। আমরা আরো কিছুক্ষণ গল্পগাছা করলাম। এরই মধ্যে বিষ্টি ধরে এসেছে। তবে মেঘ কাটেনি। ঘড়িতে দেখলাম একটা বাজে। আমাকে উঠতে হল। দোতলায় নেমে দেখি আবদ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে চলাচলের একটা সাড়া পড়ে গেছে। একটানা অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকার পর মানুষদের মধ্যে একটা চলমানতার সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে দেখতে ভিড় অনেকটা হালকা হয়ে এল। নিচে নেমে এলাম। রাস্তায় পানি নামতে অনেক সময় লাগবে। তাও যদি আবার বিষ্টি না হয়। এখন আমি কী করব চিন্তা করছি। এমন সময় পিস্তলের আওয়াজের মতো একটা তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এই যে দাদা আপনারে একটা কথা জিগাইবার লাইগ্যা ডাক্তার রায়ের বাড়ি থেইক্যা ফলো করছি। আমি তাকিয়ে দেখলাম; লোকটার গাত্রবর্ণ ধানসেদ্ধ হাঁড়ির তলার মতো কৃষ্ণবর্ণ। মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। পরনে একখানি ময়লা হাঁটু ধুতি। গায়ের জামাটিও ময়লা। একেবারে আদর্শ জয়বাংলার মানুষ। কিছুক্ষণ তাকিয়েও কোনো হদিশ করতে পারলাম না, কে হতে পারে। লোকটি বলল, আমারে আপনে চিনতে পারতাছেন না দাদা, আমি বাংলাবাজারের রামু। ওহ্ রামু তুমি কেমন আছ? দাদা ভগবান রাখছে। তোমার মা বাবা সবাই ভালো? দাদা মা বাবার কথা আর জিগাইবেন না। সব কটারে দেশের মাটিতে রাইখ্যা আইছি। রামু হুহু করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতিটি হিন্দু পরিবারেরই বলতে গেলে এরকম একেকটা করুণ ভয়ংকর কাহিনী আছে। এসব কথা শুনতে বিশেষ ভালো লাগে না। কারণ আমি তো ভুক্তভোগী নই। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই রামু আমাকে ছেড়ে দিয়ে সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে

সরাসরি জানতে চাইল, দাদা জয়সিংহ ঠাকুরের লগে আপনার এত পিরিত কিয়ের। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে মনে রামুকে ধন্যবাদ দিলাম। একটা পীড়াদায়ক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে রামু। বললাম, রামু পিরিত-টিরিত কিছু নয়। জয়সিংহ তাঁর যজমানের মেয়েকে নিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়েছেন। আমাকে ধরেছেন একটা রেশন কার্ডের স্লিপ করিয়ে দেবার জন্য। তা করিয়ে দিলাম। মেয়েটির নাকি আর কোনো অভিভাবক নেই। তাই তাকে পোষার দায়িত্বও জয়সিংহের ঘাড়ে এসে পড়েছে। অন্যায় কিছু করেছি রামু? রামু এবারে রাগে ফেটে পড়ল। শালা বদমাইশ বাউন, মা আর বুন দুইডা ক্যাম্পে কাঁইদ্যা কাঁইদ্যা চোখ ফুলাইয়া ফেলাইছে। আর হারামজাদা মাইয়াডারে কইলকাতা টাউনে আইন্যা মজা মারবার লাগছে। আর ওই মাগিডাও একটা খানকি। বুঝলেন দাদা এই খবরটা আপনেরে জানান উচিত মনে কইর‍্যা পাছু ধরছিলাম। তারপর উত্তরের কোনো পরোয়া না করে রামু হাঁটু ধুতিটা আরো ওপরে তুলে রাস্তায় পানির মধ্যে পা চালিয়ে হনহন করে চলে গেল। হঠাৎ করে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কাউকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে জাগছিল। করার মতো কিছু না পেয়ে রেগে দাঁতে অধর চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে থুতনির কাছে তরল পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে, আঙুল দিয়ে দেখি রক্ত। আমার অধর কেটে গিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

৪

হোস্টেল পৌঁছুতে বেলা দুটো বেজে গেল। ক্ষিতীশ কলেজ থেকে ফিরেছে। বলল, দাদা মেজদা নাকি চিত্তকে কীসব রান্নাবান্না করার ফরমায়েশ দিয়ে গেছে। চিত্ত বারেবারে খুঁজছে। আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি,। নইলে নিজেই কবে খেয়ে নিতাম। ব্যাপার জানেন নাকি কিছু? বললাম, হ্যাঁ ক্ষিতীশ, একজন রোগীর জন্য কিছু খাবার রান্না করে নিতে হবে হাসপাতালে। যদি এরই মধ্যে রান্না হয়ে গিয়ে থাকে তুমি একটু কষ্ট করে ভাত আর মাছ আলাদা আলাদাভাবে এই বাটিটার মধ্যে ভরে দিতে বলো। তক্তপোশের তলা থেকে আমি ছোট্ট বাটিটা বের করে ক্ষিতীশের হাতে দিলাম। অল্পক্ষণ পর ক্ষিতীশ ভাত-তরকারিভর্তি বাটিটা নিয়ে এলে আমি পেটমোটা হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে আস্ত বাটিটা ব্যাগের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলাম। ক্ষিতীশ জিগগেস করল, দাদা কি এখনই বেরুবেন? আমি বললাম, হাঁ ক্ষিতীশ আমাকে এখখুনিই বেরুতে হচ্ছে। কতদূর যাবেন? পি. জি. হাসপাতাল। ক্ষিতীশ বলল শহরে কোনো ট্রামবাস চলছে না, রাস্তায় এককোমর জল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, যে-কোনো সময়ে বিষ্টি নামতে পারে। ব্যালকনির দিকে দরোজা জানালা খুলে দিল। কালো মেঘ কলকাতার আকাশের চার কোণ ছেয়ে একেবারে নিচে নেমে এসেছে। ট্রাম বাস ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে টানা রিকশাগুলো ডিঙি নৌকোর মতো চলাফেরা করছে। বাস্তবিকই পথে বেরুবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তথাপি মানুষ চলাচল করছে। মহিলারা মাথায় ছাতা মেলে ধরছে বটে কিন্তু অনেকেরই পরনের শাড়ি কোমর অবধি ভিজে গেছে। আমি বললাম, যেতেই হবে আমাকে। তুমি বরং একটা উপকার করো। নিচের কোনো দোকান থেকে সস্তায়

একটা জয় বাংলা বর্ষাতি কিনে এনে দাও। বিশটি টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিলাম। সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিচে চলে গেল।

ইত্যবসরে আমি একটা পুরোনো প্যান্ট পরে হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিলাম। দেশ থেকে এক জোড়া জুতো এনেছিলাম। কলকাতায় আসার পর বিশেষ পরা হয়নি। সেটা পরে নিলাম। স্যান্ডেল জোড়ার যে অবস্থা হয়েছে আশঙ্কা করছিলাম পানির সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। ক্ষিতীশ বর্ষাতি কিনে এনে দিলে, পরে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে নামতেই আবার ঝম ঝম করে বিষ্টি নামল। বর্ষণের বেগ এত প্রবল, পাঁচহাত দূরের জিনিসও ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাচ্ছে। ফুটপাত দিয়ে চলতে গিয়ে পরপর দুজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে ফেললাম। রাস্তা পানিতে ফুলে ফেঁপে একটা ছোটখাটো বাঁকা নদীর মতো দেখাচ্ছে। এই কোমরপানির মধ্যে চলতে গিয়ে আমার মনে হল শরীরে মনে যেন আমি কিছুটা কাঁচা হয়ে উঠেছি। এই ধারাজল আমার শরণার্থী জীবনের সমস্ত কালিমা ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য একটা সুড়সুড়ি অনুভব করছিলাম। আমি যেন আবার সেই ছোট্ট শিশুটি হয়ে গেছি। মনে পড়ে গেল বাড়ির পাশের খালটিতে কী আনন্দেই না সাঁতার কাটতাম। ছাঁৎ করে মনে পড়ে গেল। একবার ঝড়বিষ্টির মধ্যে ভিজে চুপসে তায়েবাদের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। তায়েবা দরোজা খুলে আমাকে দেখে রবীন্দ্রনাথের সে-গানটির দুটো কলি কী আবেগেই না গেয়ে উঠেছিল, "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার" সেদিন আর আজ। আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছি। প্রতি পদক্ষেপে অতীত, আমার আর তায়েবার অতীত, মনের মধ্যে ঢেউ দিয়ে জেগে উঠছে।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশশো আটষট্টি সালে। সেদিনটার কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারব না। আগস্ট মাসে একটা দিনে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি গিয়েছিলাম বাংলাবাজারের প্রকাশক পাড়ায়। নানা কারণে মনটা বিগড়ে গিয়েছিল। সুনির্মলদা আমাকে বললেন, চলো একটা জায়গায় ঘুরে আসি। হেঁটে হেঁটে গেন্ডারিয়ার লোহারপুল পেরিয়ে বুড়িগঙ্গার পারের একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির সামনে এসে সুনির্মলদা বললেন, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি দেখি ভেতরে কেউ আছে কি না। তিনি এগিয়ে গিয়ে দরোজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। সুনির্মলদা ভেতরে ঢুকলেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, এসো দানিয়েল। আমিও ভেতরে প্রবেশ করলাম। সুনির্মলদা বললেন, দেখো তায়েবা কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। সাদা শাড়ি পরিহিতা উজ্জ্বল শ্যামল রঙের মহিলাটি আমাকে ঘাড়টা একটুখানি দুলিয়ে সালাম করল। সুনির্মলদা তক্তপোশের শাদা ধবধবে চাদরের ওপর পা উঠিয়ে বসলেন। মহিলাটি বললেন, আপনিও পা উঠিয়ে বসুন। ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললাম, আমার পায়ে অনেক ময়লা। আপনার আস্ত চাদরটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বরঞ্চ আমাকে একটা অন্যরকম আসন দিন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি আপনি পাটা ধুয়েই বসুন। আমি পানি এনে দিচ্ছি। এক বদনা পানি এনে দিলে, আমি পা দুটো রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করে বিছানার ওপর বসেছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন আমি একটা পাটভাঙা শাদা পাঞ্জাবি পরেছিলাম। কী একখানা লাল মলাটের বই সারাক্ষণ বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবির বুকের অংশে মলাটের

লাল রঙটা গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। মহিলাটি আমার পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল, ওমা আপনার পাঞ্জাবিতে এমন খুনখারাবির মতো রং দিয়েছে কে? আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কেউ দেয়নি। কখন বইয়ের মলাটের রংটা পাঞ্জাবিতে লেগে গেছে খেয়াল করিনি। লক্ষণ সুবিধের নয় বলে মহিলাটি সুন্দর শাদা দাঁত বেরিয়ে হাসল। ফুলদানিতে একটি সুন্দর রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তার হাসিটি রজনীগন্ধার মতো সুন্দর স্নিগ্ধ। ঘাড়টাও রজনীগন্ধার মতো ঈষৎ নোয়ানো।

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম ঘরে বিশেষ আসবাবপত্তর নেই। তক্তপোশের ওপর হারমোনিয়াম, তবলা এবং তানপুরা। পাশে পড়ার টেবিল। সামনে একখানি চেয়ার। শেলফে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পাঠ্য বই। একেবারে ওপরের তাকে সেই চমৎকার চারকোনা ফুলদানিটি, যার ওপর শোভা পাচ্ছে সদ্যচ্ছিন্ন রজনীগন্ধার গুচ্ছ। মনে মনে অনুমান করে নিলাম, এ বাড়িতে গানবাজনার চল আছে। এ বাড়ির কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এই ঘরজোড়া তক্তপোশটিতে নিশ্চয়ই একের অধিক মানুষ অথবা মানুষী ঘুমোয়।

সুনির্মলদা বললেন, দানিয়েলের সঙ্গে এখনো পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। দানিয়েল, এ হল আমাদের বোন তায়েবা। আর ও হচ্ছে দানিয়েল, অনেক গুণ, কালে কালে পরিচয় পাবে। তবে সর্বপ্রধান গুণটির কথা বলে রাখি, ভীষণ বদরাগী। নাকের ওপর দিয়ে মাছি উড়ে যাওয়ার উপায় নেই, দুটুকরো হয়ে যায়। তায়েবা সায় দিয়ে বলল, বা রে, যাবে না, যা খাড়া এবং ছুঁচোলো নাক। মহিলা আমার তারিফ করল কি নিন্দে করল সঠিক বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আরো দুজন মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। মুখের আদলটি তায়েবারই মতো। তবে একজনের রং একেবারে ধবধবে ফর্সা। তার পরনে শাড়ি। আরেক জন অত ফর্সা নয়, কিছুটা মাজা, তার পরনে সালোয়ার কামিজ। তায়েবা পরিচয় করিয়ে দিল। সালোয়ার পরিহিতাকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন। নাম দোলা। বি.এ. পরীক্ষা দেবে। খেলাধুলার দিকে ওর ভীষণ ঝোঁক। আর ও হচ্ছে তার ছোটোটি নাম ডোরা। গানবাজনা করে। সুনির্মলদা আপনারা কথাবার্তা বলুন, কিছু খাবার দেয়া যায় কি না দেখি।

সেদিন গেন্ডারিয়ার বাসা থেকে ফিরে আসার সময় দেখি আকাশে একখানা চাঁদ জ্বলছে। আমি পাঞ্জাবির বুকের লালিয়ে যাওয়া অংশটি বারবার স্পর্শ করে দেখছিলাম। এ কি সত্যি সত্যি বইয়ের মলাটের রং নাকি হৃদয়ের রং, রক্ত মাংস চামড়া ভেদ করে পাঞ্জাবিতে এসে লেগেছে। আমার মনে হয়েছিল, ওই দূরের রুপোলি আভার রাত আমার জন্যই এমন অকাতরে কিরণধারা বিলিয়ে দিচ্ছে। কামিনী হাস্নাহেনা আমার ইন্দ্রিয়গ্রামের গভীর পরিতৃপ্তির জন্য এমন হৃদয়জুড়োনো সুবাস ঢালছে। আজ সুনির্মলদার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ। তবু, তবু আমি তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিতে পারব, কেননা তিনি আমাকে বুড়িগঙ্গার পাড়ে তায়েবাদের সে গেন্ডারিয়ার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে বাঁক ঘুরে রবীন্দ্র সদন অভিমুখী রাস্তাটা ধরতেই পানির প্রতাপ কমে এল। বিষ্টি হচ্ছে, তথাপি রাস্তাঘাটে জল দাঁড়ায়নি। এতক্ষণ কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় এতদূর চলে এসেছি। এখন নিজের দিকে তাকাতে একটু চেষ্টা করলাম। প্যান্টে নিশ্চয়ই পচা পানির সঙ্গে কলকাতার যাবতীয় ময়লা এসে মিশেছে।

লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় এখন থেকেই চুলকোতে শুরু করেছে। বর্ষাতিটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। সস্তার তিন অবস্থার এক অবস্থা প্রথম দিনেই প্রত্যক্ষ করা গেল। এখানে সেখানে ছড়ে গেছে। পায়ের নিচের জুতো জোড়ার অবস্থা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছিনে। প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করছি, বিষ্টিতে গলে যাওয়া এঁটেল মাটির মতো সোলটা ফকফকে হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আরেকবার সামনে চরণ বাড়ালেই সোল দুটো আপনা থেকেই পাকা ফলের মতো খসে পড়বে। নিজের ওপর ভয়ানক করুণা হচ্ছিল। সিগারেট খাওয়ার তেষ্টা পেয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর ম্যাচ বের করে দেখি ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। দুত্তোর ছাই, রাগ করে সিগারেট ম্যাচ দুটোই ড্রেনের মধ্যে ছুড়ে দিলাম।

হাসপাতালের গেট খুলতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা বাকি। এ সময়টা আমি কী করি। মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। ধারেকাছে কোনো রেস্টুরেন্টও নেই যে বসে সময়টা পার করে দেয়া যায়। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দারোয়ানের কাছে যেয়ে বললাম, ড. মাইতির সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দারোয়ানের বুঝি দয়া হল। সে ঘটাং করে লোহার গেটের পাল্লা দুটো আলাদা করল। আমি ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

তায়েবার কেবিনে ঢুকে দেখি, সে শুয়ে আছে। পাশের বেডের উৎপলা আজও হাজির নেই। তায়েবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে, নাকি এমনিতে চোখ বন্ধ করে আছে। মস্তবড় ফাঁপরে পড়ে গেলাম। আয়াটায়া কিংবা নার্স জাতীয় কাউকে খোঁজ করার জন্য করিডোরের দিকে গেলাম। আমার সিক্ত জুতো থেকে ফ্যাস ফ্যাস হাঁসের ডাকের মতো একধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর প্যান্ট থেকে পানি পড়ে ধোয়া মোছা তকতকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করার অপরাধে যদি ঘাড় ধরে বের করে দেয়, আমার বলার কিছুই থাকবে না। একসময় তায়েবা চোখ মেলে জিগগেস করল, কে? আমি তার সামনে যেয়ে দাঁড়ালে খুব গভীর গলায় পরম সন্তোষের সঙ্গে বলল, ও দানিয়েল ভাই, আপনি এসেছেন তা হলে। আমি সেই পেটমোটা ব্যাগটা তার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললাম, এর মধ্যে ভাত, মাছ রান্না করা আছে। সে ব্যাগটা স্টিলের মিটসেফের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। খুশিতে তার চোখজোড়া চিকচিক করে উঠল। দানিয়েল ভাই বসুন, টুলটা দেখিয়ে দিল। তারপর আমার আপাদমস্তক ভালো করে তাকতেই শক লাগার মতো চমক খেয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসল। একী অবস্থা হয়েছে আপনার দানিয়েল ভাই, সব দেখি ভিজে একেবারে চুপসে গেছে। আমি বললাম, বা রে ভিজবে না, রাস্তায় এককোমর পানি ভেঙেই তো আসতে হল। তায়েবা জানতে চাইল, এ বিষ্টির মধ্যে সব পথটাই কি আপনি হেঁটে এসেছেন? আমি বললাম, উপায় কী? ট্রাক বাস কিছুই তো চলে না। তাছাড়া ট্যাকসিতে চড়া সে তো ভাগ্যের ব্যাপার। সহসা তার মুখে কোনো কথা জোগাল না। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে একটি বড়সড় তোয়ালে আমার হাতে দিয়ে বলল, আপাতত গায়ের ওই কিম্ভূতকিমাকার জন্তুটা এবং পায়ের জুতো জোড়া খুলে গা মাথা ভালো করে মুছে নিন। আমি দেখি কী করা যায়। সে গোবিন্দের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে একেবারে করিডোরের শেষ মাথায় চলে গেল। গায়ের বর্ষাতিটা

খোলার পর ফিতে খুলে জুতোজোড়া বের করার জন্য যেই একটু মৃদু চাপ দিয়েছি অমনি সোলদুটো আপসে জুতো থেকে আলাদা হয়ে গেল। আমার ভয়ানক আফসোস হচ্ছিল। এই এক জোড়া জুতো অনেকদিন থেকে বুকের পাঁজরের মতো কলকাতা শহরের জলকাদা বিষ্টির অত্যাচার থেকে রক্ষে করে আসছি। আজ তার পরমায়ু শেষ হয়ে গেল। গা মোছার কথা ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে খসে পড়া সোল দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই সময়ের মধ্যে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তায়েবা ফিরে এল। সে গোবিন্দকে কী একটা ব্যাপারে অনুরোধ করছে। আর গোবিন্দ বারে বারে মাথা নেড়ে বলছে, না দিদিমনি সে আমাকে দিয়ে হবে না, দেখছেন না কেমন করে বিষ্টি পড়ছে। দোকান-পাট সব বন্ধ। তাদের কথা ভালো করে কানে আসছিল না। আমি জুতো জোড়ার কথাই চিন্তা করছিলাম। তায়েবা গোবিন্দের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী একটা বলতেই তাকে অনেকটা নিমরাজি ধরনের মনে হল। বলল, টাকা আর ছাতার ব্যবস্থা করে দিন। আমার খুব ভয় লাগছিল, পাছে তায়েবা আমাকে কোনো পয়সা টাকা দিতে বলে, আসলে আমার কাছে বর্তমানে বিশ বাইশ টাকার অধিক নেই এবং টাকাটা খরচ করারও ইচ্ছে নেই। পঞ্চাশ নয়া পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাবার জন্য দৈনিক চার ছয় মাইল পথ অবলীলায় হেঁটে চলাফেরা করছি ইদানীং। আমার জুতোর খসে পড়া সোল দুখানি তায়েবার দৃষ্টি এড়াল না। জিগগেস করল, কী হল আপনার জুতোয়? আমি বললাম, কলকাতায় পানির সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে এইমাত্র জুতো লীলা সাঙ্গ করল। সে বালিশের তলা থেকে একটা পার্স বের করে আপনমনে টাকা গুনতে গুনতে উচ্চারণ করল, ও তা হলে এই ব্যাপার। কেবিনের বাইরে গিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে নিচু গলায় আবার কীসব আলাপ করল। ভেতরে ঢুকে আমাকে বলল, আপনার সেই জন্তুটা একটু দিন গোবিন্দ একটু বাইরে থেকে আসবে। গোবিন্দের হাতে নিয়ে বর্ষাতিটা দিল। গোবিন্দ হাঁটা দিয়েছে, এমন সময় ডাক দিয়ে বলল, গোবিন্দদা এক মিনিট দাঁড়াও। আমার কাছে এসে জানতে চাইল, আপনার তো সিগারেট নেই। আমি বললাম, না। কী সিগারেট যেন আপনি খান? চারমিনার। এই ছাইভস্ম কেন যে টানেন! সে দরোজার কাছে গিয়ে বলল। গোবিন্দদা ওখান থেকে পয়সা দিয়ে এক প্যাকেট চারমিনার আর একটা ম্যাচ আনবে। তারপর তায়েবা বাথরুমে যেয়ে পা দুটো পরিষ্কার করে এসে কোনোরকমে নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল। স্যান্ডেল না পরে সে বেরিয়ে গিয়েছিল, এটা সে নিজেই খেয়াল করেনি। এই হাঁটাহাঁটি ডাকাডাকিতে নিশ্চয়ই তার অনেক কষ্ট হয়েছে। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। আসলে তায়েবা সে আগের তায়েবা নেই। একটুকুতেই হাঁপিয়ে ওঠে। এখন সে বিছানায় পড়ে আছে শীতের নিস্তরঙ্গ নদীর মতো। চুপচাপ শান্ত স্থির। আমার কেমন জানি লাগছিল। খুব ম্লান কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, দানিয়েল ভাই জানেন, জীবনে আপনি খুব বড় হবেন। তার গলার আওয়াজটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল। কণ্ঠস্বরে চমকে গেলাম। তবুও রসিকতা করে বললাম, বড় তো আর কম হইনি, এখন বুড়ো হয়ে মরে যাওয়াটাই শুধু বাকি। আপনি সব সময় কথার উলটা অর্থ করেন। থাক, আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। এমনিতেও আমার বিশেষ ভালো লাগছে না। সে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে লাগল। আমি জানতে চাইলাম, তায়েবা

আজ তোমার শরীরটা কি খুব খারাপ? না না অত খারাপ নয়। দেখছেন না কী নোংরা বিষ্টি। তা ছাড়া আমাকে আজ আবার ইঞ্জেকশন দিয়েছে। যেদিন ইঞ্জেকশন দেয় খুবই কষ্ট হয়। অনেকক্ষণ ধরে দিতে হয় তো। আমি বললাম, ঠিক আছে, কথা না বলে চুপ করে থাকো। সারাদিন তো চুপ করেই আছি। একবার মাত্র মাইতিদা এসেছিলেন সেই ইঞ্জেকশন দেয়ার সময়। তার পর থেকেই তো একা বসে আছি। কথা বলব কার সঙ্গে। উৎপলার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে সময় কাটাতাম। কাল শেষরাত থেকে তার অসুখটা বেড়েছে। তাই তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে গেছে। আজ সকালে আমাদের ওয়ার্ডের পঁয়তাল্লিশ নম্বরের হাসিখুশি ভদ্রমহিলাটি মারা গেছেন। আমার কী যে খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আমিও মারা যাব। প্রতিদিন এখানে কেউ না কেউ মরছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ছুটে পালিয়ে যাই কোথাও। আমি বললাম, কোথায় যেতে চাও তায়েবা। সে জবাব দিল, জানিনে। হঠাৎ তায়েবা আমার ডান হাতখানা ধরে বলল, আচ্ছা দানিয়েল ভাই আপনার মনে আছে একবার ঝড় বিষ্টিতে ভিজে সপসপে অবস্থায় আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন? আমি বললাম, কী আশ্চর্য তায়েবা, আসার সময় পথে সেকথাটি আমারও মনে পড়েছে। সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার চেষ্টা করে বলল, বুঝলেন দানিয়েল ভাই, আপনার সঙ্গে আমার মনের গোপন চিন্তার একটা মিল রয়েছে। তায়েবা গুনগুন অস্ফুট স্বরে সে গানের কলি দুটো গাইতে থাকল। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরানসখা বন্ধু হে আমার।

জানেন দানিয়েল ভাই, গেন্ডারিয়ার বাড়ির জন্য আমার মনটা কেমন আনচান করছে। গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি আমাদের পোষা ময়নাটি মরে গেছে। পাশের কাঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। সেই অবধি মনটা হুহু করছে। এরকম বিষ্টির সময় বুড়িগঙ্গা কেমন ফেঁপে ফুলে অস্থির হয়ে ওঠে। পানির সে কেমন সুন্দর চিৎকার। তিন বোন পাশাপাশি একসঙ্গে ঘুমোতাম। দিনাজপুর থেকে মা আর বড় ভাইয়া এসে থাকত। ছোট ভাইটি সারাক্ষণ পাড়ায় ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে বেড়াত। এখন জানিনে কেমন আছে। একটা যুদ্ধ লাগল আর সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। এখানে আমি পড়ে আছি। দোলা গেছে তার গ্রুপের মেয়েদের সঙ্গে ট্রেনিং নিতে সেই ব্যারাকপুর না কোথায়। মা দিনাজপুরে। বড় ভাইয়া কোথায় খবর নেই। ইচ্ছে করেই তায়েবা ডোরার নাম মুখে আনল না। পাছে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বরাবর দেখে আসছি। তায়েবার কাছে গোটা পৃথিবী একদিকে আর ডোরা একদিকে। রেডিও কিংবা টিভিতে ডোরার রবীন্দ্রসঙ্গীতের যেদিন প্রোগ্রাম থাকত, সে রিকশা ভাড়া খরচ করে চেনাজানা সবাইকে বলে আসত আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রামটা শুনবেন, আমার বোন ডোরা গান গাইবে। আর ডোরাও ছিল তায়েবাঅন্ত প্রাণ। অত বড় ডাগর মেয়েটি, তবু তায়েবাকে জড়িয়ে ধরে না ঘুমোলে ঘুম আসত না। তায়েবা কাছে না বসলে খাওয়া হত না। মাঝে মাঝে ডোরার পেটে কী একটা ব্যথা উঠত। তখন তায়েবাকে সবকিছু বাদ দিয়ে ডোরার বিছানার পাশে হাজির থাকতে হত। আজ তায়েবার এই অবস্থায় ডোরা কী করে প্রায়-বুড়ো একজন মানুষের সঙ্গে দিল্লি হিল্লি ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনে। তায়েবা দুচোখ বন্ধ করে আছে। আমি একরকম নিশ্চিত যে, সে ডোরার কথাই চিন্তা করছে।

গলা খাঁকারির শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। গোবিন্দ বাইরে থেকে ফিরে এসেছে। তার হাতে একটা প্যাকেট। ডাক দিল, এই যে দিদিমনি, নিন আপনার জিনিসপত্তর। এর মধ্যে সব আছে। আর ওই নিন পাঁচ টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা ফেরত এসেছে। তায়েবা বলল, অনেকতো কষ্ট করলে গোবিন্দদা, এই টাকাটা তুমিই রাখো। গোবিন্দের ভাঙাচোরা মুখমণ্ডলে খুশির একটা চাপা ঢেউ খেলে গেল। তায়েবা তার বিছানার ওপর প্যাকেটটা উপুড় করল। ভেতরের জিনিসপত্তর সব বেরিয়ে এসেছে। একটা ধুতি, মাঝামাঝি দামের একজোড়া বাটার স্যান্ডেল, সিগারেট, ম্যাচ আর তার নিত্য ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস। আমার দিকে তাকিয়ে তায়েবা কড়া হুকুমের সুরেই বলল, দানিয়েল ভাই, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোকেন। পরনের ওই প্যান্ট খুলে ফেলে এই সাবানটা দিয়ে যেখানে যেখানে রাস্তার পানি লেগেছে ভালো করে রগড়ে ধুয়ে ফেলুন। এ পানির স্পর্শ বড় সাংঘাতিক। স্কিন ডিজিজ-টিজিজ হয়ে যেতে পারে। তারপর এই স্যান্ডেল জোড়া পরবেন। দয়া করে আপনার জুতোজোড়া ওই দিকের ডাস্টবিনে ফেলে আসুন। ওটা তো আর কোনো কাজে আসবে না। আমি বললাম, তায়েবা আমি যে ধুতি পরতে জানিনে। এবার তায়েবা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আপনি এখনো ক্ষেতের কুমড়োই রয়ে গেছেন। কিছুই শেখেননি। অত আঠারো রকমের প্যাঁচগোচের দরকার কী? আপনি দু-ভাঁজ দিয়ে সোজা লুঙ্গির মতো করেই পরবেন, যান, যান বাথরুমে ঢোকেন, অত কথা শুনতে চাইনে। এদিকে ভিজিটিং আওয়ারের সময় ঘনিয়ে এল।

আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। আমি ধুতিখানা লুঙ্গির মতো করে পরে বাইরে এসে জিগগেস করলাম, এখন ভেজা প্যান্টটা নিয়ে কী করি। তায়েবা বলল, কোনার দিকে চিপে টিপে রাখুন, যাওয়ার সময় ব্যাগের ভেতর পুরে নিয়ে যাবেন। তারপর আমাকে আবার বাথরুমে প্রবেশ করতে হল। শরীর ঘষে-মেজে লুঙ্গির মতো করে ধুতিপরা অবস্থায় আমাকে দেখে তায়েবা মুখ টিপে হাসল। আয়নার সামনে গিয়ে দেখে আসুন, আপনাকে এখন ফ্রেশ দেখাচ্ছে। আপনার এমন একটা কুৎসিত স্বভাব, সব সময় চেহারাখানা এমন কুৎসিত করে রাখেন, মনে হয় সাত পাঁচ জনে ধরে কিলিয়েছে। তাকিয়ে দেখলে ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়। তায়েবা একথা কম করে হলেও একশোবার বলেছে। কিন্তু আমার চেহারার কোনো সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। আমি বললাম, তায়েবা আমি বোধ হয় মানুষটাই কুৎসিত। আমার ভেতরে কোনো সৌন্দর্য নেই, বাইরে ফুটিয়ে তুলব কেমন করে? তায়েবা আমার কথার পিঠে বলল, তাই বলে কি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গোমড়া মুখ করে থাকতে হবে, তারও কি কোনো কারণ আছে? সব মানুষেরই একধরনের না একধরনের দুঃখ আছে, তাই বলে দিনরাত একটা নোটিশ নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে নাকি? এই যে আমাকে এই অবস্থায় দেখছেন, আমার কি দুঃখের অন্ত আছে, কিন্তু বেশ তো আছি। যাক এ পর্যন্ত বলে তায়েবা হাঁপাতে থাকল।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে একজন সিরিয়স রোগীর সঙ্গে কথা বলছি। আসলে আমি কথা কাটাকাটি করছি বুড়িগঙ্গার পারের তায়েবার সঙ্গে। সে তায়েবা আর এ তায়েবা এক নয়, একথা বারবার ভুলে যাই। গেন্ডারিয়ার বাসায় ভাই-বোন পরিবেষ্টিত তায়েবার যে রূপ, তার সঙ্গে বর্তমান তায়েবার আর কী কোনো তুলনা করা যেতে

পারে? বড়জোর বর্তমান তায়েবা গেন্ডারিয়ার তায়েবার একটা দূরবর্তী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। গেন্ডারিয়ার বাড়িতে তায়েবাকে যে দেখেনি কখনো তার আসল রূপ ধরতে পারবে না। খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, রাঁধছে, বাড়ছে, বোনদের তত্ত্ব-তালাশ করছে, কলেজে পাঠাচ্ছে, নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, সর্বত্র একটা ঘূর্ণির বেগ জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কখনো খলখল হাসিতে অপরূপা লাস্যময়ী, কখনো দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ছে। একে ধমক দিচ্ছে, তাকে শাসাচ্ছে, সদাচঞ্চল, সদা প্রাণবন্ত। আবার কখনো চুপচাপ গম্ভীর। তখন তাকে মনে হয়, সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়ার বাইরে, অত্যন্ত দূরের মানবী। কোনো পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দেয়ার জন্য যেন তার জন্ম হয়নি। কোনো শাসন বারণ মানে না। দুর্বার গতিস্রোতে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক জায়গায় আটকে রাখে কার সাধ্য! চেষ্টা যে করিনি তা নয়। প্রতিবারই প্রচণ্ড আঘাত করে সে নিজের গতিবেগে ছুটে গেছে। আবার যখন তাকে ছেড়ে আসতে চেষ্টা করেছি, সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে কাছে টেনে নিয়েছে। যখন সে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আকাশের তারকারাজি কিংবা বুড়িগঙ্গাতে ভাসমান নৌকোর রাঙা রাঙা পালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত, তখন তাকে তারকার মতো সুদূর এবং রহস্যময় নদীতে চলমান রাঙাপালের একটা প্রতীক মনে হত। যেন কারো কোনো বন্ধনে ধরা দেয়ার জন্য সে পৃথিবীতে আসেনি। তায়েবার অনেক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমি এসেছি। কতদিন, কতরাত্রি তার সঙ্গে আমার একত্রে কেটেছে। এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে অনেক বিশ্রী ইঙ্গিত করেছে। তায়েবার নিজের লোকেরাও কম হাঙ্গামা হুজ্জত করেনি। এমনকি, তার অভিভাবকদের মনেও ধারণা জন্মানো বিচিত্র নয় যে আমি তাকে গুণ করেছি।

আমি কিন্তু তায়েবাকে কখনো আমার, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তার সঙ্গে সম্পর্কের ধরনটা কী, অনেক চিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারিনি। হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে সে। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বোজা। নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাকের দুপাশটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার ডান হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে। এই যে গভীর স্পর্শ লাভ করছি তাতে আমার প্রাণের তন্ত্রীগুলো সোনার বীণার মতো ঝংকার দিয়ে উঠছে। এই স্পর্শ দিয়ে যদি পারতাম তার সমস্ত রোগ-বালাই আমার আপন শরীরে শুষে নিতাম। তার জন্য আমার সবকিছু এমন অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার এই যে সহজ সরল ইচ্ছে—ওটাকে কি প্রেম বলা যায়? যদি তাই হয় আমি তা হলে তায়েবার প্রেমে পড়েছি। দানিয়েল ভাই, কথা বলল তায়েবা। তার চোখ দুটো এখনো বোজা। কণ্ঠস্বরটা খুবই ক্ষীণ, যেন স্বপ্নের ভেতর তার চেতনা ভাষা পেতে চেষ্টা করছে। আমি তার দুটো হাতই টেনে নিলাম। দানিয়েল ভাই, আবার ডাকল তায়েবা। এবার তার কণ্ঠস্বরটি অধিকতর স্পষ্ট। আমি বললাম, তায়েবা বলো। সে চোখ দুটো খুলল, শাড়ির খুঁটে মুছে নিল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে উচ্চারণ করল, দানিয়েল ভাই, এবার যদি বেঁচে যাই, তা হলে নিজের জন্য বাঁচার চেষ্টা করব। আমার বুকটা কেঁপে গেল। বললাম, এমন করে কথা বলছ কেন? দানিয়েল ভাই, আমার অসুখটি এত সোজা নয়। আপনি ঠিক বুঝবেন না, মৃত্যু আমার প্রাণের দিকে তাক করে আছে। এক সময় বোঁটাসুদ্ধ আস্ত হৃৎপিণ্ডটি ছিঁড়ে নেবেই। বললাম, ছি ছি তায়েবা, কীসব আবোল-তাবোল প্রলাপ বকছ। দানিয়েল ভাই, এই মুহূর্তটিতে এই কথাটিই আমার কাছে সবচাইতে সত্য মনে হচ্ছে। সারা জীবন

আমি আলেয়ার পেছনে ছুটেই কাটিয়ে গেলাম। মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সুখে দুঃখে হোক একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমি তো হাওয়ার ওপরে ভাসছি। তারা হয়তো সুখ পাবে জীবনে, নয়তো দুঃখ পাবে, তবু সকলে নিজের নিজের জীবনটি যাপন করবে। কিন্তু আমার কী হবে, আমি কী করলাম? আমি যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। প্রতিটি মানুষ একটা জীবন নিয়েই জন্মায়। সে জীবনটাই সবাইকে কাটাতে হয়। কিন্তু জীবনযাপনের হিসেবে যদি ফাঁকি থাকে তা হলে জীবন ক্ষমা করে না। ডাক্তারেরা যা-ই বলুন, আমি তো জানি আমার অসুখের মূল কারণটা কী। একসময় আমার জেদ এবং অভিমান দুইই ছিল। মনে করতাম আমি অনেক কিছু ধারণ করতে পারি। এখন চোখের জলে আমার সে অভিমান ঘুচেছে। দশ পনেরো বছর থেকে তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছি। এখন সেই বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে। কিন্তু আমি কোথায়? আমার সবকিছু তো চোখের সামনেই ছত্রখান হয়ে গেল। আমার মা কোথায়, ভাই-বোনেরা কোথায়, এখানে আমি একেবারে নিতান্ত একাকী আপন রক্তের বিষে একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। তার দুচোখের কোনায় দুফোঁটা পানি দেখা দিল। আমি রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। তায়েবা বলল, জানেন দানিয়েল ভাই—আগে আমি কোনাকানচি হিসেব করে চিন্তা করতে ঘৃণা করতাম। এখন নানারকম চিন্তা আমার মাথায় ভর করে। মানুষ মরলে কোথায় যায়, মাঝে মাঝে সে চিন্তাও আমার মনে উদয় হয়। উৎপলা বলছে মানুষ মরলে তার আত্মা পাখি হয়ে যায়। আবার আরতিদি বলেন, এক জন্মে মানুষের শেষ নয়। তাকে বারবার জন্মাতে হয়। এসব বিশ্বাস করিনে, তবে শুনতে ভালোই লাগে। ধরুন কোনো কারণে আরো একবার যদি আমি জন্মগ্রহণ করি, তা হলে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হয়েই জন্মাব। পরম নিষ্ঠাসহকারে নিজের জীবনটাই যাপন করব। ঢোলা জামা পরা আঁতেলদের বড় বড় কথায় একটুও কান দেব না। আমি পেটুকের মতো বাঁচব। খাব পরব, সংসার করব—আমার ছেলেপুলে হবে, সংসার হবে, স্বামী থাকবে। সেই সংসারের গণ্ডির মধ্যেই আমি নিজেকে আটকে রাখব। কখনো বাইরে পা বাড়াব না।

তায়েবার এ সমস্ত কথা আমার ভালো লাগছিল না। বরাবরই জেনে এসেছি, সে বড় শক্ত মেয়ে। কখনো তাকে এরকম দেখিনি। এ কোন তায়েবার সঙ্গে কথা বলছি? জোর দিয়ে বলতে চাইলাম, তায়েবা এখনো সামনে তোমার ঢের জীবন পড়ে আছে, যেভাবে ইচ্ছে কাটাতে পারবে। কিন্তু আমার নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর বিদ্রূপের মতো শোনাল। তায়েবা বলল, না দানিয়েল ভাই আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আপনি দেখতে মিনমিনে হলে কী হবে বড়বেশি একরোখা এবং গোঁয়ার। নিজে যা সত্য মনে করেন, সকলের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সেজন্যই ভয় হয়, আমার মতো আপনার কপালেও অনেক দুঃখ আছে। আমার শরীরের খবর আমার চাইতে কি আপনি বেশি জানেন? আমি জানতে চাইলাম—আচ্ছা তায়েবা, তোমার অসুখটা কী? তায়েবা এবার ফোঁস করে উঠল। কখনো জানতে চেয়েছেন আমার অসুখটা কী? আর অসুখের ধরন জেনে লাভ নেই, অসুখ অসুখই। তবু একটা ডাক্তারি নাম তো আছে। সেটা আমাকে বিরক্ত না করে ডা. মাইতির কাছে জিগগেস করুন না কেন। বললাম, ডা. মাইতির কাছে গতকাল আমি জানতে চেয়েছিলাম, তোমার কী অসুখ। উলটো তিনি

আমাকেই প্রশ্ন করলেন, আমি জানি নাকি তোমার কী অসুখ। সেটা আপনি ডা. মাইতির সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। বিরক্ত হয়ে তায়েবা বিছানার ওপর শরীরটা ছেড়ে দিল।

ডা. মাইতি আবার কী করল হে? হাতে স্টেথেসকোপ দোলাতে দোলাতে ডা. মাইতি কেবিনে প্রবেশ করলেন। দানিয়েল সাহেব হাতখানা একটু বাড়িয়ে দিন, হ্যান্ডশেক করি। এই ঘোরতর বিষ্টির মধ্যে চলে আসতে পেরেছেন। বা সোজা মানুষ তো নয়। বোঝা গেল চরিত্রের মধ্যে স্টার্লিং কোয়ালিটি আছে। হ্যান্ডশেকের পর বললাম, আপনার রোগীর কি অনিষ্ট করলাম? নিশ্চয়ই, তা হলে ধরে নিচ্ছি আপনি গতকালের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। আমি হাসলাম। তারপর তায়েবার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, গিলেছ না এখনো বাকি আছে। মাইতিদা ভাতের কথা তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। এতক্ষণ দানিয়েল ভাইতে আমাতে ঝগড়া চলছিল। ডা. মাইতি বললেন, ঝগড়ার বিষয়বস্তু কী আগে বলো। তায়েবা বলল, মাইতিদা আপনি যেন কেমন, ঝগড়া করতে আবার বিষয়বস্তুর দরকার হয় নাকি। যে ঝগড়ার বিষয়বস্তু নেই, তা আমি শুনব না। ওসব কথা এখন রাখো, ওয়ার্ডে ডা. ভট্টাচার্যির পা দেয়ার আগে তোমার বায়না করে আনা ওই ভাত মাছ তাড়াতাড়ি গিলে ফেলো। উনি এসে পড়লে একটা অনর্থ বাধাবেন। হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্র দেখে ডা. মাইতির চোখজোড়া কৌতুকে ঝিকমিকিয়ে উঠল। বাহ্! দানিয়েল সাহেব দেখছি আপনার উন্নতি ঘটে গেছে। আমি একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, আমি সেই বৌবাজার থেকে এককোমর পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছি তো। তিনি জিগগেস করলেন এই ঘোলাজলের সবটুকু পথ কি আপনি নিজের পায়ে হেঁটে এসেছেন? আমি মাথা দোলালাম। এখানে এসে দেখি প্যান্টটা ময়লায় ভরে গেছে, আর পা থেকে জুতো নামাতেই সোলদুটো খসে পড়ল। তায়েবা টাকা দিয়ে হাসপাতালের গোবিন্দকে পাঠিয়ে এই ধুতি আর স্যান্ডেলজোড়া কিনে এনেছে। তা হলে দিদিমনির দানদক্ষিণে করারও অভ্যেস আছে। বাহ্! বেশ বেশ। তাঁর কথাতে কেমন জানি লজ্জা পাচ্ছিলাম। এই লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বলে বসলাম, ধুতি প্যাঁচগোচ দিয়ে পরতে জানিনে। তাই দু-ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পরেছি। ঠিক আছে বেশ করেছেন, আজ হাসপাতাল থেকে যাওয়ার পথে আমার বাসা হয়ে যাবেন, আপনাকে ধুতি পরা শিখিয়ে দেব। এ সুযোগে আপনার সঙ্গে একটু গপ্পো-টপ্পোও করা যাবে। এ্যাঁ কী বলেন। বললাম, আমি তো আপনার কোয়ার্টার চিনিনে, কী করে যাব। আরে মশায়, অত উতলা হচ্ছেন কেন, একটু ধৈর্য ধরুন প্রথমে আমি চিনিয়ে দেব। তারপর তো আপনি যাবেন। ওই যে হাসপাতালের গেট। তার অপজিটে লাল দালানগুলো দেখছেন তার একটার দোতালাতে আমি থাকি। নাম্বারটা মনে রাখবেন একুশের বি। এদিকে ওদিকে না তাকিয়ে সোজা দোতলায় উঠে বেল টিপবেন। আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব। কী চিনতে পারবেন তো? আমি বললাম, মনে হচ্ছে পারব। মনে হচ্ছে কেন? আপনাকে পারতেই হবে। এটুকুও যদি না পারেন, কর্পোরেশনের লোকজনদের লিখব, যেন আপনাকে শহর থেকে বের করে দেয়।

ডা. মাইতি তায়েবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খেতে আরম্ভ করো। আমি ওই দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। ডা. ভট্টাচার্যি যদি এসে পড়েন, আমি হাততালি দেব।

তুমি অমনি সব লুকিয়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়বে। একেবারে হাতমুখ ধুয়েই তাঁর সামনে আসবে। দানিয়েল সাহেব যান, জলটল দিয়ে সাহায্য করুন। আমি একটা প্লেট ধুয়ে এনে দিলে তায়েবা মিটসেফ থেকে ব্যাগটা বের করল, তারপর বাটিটা টেনে নিল। ভাতগুলো প্লেটে নিয়ে অন্য বাটিটা থেকে কিছুটা মাছের তরকারি ঢেলে নিল। তার মুখে একটা খুশিখুশি ভাব। জানেন দানিয়েল ভাই, কতদিন পরে আজ মাছ ভাত মুখে দিচ্ছি। বললাম, গতকাল বলেছিলে এক মাস। হ্যাঁ সেরকম হবে। একগ্রাস ভাত মুখে তুলে নিল। তারপর আরেক গ্রাস। অমনি করে আরো কটা গ্রাস মুখে দিয়ে সে প্লেটের ওপর হাতখানা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমি বললাম, চুপ করে অমন হাত ঠেকিয়ে আছ, খাচ্ছ না কেন? না, খাব না, এ খাবার কি মানুষে খায়? কীরকম বিচ্ছিরি রান্না, মুখটা তেতো হয়ে গেল। আহ্ মাইতিদা। ডাক্তার কেবিনের ভেতরে ঢুকলেন, কী হল তায়েবা, ভাত খেতে চাইছিলে খাও। খেতে যে পারছিনে, সব তেতো লাগে যে। তার আমি কী করব। তেল মশলা ছাড়া শুধু হলুদ জিরের রান্না আপনি খেতে পারবেন, দানিয়েল ভাই। মাছগুলো লবণ মরিচ দিয়ে ভাজা করে আনতে পারলেন না। আপনি কিছুই বোঝেন না। আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিক আছে, কাল মাছ ভেজে এনে দেবো। হ্যাঁ তাই দেবেন। তায়েবা হাত ধুয়ে ফেলল। ডা. মাইতি বললেন, আপনার ভাত মাছ বিজনেস এখানেই শেষ। তার পরেও এসকল জিনিস এ কেবিনে যদি আবার আসে, তা'লে আপনার হাসপাতালে আসাটাই বন্ধ করতে হয়। তায়েবা চুপচাপ রইল। আমার ধারণা ডা. মাইতির ব্যবস্থাটি মেনে নিয়েছে। ডা. মাইতি আমাকে বললেন, এক কাজ করুন, এই ভাত মাছ যা আছে সব বাটির ভেতর ভরে ওধারের ডাস্টবিনটায় ফেলে দিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। আমি বাক্যব্যয় না করে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। বাটি প্লেট সব ধুয়ে নেয়ার পর ডা. মাইতি বললেন, এবার আমি চলি দানিয়েল সাহেব, মনে থাকে যেন সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার সময়। আমি বললাম, থাকবে। উনি চলে গেলেন।

আমি তায়েবাকে জানালাম, ডা. মাইতি সাতটা সাড়ে সাতটার সময় আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে যেতে বলেছেন। যাব? অবশ্যই যাবেন। তিনি আর দীপেনদা আমার জন্য যা করেছেন দেশের মানুষ আত্মীয়স্বজন তার এক ছটাক, এক কাচ্চাও করেনি। আমি জানতে চাইলাম, দীপেন্দ্রনাথ লোকটি কে? তায়েবা বলল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো আমাকে চেষ্টা তদবির করে এ হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। আপনি চিনবেন কেমন করে। আর আপনারা সব নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমি মারা গেলাম, বেঁচে রইলাম, তাতে কার কী এসে যায়। আমি জবাব দিলাম না। তায়েবার অনেক রাগ, অনেক অভিমান। তাকে ঘাটিয়ে লাভ নেই। অনারশ্যক রাগারাগি করে অসুখটা বাড়িয়ে তুলবে। এখন তো প্রায় ছটা বাজে। তোমার ডাক্তার আসার সময় হয়েছে। আজ আমি আসি। আবার আসবেন। আমি বললাম, আসব। প্যান্ট আর বাটিসহ ব্যাগটা নিয়ে যাই। প্যান্ট নিয়ে এখন আর কাজ নেই। নতুন একটা বাসায় যাচ্ছেন। আমি গোবিন্দদাকে দিয়ে কাল লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেব। এক কাজ করুন। ব্যাগ বাটি এসবও রেখে যান। বরং কাল এসে নিয়ে যাবেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখলাম মাত্র সোয়া ছটা। ডা. মাইতির কোয়ার্টারে সাত থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে যে-কোনো সময়ে গেলে চলবে। আমার ভীষণ ক্ষুধা

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার লাইব্রেরি
শাহবাগ, ঢাকা।

পেয়েছে। সেই আড়াইটার সময় বেরিয়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। তারপর এতক্ষণ সময় কাটালাম। পেটে কিছু পড়েনি। সারাটা সময় এরকম ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলেই ছিলাম। একটা খাবার দোকান তালাশ করতে লাগলাম। এদিকে দোকানপাটের সংখ্যা তেমন ঘন নয়। তাই বাঁক ঘুরে ভবানীপুর রোডে চলে এলাম। একটা সুবিধেজনক খাবার ঘরের সন্ধান করতে হাজরা রোডের দিকে ধাওয়া করলাম। যে দোকানেই যাই, প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে আমার কেমন জানি প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো আমি পথ হাঁটছি। অবশ্য বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। অনেক আগেই বিষ্টি ধরে গেছে। এদিকটাতে রাস্তাঘাটের অবস্থা একেবারে খটখটে শুকনো। কলকাতার টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা জ্বলছে। দুপাশের দোকানপাটে ধুমধাম কেনাবেচা চলছে। ঢ্যাকর ঢ্যাকর করে ট্রাম ছুটছে। বাস, লরি, ট্রাক, কার এসব যন্ত্রযানের বাঁশি অনাদ্যন্ত রবে বেজে যাচ্ছে। মানুষের স্রোত তো আছেই। তারা যেন অনাদিকাল থেকেই শহর কলকাতার ফুটপাতের ওপর দিয়ে উজান ভাটি দুই পথে ক্রমাগত প্রবাহিত হচ্ছে। মোড়ের একটা স্যান্ডউইচের দোকানে গিয়ে দুখানা প্যাটিস আর ঢকঢক করে পানি খেয়ে নিয়ে ডা. মাইতির কোয়ার্টারের উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম। কোনদিকে যাচ্ছি খেয়াল নেই। শুধু পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা আসার পর থেকে আমার পা দুটোর চোখ ফুটে গেছে।

সাতটার ওপরে বোধ করি কয়েক মিনিট হবে। আমি ডা. মাইতির কোয়ার্টারে এসে বেল টিপলাম। একটি ছোকরা চাকর দরোজা খুলে দিয়ে জানতে চাইল, 'কাকে চান।' আমি জানতে চাইলাম ডা. মাইতি আছেন? আছেন, আপনি ভেতরে বসুন। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে একটা বেতের সোফায় বসে সিগারেট জ্বালালাম। বসবার ঘরের আসবাবপত্তরের তেমন বাহুল্য নেই। কয়েকখানি বেতের সোফা এবং মধ্যখানে একটি বেতের টেবিল। টেবিলের ওপর পাতা চাদরটি খুবই সুন্দর এবং একই ধরনের চাদর খাটের ওপরও পাতা দেখলাম। ওপাশে পুরোনো একটি ক্যাম্প খাট দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে। দেয়ালে একজোড়া বুড়ো বুড়ির ছবি টাঙানো। চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, ডা. মাইতির মা বাবা। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় আকারের ছবি। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ওষুধ কোম্পানির দুটো ক্যালেন্ডার উত্তর-দক্ষিণের দুটি দেয়ালে পরস্পরের দিকে মুখ করে ঝুলছে। এ ছাড়া এনলার্জ করা একটি গ্রুপ ফটো আছে। গাউন পরা একদল যুবকের ছবি। একটুখানি চিন্তা করলেই মনে পড়ে যাবে মেডিক্যাল কলেজের সার্টিফিকেট গ্রহণ করার সময় এই ছবিখানি ওঠানো হয়েছিল। একেবারে কোনার দিকে হাতঅলা একটি চেয়ার এবং সামনে একটি টেবিল।

ডা. মাইতি জিগগেস করলেন, চিনতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? আমি বললাম, না। তিনি ডাক দিলেন, অনাথ। আবার সে ছেলেটি এসে দাঁড়ালে বললেন, চা দাও। আর শোনো এই বাবু আমাদের সঙ্গে খাবেন এবং রাত্তিরে থাকবেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কৌতুকমিশ্রিত স্বরে বললেন, দেখলেন তো কেমন বাড়িতে এনে গ্রেপ্তার করে ফেললাম। সহসা আমার মুখে কোনো উত্তর জোগাল না। তিনি ফের জিগগেস করলেন, আপনার কি তেমন জরুরি কাজ আছে। আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে

কোনো বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে কি? জবাব দিলাম, না তেমন কোনো কাজ নেই। আপনার কি আজ রাতটা আমার সঙ্গে গল্প করে কাটাতে আপত্তি আছে? বা রে আপত্তি থাকবে কেন, এখন আমাদের যে অবস্থা, কে আবার আমার খবর নেবে। দানিয়েল সাহেব এভাবে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, আপনারা একটি মুক্তিসংগ্রাম করছেন। আমি ডাক্তার মানুষ অধিক খোঁজখবর রাখতে পারিনে। তায়েবাকে দেখতে হাসপাতালে যেসব ছেলে আসে, তাদের অনেকের মধ্যেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং অদম্য মনোবল লক্ষ করেছি। আপনাদের গোটা জাতি যে ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। মানুষের সবচাইতে মহত্তম সম্পদ তার চরিত্র, সে বস্তু আপনার দেশের অনেক যুবকের মধ্যে আমি বিকশিত অবস্থায় দেখেছি। কোনো কোনো সময়ে আপনাদের প্রতি এমন একটা আকর্ষণ অনুভব করি, ভুলে যাই যে, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমি কখনো বাংলাদেশে যাব না। পুরুষানুক্রমে আমরা পশ্চিমবাংলার অধিবাসী। পদ্মার সে পাড়ের মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনো ছিল না। কিন্তু আপনার দেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে আমার নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। একদিনে কিন্তু সে পরিবর্তন আসেনি। ক্রমাগত মনে হচ্ছে আমি নিজেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটা অংশ। এখন আমার ভারতীয় সত্তা এবং বাঙালি সত্তা পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বাঙালি বলে ভাবতে আমার খুব অহঙ্কার হয়। আপনার দেশ যুদ্ধে না নামলে আমার এ উপলব্ধি জন্মাত কি না সন্দেহ। কথাগুলো লিটারেল অর্থে ধরে নেবেন না। এটা জাস্ট একটা ফিলিংয়ের ব্যাপার।

আমি বললাম, বাংলা এবং বাঙালিত্বের প্রতি পশ্চিমবাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের একটা অতুলনীয় সহানুভূতি এবং জাগ্রত মমত্ববোধ আছে বলেই এখনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শিরদাঁড়া উঁচু করে থাকতে পেরেছে। পশ্চিমবাংলার বদলে যদি গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হত, ভারত সরকার যত সাহায্যই করুক না কেন, আমাদের সংগ্রামের অবস্থা এখন যা তার চাইতে অনেক খারাপ হত। পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রাণের আবেগ, উত্তাপ এবং ভালোবাসা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে প্রাণবন্ত এবং সজীব রেখেছে। ছেলেটা চা দিয়ে গেল। আপনার কাপে কচামচ চিনি এবং কতটুকু দুধ দেব বলুন। বললাম, দুধ আমি খাইনে! দু কি আড়াই চামচ চিনি দেবেন। হো হো করে হেসে উঠলেন ডা. মাইতি। একটা বিষয়ে দেখছি আপনার সঙ্গে আমার চমৎকার মিল আছে। আমিও চায়ের সঙ্গে দুধ খাইনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি মূর্খ মানুষ। প্রোফেশনের বাইরে গেলেই নাচার হয়ে পড়ি। আপনার মতো একজন স্কলার মানুষের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব, মশায় সাবজেকট খুঁজে পাচ্ছিনে। আবার সেই হো হো হাসি। আমি বললাম, আপনিও তা হলে তায়েবার কথা বিশ্বাস করে আছেন। এস. এস. সি. থেকে এম. এ. পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছি। এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই কিন্তু। জীবনে কোনো পরীক্ষায় কখনো বিশের মধ্যে থাকার ভাগ্যও আমার হয়নি। তায়েবা যাদেরকে চেনে জানে, একটুখানি খাতির করে তাদের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে, এটাই তার স্বভাব। আমার ব্যাপারে এই পক্ষপাতটুকু এতদূর মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে আমার নিজের কান পর্যন্ত

গরম হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে তার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। ডা. মাইতি বললেন, আপনার ব্যাপারে তার একটা লাগামছাড়া উচ্ছ্বাস এরই মধ্যে আমি লক্ষ করেছি। আপনাকে স্কলার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, আপনি বিষ্টিতে কাপড় জামা ভিজিয়ে এলে বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে নতুন কাপড়-জামা কিনে আনে। এগুলো কি একজন রোগীর পক্ষে বাড়াবাড়ি নয়? আসলে আপনাদের সম্পর্কটা কীরকম। আপনি যদি জবাব না দেন আমি অবাক হব না।

বললাম, ডা. মাইতি জবাব দেব না কেন? লোকে তো বন্ধুজনের কাছেই প্রাণের গভীর কথা প্রকাশ করে। আপনাকে আমি একজন বন্ধুই মনে করি। তায়েবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটা কী নিজেও আমি ভালো করে নির্ণয় করতে পারিনি। আমার ধারণা সে আমাকে করুণা করে। এই যুদ্ধটা না বাধলে, বিশেষ করে বলতে গেলে এই অসুখটা না হলে তার সঙ্গে আমার দেখা হত কি না সন্দেহ। সে তার পার্টির কাজকর্ম নিয়ে থাকত। আমি আমার কাজ করতাম। তিনি ফের জানতে চাইলেন, আপনাদের মধ্যে একটা হৃদয়গত সম্পর্ক আছে এবং সেটা গভীর, একথা কি আপনি অস্বীকার করবেন? ডা. মাইতি, ও বিষয়টা নিয়ে আমি নিজেও অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে, না কিছুই নেই। সকালবেলার শিশিরলাগা মাকড়সার জাল যেমন বেলা বাড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়, এও অনেকটা সেরকম। সে তার পার্টি ছাড়তে পারবে না। কেননা তার অস্তিত্বের সবটাই তার পার্টির মধ্যে প্রোথিত। আর আমার চরিত্র এমন, কোনো বিশেষ পার্টির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো মোটেই উপযুক্ত নয়। এতসব গোঁজামিলের মধ্যে হৃদয়গত একটা সম্পর্ক কেমন করে টিকে থাকতে পারে, আমার তো বোধগম্য নয় ডা. মাইতি। ডাক্তার হাততালি দিয়ে উঠলেন, এই খানেই তো মজা। মানুষ ভয়ানক জটিল যন্ত্র। তার হৃদয় ততোধিক জটিল। অত সহজে কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। আচ্ছা দানিয়েল সাহেব, আপনি কি রাজনীতি করেন? বললাম, মানুষ সব সময়ে তো একটা না একটা রাজনীতি করে আসছে। আমি তা এড়াব কেমন করে? কিন্তু আমি কোনো পার্টির মেম্বার নই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি আমার যথাসর্বস্ব দাবি করে, না দিয়ে কী পারব? আমি সহজ মানুষ, অত ঘোর-প্যাঁচ বুঝিনে।

ডা. মাইতি টেবিলে একটা টোকা দিয়ে বললেন, এমনিতে আমি সিগারেট খাইনে। কিন্তু আপনার কথা শুনে একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে। একটা চারমিনার জ্বালিয়ে টান দিয়ে খকখক করে কেশে ফেললেন। মশায়, বললেন তো খুব সহজ মানুষ। আসলে আপনি জটিল এবং দুর্বোধ্য মানুষ। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। হয়তো তাই, সব মানুষই একটা না একটা দিকে দুর্বোধ্য, আমরা খেয়াল করিনে। আরে মশায় ওসব গভীর কথা এখন তুলে রাখুন। আপনাকে একটা সিম্পল প্রশ্ন জিগগেস করি, ইচ্ছে করলে আপনি জবাব নাও দিতে পারেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই জবাব দেব, বলুন আপনার প্রশ্নটা। ডা. মাইতি স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, তায়েবার সঙ্গে পরিচয়ের পর অন্য কোনো নারীকে কি আপনি ভালোবেসেছেন? আমি বললাম, না তা হয়নি। কেন বলুন তো। হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি

বলেই। অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা কখনো আপনার মনে এসেছে? না. তাও আসেনি। আচ্ছা মেনে নিলাম, অন্য কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার কথা চিন্তা করতে পারেননি। অন্তত বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কখনো সিরিয়স হতে চেষ্টা করেছেন কি? আমি বললাম, তাও করিনি। আত্মীয়স্বজন বারবার চাপ দিয়েছে বটে, কিন্তু আমি বারবার এড়িয়ে গেছি। ধরে নিন, এটা একধরনের আলসেমি। আপনি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক মানুষ। আপনার কোনো খারাপ অসুখ-টসুখ নেই তো? কিছু মনে করবেন না। আমি একজন ডাক্তার। ডাক্তারের মতো প্রশ্ন করছি। আমি বললাম, শরীরের ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে তো স্থির নিশ্চিত হয়ে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই। এমনিতে তো কোনো রোগ-টোগ আছে বলে মনে হয় না।

ডা. মাইতি বললেন, এবার আমার কথা বলি। দয়া করে একটু শুনবেন কি? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আপনি বলুন। তা হলে শুনুন, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ। তায়েবার প্রতি আপনার মনের অবচেতনে গভীর ভালোবাসা রয়েছে বলে অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসা বা বিয়ে করার কথা আপনি চিন্তাও করতে পারেননি। তার দিক থেকে হোক, আপনার দিক থেকে হোক বাস্তব অসুবিধে ছিল অনেক, যেগুলো ডিঙোবার কথা ভাবতেও পারেননি। আমি বললাম, নদীতে বাঁধ দেয়ার কথা বলা যায়, কেননা নদীতে বাঁধ দেয়া সম্ভব। কিন্তু সমুদ্রবন্ধন করার কথা কেউ বলে না, কেননা তা অসম্ভব। আমার আর তায়েবার ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।

ডা. মাইতি বললেন, তায়েবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে প্রায় এক মাস হয়। আপনি তো মাত্র গতকাল থেকেই দর্শন দিচ্ছেন। এই এক মাসে তার সম্পর্কে ডাক্তার হিসেবে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ধরে বসলেন, বাংলাদেশের একজন রোগীকে ভর্তি করতেই হবে। ডা. ভট্টাচার্যি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কারণ, হাসপাতালে খালি বেড ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধেই তিনি রাজি হলেন। মেয়েটাকে প্রথম থেকেই দেখে আমার কেমন জানি অন্যরকম মনে হয়েছিল। একমাস খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু এ সময়ের মধ্যে তাকে নানাভাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। সত্যি বলতে কী এরকম স্বার্থবোধবর্জিত মেয়ে জীবনে আমি একটিও দেখিনি। আমি বললাম, আমিও দেখিনি। এ ব্যাপারেও দেখছি আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের কোনো গরমিল নেই। সে যাক, শুনুন। তায়েবাকে দেখতে হাসপাতালে নানারকমের মানুষ আসে। তার যত কমপ্লেনই থাকুক, সকলের সঙ্গে যথা-সম্ভব প্রাণখোলা কথাবার্তা বলে, হাসি-ঠাট্টা করে। কখনো কারো কাছ থেকে কিছু দাবি করতে দেখিনি। দেখলাম, একমাত্র আপনার কাছেই তার দাবি। আপনাকেই ভাত মাছ রান্না করে আনতে বলল। আপনার কথা প্রায় প্রতিদিন আমাকে বলেছে। তবু আপনি যখন এলেন, দেখলাম আপনার সঙ্গেই ঝগড়া করছে। যদি আমি ধরে নিই যে তায়েবা আপনাকে ভালোবাসে তা হলে কি আমি অন্যায় করব? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর হাসতে চেষ্টা করলাম। হয়তো, হবেও বা। ধন্যবাদ, ফুল চন্দন পড়ুক আপনার মুখে ডা. মাইতি। আপনি মশায় চমৎকার কথা বলতে জানেন। কথার মারপ্যাঁচে ফসকে যাবেন তেমন সুযোগ আপনাকে দিচ্ছিনে। আপনি কি ভেবেছেন শুধুশুধুই আপনাকে বাড়িতে ডেকে এনেছি? আপনার সঙ্গে আমার মস্ত দরকার। যাক ডা. মাইতি, আপনি

আমার নিজের মূল্যটা আমার কাছে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিলেন। এই কলকাতা আসা অবধি কেউ আমাকে বলেনি, আমার সঙ্গে কারো দরকার আছে। নিজের দরকারেই সকলের কাছে সকাল সন্ধে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা বলুন আপনার দরকারটা কী? শুনে হৃদয় ঠাণ্ডা করি। মশায় অত রাগ কেন? শুনবেন, শুনবেন অত তাড়াহুড়ো কিসের? আগে রাতের খাবারটা খান। এখন তো সবে নটা বাজে। তারপর ডাক দিলেন অনাথ। সে ছেলেটি এসে দাঁড়াল। খাবার হয়েছে রে? বাবু ডালটা এখনো নামানো হয়নি। যা তাড়াতাড়ি কর।

আমি জিগগেস করলাম, ডা. মাইতি আপনি কোয়ার্টারে একাই থাকেন? একা মানুষ, একাই তো থাকব। আপনি বিয়ে করেননি না মশায়, সে ফাঁদে আজও পা দিইনি। আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন? ভালোবাসা-টাসা আমাকে দিয়ে পোষাবে না। হঠাৎ করে কাউকে বিয়ে করেই বসব। এখনো করেননি কেন? প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ হল, এখনো সবগুলো বোনের বিয়ে দেয়া হয়নি। মশায়, আপনি আর কোনোকিছু জিগগেস করবেন না। আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য নেমন্তন্ন করে এনেছি। আপনি যদি আমার কথা শুনতে চান, ডাকবেন, যেয়ে সব কথা বলে আসব। আমি বললাম, ডা. মাইতি আমাদের থাকার কোনো স্থির ঠিকানা নেই। কোথায় আপনাকে ডাকব? তিনি বললেন, যখন আপনার দেশ স্বাধীন হবে, তখন ডাকবেন। আমার যত কথা সব জানিয়ে আসব, আর আপনার দেশটাও দেখে আসব। আচ্ছা, বাই দ্যা বাই, তায়েবার ভাই বোন মা—উনারা কোথায় আছেন বলতে পারেন? আমি বললাম. তার ইমিডিয়েট একটা ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেটি ছাড়া আর মোটামুটি সকলের সংবাদ পেয়েছি। তায়েবার ছোট ভাইটি ঢাকায়। বড় ভাই দিনাজপুরে ছিলেন শুনেছি। সেখান থেকে শুনেছি সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। আর ওরা তো তিন বোন কলকাতায় এসেছে। এক বোন ব্যারাকপুর না কোথায় দেশের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছে। একেবারে ছোট্টটি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে। কী নাম বলুন তো দানিয়েল সাহেব, আই থিঙ্ক আই নো হার। আমি বললাম, ডোরা। ডোরা তো একজন বুড়োমতো ভদ্রলোককে নিয়ে মাঝে মাঝে হাসপাতালে তায়েবাকে দেখতে আসে। হঠাৎ করে আমি মেজাজ সংযত রাখতে পারলাম না। তা হলে ডোরাসহ ভদ্রলোক এখনো তায়েবার কাছে আসতে সাহস করেন? একটুখানি চোখলজ্জাও নেই। আরে মশায়, আপনি খেপে গেলেন যে! আগে কী ব্যাপার বলবেন তো। আমি বললাম, ওই যে বয়স্ক ভদ্রলোক দেখেছেন তিনি ডোরাকে বিয়ে করে ফেলেছেন। ঢাকাতে ওই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন তায়েবাদের অভিভাবক। মহিলা শশীকান্ত নামে তাঁর মেয়ের এক গৃহশিক্ষককে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ললিতকলার চর্চা করতে গেছেন। আর এদিকে ইনি প্লানটা ব্যবস্থা হিসেবে ডোরাকে বিয়ে করে বসে আছেন। আমার বিশ্বাস তায়েবার অসুখ বেড়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। তা ছাড়া আমি আরো শুনেছি, শুধু মুখের অন্ন জোটাবার জন্যে তায়েবাকে অসুস্থ শরীর নিয়ে দিনে তিনটে করে ট্যুইশনি করতে হয়েছে। এই মানুষেরা সে সময় কোথায় ছিলেন? তায়েবার কী অসুখ আমি সঠিক বলতে পারব না, তবে একথা সঠিক বলতে পারি অমানুষিক পরিশ্রম না করলে এবং ডোরা এই কাণ্ডটি না ঘটালে তার আজ এ অবস্থা হত না। এই লোকগুলোর

নিষ্ঠুরতার কথা যখন ভাবি মাথায় খুন চেপে যায়। অথচ এরাই ঢাকাতে আমাদের কাছে আদর্শের কথা প্রচার করত। আপনি অনেক আনকোরা তরুণের মধ্যে জীবনের মহত্তম সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠতে দেখেছেন, একথা যেমন সত্যি, তেমনি পাশাপাশি একথাও সত্যি যে যুদ্ধের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের খোলস ফেটে খানখান হয়ে পড়ছে এবং আমরা এতকালের ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ছাগলদের চেহারা আপন স্বরূপে দেখতে পাচ্ছি। শরণার্থী শিবিরগুলোতে আমাদের মানুষদের দুর্দশার সীমা নেই। ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে আমাদের তরুণ ছেলেরা হাজার রকমের অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের ভেতরের কথা নাহয় বাদই দিলাম। এখানে কলকাতায় শাদা কাপড়চোপড় পরা ভদ্রলোকদের মধ্যে স্খলন, পতন, যত রকমের নৈতিক অধঃপতন আছে, তার সবগুলোর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এখানে যত্রতত্র শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো, আধবুড়ো মানুষেরা যত্রতত্র বিয়ে করে বেড়াচ্ছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা আমাদের জানা আছে। মাঝে মাঝে এই ভদ্রলোকদের, তার তুলনায় কম নিষ্ঠুর মনে হয় না। আমি নিশ্চিত বলতে পারি তায়েবার সঙ্গে এরা কসাইয়ের মতো ব্যবহার করেছে। আমি জানি সে আমাকে কোনোদিন সেসব কথা জানতে দেবে না। এমনকি হাজার অনুরোধ করলেও না। আর আমিও জিগগেস করব না। তবে একথা সত্যি যে তায়েবা যদি মারা যায়, সেজন্য এরাই দায়ী। কিন্তু দুনিয়ার কোনো আদালতে সে মামলার বিচার হবে না।

ডা. মাইতি চাপা নিশ্বাস ফেললেন। আপনার অনুমান অনেকটা সত্যি। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং টেনশনই তার অসুখটার বাড়াবাড়ির কারণ। যাকগে যা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে তার ওপর তো আপনার কোনো হাত নেই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে তায়েবাকে নিয়ে। তার জন্য আপনি কী করতে পারেন? আমি বললাম, মাইতিদা নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কীরকম অসহায়। আজ রাতে যেখানে ঘুমোই, কাল রাতে সেখানে যেতে পারিনে। এখানে স্রোতের শ্যাওলার মতো আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। পঞ্চাশ পয়সা ট্রাম ভাড়া বাঁচাবার জন্যে ছয় সাত মাইল পথ হাঁটতে আমাদের বাধে না। আজ যদি চোখের সামনে তায়েবা মারাও যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করা ছাড়া আমার করবার কী থাকবে? তবে একটা দুঃখ থেকে যাবে। তায়েবা আপন চোখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারবে না। স্বাধীনতা-অন্ত প্রাণ ছিল তায়েবার। আলাপে আলোচনায় কথাবার্তায় দেখে থাকবেন, তার মনটি কীরকম কম্পাসের কাঁটার মতো স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে থাকে। উনিশশো উনসত্তুরের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তায়েবা নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল। আমার ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সে দেখে যেতে পারবে না, এটাই আমার বুকে চিরদিনের জন্যে একটা আফসোসের বিষয় হয়ে থাকবে। আমি মিনতি করে জানতে চাইলাম, আচ্ছা মাইতিদা আপনি কি দয়া করে জানাবেন, তায়েবার অসুখটা কী ধরনের? খুব কী সিরিয়াস? তিনি বললেন, আমি তো ভেবেছিলাম আপনি শক্ত মানুষ। এখন দেখছি মেয়েমানুষের চাইতে দুর্বল। আগে থেকে কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন। আচ্ছা ধরুন, তায়েবা মারা গেল। তখন আপনি কী করবেন? আত্মহত্যা করবেন? আমি জবাব দিলাম, তা করব না, কারণ সে বড় হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। তা হলে কী করবেন? বসে বসে কাঁদবেন? আমি বললাম, তাও বোধ হয় সম্ভব

হবে না। এইখানে এই কলকাতা শহরে বসে বসে কাঁদার অবকাশ কোথায়? বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাঁদবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে। অনেকেই তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে। আমিও না হয় তাদের একজন হয়ে যাব। আপনি তা হলে কিছুই করতে যাচ্ছেন না? ডা. মাইতি ফের জানতে চাইলেন। আমি বললাম, কী করব, কী করতে পারি? আপনার দিন কাটবে কেমন করে? আমি বললাম, দিন তো একভাবে না একভাবে কেটে যাবে, শুধু মাঝে মাঝে বুকের এক পাশটা খালি মনে হবে। মশায় এতক্ষণে আপনি একটা কথার মতো কথা বলেছেন। অনিবার্যকে মেনে নিতেই হবে। এই কথাটা বলার জন্য আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে। এখন তায়েবার রোগ সম্বন্ধে আপনি জিগগেস করতে পারেন, আমি জবাব দিতে প্রস্তুত। আমি বললাম, বলুন। ডাক্তার ভাবলেশহীন কণ্ঠে জানালেন লিউক্যামিয়া। জিগগেস করলাম, ওটা কী ধরনের রোগ। তিনি বললেন, ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। জিগগেস করলাম, খুব কি কঠিন ব্যাধি? হ্যাঁ খুবই কঠিন। আমি বললাম, অন্তত যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তায়েবা বেঁচে থাকবে তো? সেকথা আমি বলতে পারব না। আমি একজন জুনিয়র ডাক্তার। ডা. ভট্টাচার্য তার টেস্টের রিপোর্ট বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন। জানেন তো সেখানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের একটা ওয়েল ইকুইপড্ সেন্টার আছে। সেখান থেকে অ্যাডভাইজ না আসা পর্যন্ত আমাদের বলার কিছু নেই। দিন একটা চারমিনার। আপনার সঙ্গে থাকলে আমাকেও চেইন স্মোকার হয়ে উঠতে হবে দেখছি। চলুন, খাবার দিয়েছে। কথায় কথায় অনেক রাত করে ফেললাম। আমি নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ডা. মাইতির কোয়ার্টারে আমার চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসেনি। সারারাত বিছানায় হাঁসফাঁস করেছি। কেমন জানি লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমার সামনে একটা দেয়াল আচানক মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার খুব গরম বোধ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মশারির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে টেবিলে রাখা বোতল থেকে ঢেলে ঢকঢক করে পানি খাচ্ছিলাম। আর একটার পর একটা সিগারেট টানছিলাম। দূরের রাস্তায় ধাবমান গাড়ির আওয়াজে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল। কোথাও যেন কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

শেষরাতের দিকে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। সেই ঘোরেই স্বপ্ন দেখলাম। আমার আব্বা এসেছেন। স্কুল হোস্টেলে থাকার সময়ে আমি যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে খেতাম, সে বাড়ির সামনে পথ আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে শান্তিপুরের চিকন পাড়ের ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় ঝোলানো মক্কা শরিফ থেকে আনা ফুলকাটা চাদর। আর মাথায় কালো, থোবাযুক্ত চকচকে লাল সুলতানি টুপি। আমি জিগগেস করলাম, আব্বা এত সুন্দর কাপড়চোপড় পরে আপনি কোথায় চলেছেন? আমার প্রশ্নে তিনি খুবই অবাক হয়ে গেলেন। ব্যাটা তুমি জান না বুঝি, আজ তোমার বিয়ে। আমিও অবাক হলাম। কারণ আমি সত্যি সত্যি জানিনে। বাবা বললেন, কখনো কখনো এমন কাণ্ড ঘটে যায়। আমি বললাম, আব্বাজান আমার ঈদের চাপকান কই। অন্তত একখানা শাল এ উপলক্ষে আপনি তো আমাকে দেবেন। আব্বা সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বেটা শাদা ধুতি পরো। আমি বিয়ের সময় সাদা ধুতি পরেই বিয়ে করেছিলাম। তোমার বড় ভাইকেও ধুতি পরিয়ে বিয়ে দিয়েছি। তিনি আমার হাতে একখানা ধুতি সমর্পণ করলেন। আমি বললাম, আব্বা আমি যে ধুতি

পরতে জানিনে। ব্যাটা বেহুদা বকো না। পরিয়ে দেয়ার মানুষের কি অভাব! যাও তাঞ্জামে ওঠো। আমি বললাম, এ শুভদিনে আপনি অন্তত একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করবেন না? আব্বা বললেন, ব্যাটা মুরুব্বিদের সঙ্গে বেয়াদবি করা তোমার মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি। যাও তাঞ্জামে ওঠো। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোথাও তাঁকে দেখলাম না। তারপর দেখলাম চারজন মানুষ আমাকেই একটা খাটিয়ায় করে আমাদের গ্রামের পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাউকে আমি চিনিনে। লোকগুলো আমার খাটিয়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সুর করে বলছে, বলো মোমিন আল্লা বলো। তাদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাস্তার লোকেরাও বলছে, আল্লা বলো। আমি মনে মনে বললাম, এ কেমনধারা বিয়ে গো! বাজি পোড়ে না, বাজনা বাজে না। অমনি পায়ের দিকে বহনকারী দুজন লোক কথা কয়ে উঠল। এই লাশটা পাথরের মতো ভারী। একে আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। মাথার দিকের বাহক দুজন বলল, না না চলো। আর তো অল্প পথ। তোমরা যাও আমরা পারব না। তারা কাঁধ থেকে কাত করে আমাকে রাস্তার ওপর ঢেলে দিল। আমি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। তন্দ্রা টুটে গেল। হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট লেগেছে। চোখ মেলে চাইলাম, আমি ফ্লোরের ওপর শুয়ে আছি আর শরীরে সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছি। কাচের জানালার শার্সি ভেদ করে শিশু-সূর্যের দুতিনটে রেখা ঘরের ভেতরে জ্বলছে। খুব পিপাসা বোধ করছিলাম। আবার খাটে ওঠার কোনো প্রবৃত্তি হল না। তিন চার মিনিট তেমনি পড়ে রইলাম। চোখ বন্ধ করে তন্দ্রার মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে মনে মনে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

ডা. মাইতি আমার কাঁধ নাড়া দিয়ে বললেন, একী দানিয়েল সাহেব আপনি নিচে কেন? আমি আস্তে আস্তে বললাম, স্বপ্নের ঘোরে খাট থেকে পড়ে গিয়েছি। বাঃ চমৎকার! আপনার মনে এখনো স্বপ্ন আসে। সুতরাং দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। আশা করি দাড়ি কাটতে এবং স্নান করতে অমত করবেন না। আমি মৃদুস্বরে বললাম, না। তিনি বললেন, বাথরুমে শেভিং রেজার, সাবান ইত্যাদি দেয়া আছে। যান তাড়াতাড়ি যান, এখখুনি খাবার দেয়া হবে। বাথরুমে যেয়ে গালে সাবান ঘষতে ঘষতে দেখি থুতনির কাছে আট দশটা পাকা দাড়ি উঁকি দিচ্ছে। দুকানের গোড়ায়ও অনেকগুলো বাঁকাচোরা রুপোলি রেখা। চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আহা আমার যৌবন শেষ হতে চলেছে। আমি বুড়োত্বের দিকে এগুচ্ছি। এতদিন চোখে পড়েনি কেন। এক মাসের মধ্যেই কি ম্যাজিকটা ঘটে গেল।

ডা. মাইতির সঙ্গে খাবার টেবিলে গেলাম। চুপচাপ লুচি, হালুয়া, ডিম এবং চা খেয়ে গেলাম। আমার কথাবার্তা বলার কোনো প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তিনিও বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চোখে চোখ পড়ে যায়। মনে হল তিনি যেন কী একটা গভীর বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। ডা. মাইতির সঙ্গে আমার একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই এক রাতের মধ্যে তাতে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। আমার মনের এরকম একটা অবস্থা, যা ঘটুক আমি কেয়ার করিনে। চারপাশের লোকজন এদের আমি চিনিনে, চিনতেও চাইনে। ডা. মাইতি আমাকে জিগগেস করলেন, সকালবেলা তায়েবাকে একবার দেখে যাবেন কি? আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, চলুন। কোনো ব্যাপারে আর আমার উৎসাহ নেই। গতরাতে তায়েবা যদি

ঘুমের মধ্যে মরেও গিয়ে থাকে, আমি যদি হাসপাতালে যেয়ে তার মরা শরীর দেখি, তবু কেঁদে বুক ভাসাব না। আমি কী করব, আমার করার কী আছে।

সে যাক, ডা. মাইতির পেছন পেছন আমি তায়েবার ওয়ার্ডে প্রবেশ করলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম। এই সাতসকালে জাহিদুল এবং ডোরা তায়েবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য সময় হলে বোধ করি আমি নিজের মধ্যে হলেও প্রচণ্ডভাবে খেপে উঠতাম। আজকে সেরকম কোনো অনুভূতিই হল না। বরঞ্চ মনে হল, ওরা আসবে একথা আমার মনের অবচেতনে জানা ছিল। আমিও চুপচাপ তায়েবার মাথার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। এখনো মুখ ধোয়নি। ফ্যানের বাতাসে মাথার চুল উড়াউড়ি করছে। তার চোখেমুখে বেদনামথিত স্নিগ্ধ প্রশান্তির দীপ্তি। আমাকে দেখামাত্রই তার মুখে কথা ফুটল। এই যে দানিয়েল ভাই, আসুন। আপনি কি কাল মাইতিদার কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন? নইলে এত সকালে আসবেন কেমন করে? আমি মাথা নাড়লাম, তাই। নীরবে জাহিদুলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জাহিদুলের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। তায়েবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই একটা জিনিস আমি লক্ষ করে আসছি। আমার প্রতি তাঁর এক-ধরনের মজ্জাগত ক্রোধ রয়েছে। আমাকে আর তায়েবাকে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখলে ভ্রূকুটি জোড়া মেলে ধরতেন। তিনি আমাদের পরিচয় আর মেলামেশা কখনো সহজভাবে নিতে পারেননি। এমনকি একাধিকবার মন্তব্য করেছেন, আমি ভীষণ নারী-লোলুপ মানুষ। নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভড়ংসর্বস্ব একটা ফাঁফা মানুষ জ্ঞান করে আসছি। আর সুযোগ পেলে কখনো ছেড়ে কথা বলিনি। আজকে তিনিও মৃদু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। সবকিছুর এমন পরিবর্তন ঘটল কী করে? সকলেই কি তায়েবার ভাবী পরিণতি সম্পর্কে জেনে গেছে?

জাহিদুল সামনের দিকে ঝুঁকে একটা ব্যাটারিচালিত টেপরেকর্ডার বাজিয়ে তায়েবাকে কীসব গান শোনাচ্ছিলেন। আমার আচমকা উপস্থিতিতে সেটা অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল। তায়েবা বলল, রিউইন্ড করে আবার প্রথম থেকে বাজান জাহিদ ভাই। দানিয়েল ভাইও শুনুক। আমাকে বলল, দানিয়েল ভাই শুনুন, ডোরা দিল্লিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি একক প্রোগ্রাম করেছে। গান বাজতে থাকল। দেয়ালে হেলান দিয়ে তায়েবা চোখ বন্ধ করে রইল। বাংলাদেশে থাকার সময়ে ডোরা রেডিও, টিভিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গাইত। যখন গান বাজত তখনো এমনি করে তায়েবা বিদ্যুৎ-বাহিত স্বরতরঙ্গের মধ্যে নিজের সমস্ত চেতনা বিলীন করে দিত। "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।" ডোরার কণ্ঠ অত্যন্ত সুরেলা। তাতে যেন বিষাদের একটুখানি ছোঁয়া আছে। এই ছোঁয়াটুকুর স্পর্শেই সঙ্গীতের সুদূরের আহ্বানটি যেন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। ডোরা জাহিদুলের কাছে গান শিখেছে। তাঁর সম্পর্কে যার যতই নালিশ থাকুক, কিন্তু একটি কথা সত্য, যাকে গান শেখান প্রাণমন দিয়ে শেখান। আবার বেজে উঠল "আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি, আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।" এমনি করে একঘণ্টার প্রোগ্রাম ক্যাসেটপ্লেয়ারে বাজতে থাকল। সবগুলো গান যেন তায়েবার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নির্বাচন করা হয়েছে। তা হলে ডোরাও কি জেনে

গেছে অন্তিম পরিণতিতে [illegible]

খুঁতখুঁতোনি অনুভব করছিলাম। [illegible]

কেন? "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" [illegible]

সকলে সবদিক দিয়ে তায়েবাকে [illegible]

পার্ক সার্কাসের বাসায় তায়েবাকে [illegible]

গিয়েছিল, তাও বোধহয় এ [illegible]

নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিল।

ক্যাসেট শেষ হলে তায়েবা চোখ খুলল। [illegible]

গানের শেষে এমনি গর্বের হাসি তার [illegible]

দেখেছি। তায়েবা খুব ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, [illegible]

ডুরি। বলাবাহুল্য তায়েবা ডোরাকে ডুরি নামেই [illegible]

এক আজব ব্যাপার বাপ্পা। নানা জায়গা থেকে [illegible]

গোটা মাসেই শেষ করা যেত না। ডোরা তায়েবাকে [illegible]

বড়বোনকে বাপ্পা বলে সম্বোধন করে তার ইতিকথা [illegible]

বলল, কয়েকটা অনুষ্ঠান করে এলেই পারতিস। এত [illegible]

কত বড় শহর, কত জ্ঞানীগুণীর ভিড় সেখানে। হাতের [illegible]

দুহাতে তায়েবার গলা জড়িয়ে ধরল। বাপ্পা তোমার [illegible]

কেঁদে ফেলল। তায়েবা গভীর আগ্রহে তার পিঠে হাত বুলোতে [illegible]

তো লেগেই আছে, কিন্তু তোর সুযোগ তো আর প্রতিদিন [illegible]

দিকে তাকিয়ে বলল, জানেন দানিয়েল ভাই, কালকে আপনার [illegible]

সারারাত বমি করেছি। একবার তো বাথরুমে পা পিছলে [illegible]

ভালো আয়াটা ছিল। নইলে সারারাত পড়ে থাকতে হত। [illegible]

আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। [illegible]

জেগে উঠল। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, [illegible]

যে জানতাম, তুমি এলেই একটা অঘটন ঘটাবে। তিনি [illegible]

কী হয়েছিল, বমি হয়েছিল কেন, কখন পড়ে গিয়েছিল, [illegible]

কুপথ্য মুখে দিয়েছিলে কি? তায়েবা বলল, না না [illegible]

আপনাআপনি বমি হতে শুরু করল। [illegible]

হল, এ নাটকে যা ঘটবে সব দেখে যেতে হবে। [illegible]

না। এমনকি একটা ফাপড়ও না। [illegible]

দিকে তাকিয়ে বললাম, তা হলে এখন আসি। [illegible]

দানিয়েল ভাই, যাবেন না। আপনার [illegible]

তোরা যা, প্রোগ্রাম শেষ হলে [illegible]

গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, [illegible]

প্রোগ্রাম করে এল, আজ [illegible]

মস্ত বড় বোঝা। নইলে আমিও গান [illegible]

গান গাইতে কখনো [illegible]

উঠে দাঁড়ান। আপনার কাঁধে ভর দিয়ে আমি একটু বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেব। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। আজ দশটায় আবার ডা. ভট্টাচার্যি এসে টেস্ট-ফেস্ট কীসব করবেন। আর সহ্য হয় না। আমি তাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। সে ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে মুখে সাবান ঘষল। তারপর মুখ ধুয়ে নিল। চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে চেষ্টা করল। তায়েবা বলল, আমার পা দুটো কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে। আমি বেসিনে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াব। আপনি আমাকে একটা টুল এনে দেবেন। আমি টুলটা এনে দিয়ে বসিয়ে দিলে সে হাঁপাতে লাগল। তার মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দানিয়েল ভাই, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। খাটের বাজুতে দেখবেন একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি আছে। সেখান থেকে খোঁজ করে একটা তাঁতের শাড়ি, পেটিকোট এবং ব্লাউজ এনে দিন না। এখনো বাসি কাপড় পরে রয়েছি। আমার গা কুটকুট করছে। গেস্তারিয়ার বাসাতেও দেখেছি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর পরিষ্কার করে গোসল সেরে একটা ধোয়া কাপড় পরেছে। আমি প্লাস্টিকের ঝুড়ি থেকে খোঁজ করে শাড়ি ব্লাউজ এবং পেটিকোট বের করে তায়েবার হাতে দিলাম। সে বলল, এখন টুলটা টেনে ওই দরোজার কাছে নিয়ে কাপড়-চোপড়গুলো পরতে হবে। আর আপনি একটু ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাকে বসিয়ে রেখে ওপাশে চলে এসে আমি দরোজা বন্ধ করে দিলাম। তায়েবা কোন কৌশলে এই অল্প পরিসর টুলের ওপর বসে কাপড়চোপড় পরবে আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

কাপড় পরা শেষ হলে তায়েবা আমাকে ডাকল। আমি দরোজা খুললাম। কাপড়-চোপড় পরেছে বটে, কিন্তু আঁচলটাকে সামলাতে গিয়ে ভারি অসুবিধে হচ্ছিল। কাঁধ থেকে খসে মেঝেতে পড়ে আঁচলটা ভিজে গেল। তায়েবা বলল, আপনি ভীষণ অপয়া। আমার আঁচলটা ভিজে গেল। আঁচল তুলে নিয়ে সে পানি চিপে বের করে নিল। আরেক বার আপনাকে কষ্ট করতে হবে। আমার শিথানে একটি ক্রিম আছে। চাদর ওঠালেই দেখতে পাবেন। প্লিজ সেটা গিয়ে একটু নিয়ে আসুন না। আমি ক্রিমটাও নিয়ে তার হাতে দিলাম। সে আঙুলের ডগায় ক্রিম তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ঘষে ঘষে মুখমণ্ডল এবং ঘাড়ের কাছটিতে লাগাল। তারপর আমার হাতে ফেরত দিল। এখন আপনি আবার আগের মতো দাঁড়ান। আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু সে পায়ের ওপর ভর করে আর উঠতে পারল না। উঃ দানিয়েল ভাই! আমি বললাম, কী তায়েবা। আমার হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। শরীরের সমস্ত শক্তি কাপড় পরতেই শেষ হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পাঁজাকোলা করে বিছানায় রেখে আসুন না। আমি দুহাত দিয়ে তাকে উঠিয়ে নিলাম। সে একটি হাত আমার ঘাড়ের ওপর রাখল। কাজটি শেষ হতে দুমিনিট সময়ও ব্যয় হয়নি। তায়েবার সঙ্গে আমার পরিচয় চার বছর। কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ কখনো সে করেনি।

বিছানায় শুয়ে সে কয়েকবার হাঁ করে শ্বাস ফেলল। বুঝলাম তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। বেশ কয়েক মিনিট পর আমাকে জিগগেস করল, দানিয়েল ভাই, আপনি কি ডোরার গান শুনতে যাবেন? যান তো একখানা টিকিট দিতে পারি। আমি বললাম, না, কারণ যেখানে থাকি সেখানে যেতে হবে। তারপর পত্রিকা অফিসে গিয়ে লেখার কিস্তিটি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আপনি ডুরির প্রতি এত বিরূপ কেন? ও কি সংসারের কিছু বোঝে? ঝোঁকের

মাথায় একটা কাজ করে বসেছে, তা এমন সিরিয়াসলি না নিলেও তো পারেন। তার যখন জন্ম হয়েছিল, তখন মার ভয়ানক অসুখ ছিল। আমি নিজের হাতেই সেবাযত্ন করে এত ডাগরটি করেছি। একবার তো মরতেই বসেছিল। উহ্ তখন আমার ওপর কী ধকলটাই না গেছে। গায়ে গতরে বেড়েছে বটে। আসলে ওর কি বয়স হয়েছে। আপনি তার দিকে একটু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন না। মানুষের ভুলটাকেই অত বড় করে দেখেন কেন?

৫

হাসপাতাল থেকে আমি সবটা পথ পায়ে হেঁটেই বৌবাজারের হোস্টেলে এলাম। ট্রাম বাসে চড়ার ইচ্ছেও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। মনে হচ্ছে আমি একেবারে কাঙাল বনে গেছি। আমার চিন্তা করার কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা করারও কিছু নেই, ভরসা করার কিছু নেই। তবু হোস্টেলে আসতে পারলাম কেমন করে সে আমি বলতে পারব না। গেটের গোড়ায় এসে দেখি ভুঁড়িঅলা দারোয়ানটির বদলে দুবলা-পাতলা দারোয়ানটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে খৈনি টিপছে। আমাকে দেখতে পেয়ে পান-খাওয়া গ্যাটগ্যাটে দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, বাবু কোটিমে যাইয়ে আজ, হাওয়া বুহুত গরম আছে। কোনো উত্তর না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

যে রুমে আমরা থাকি, সেখানে মাঝারি রকমের একটা কনফারেন্স বসে গেছে। বাংলাদেশের ছেলেদের অধিকাংশই হাজির আছে। তা ছাড়া আছেন কলকাতার সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পোস্টাফিসে চাকরি করেন। ফর্সাপানা সুন্দর চেহারার সদানন্দ মানুষটি। সব সময়ে পরিষ্কার পাজামা পাঞ্জাবি পরেন এবং দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কেটে থাকেন। অবসর সময়ে কবিতা লেখেন। কিন্তু কলকাতার কাগজগুলো, এমনকি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরাও তাঁর প্রতি এমন নির্দয় যে কবিতা কেউ ছাপতে চান না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি বিপ্লবীও বটে। কী কারণে বলতে পারব না কোনো বিপ্লবী পার্টির সদস্য হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কথাবার্তা বলে দেখেছি পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী পার্টিগুলোর নীতি আদর্শের প্রতি তাঁর ভীষণ রকম অনাস্থা এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি সুমন্তবাবুর ভয়ানক রাগ। কথায় কথায় তিনি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। অবশ্য ইদানীং সুমন্তবাবুর বেশ পুষিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এইসব ভাসমান কর্মহীন উদ্দেশ্যহীন ঘরহারা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের সঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মার্কামারা সত্যিকার একটি গণবিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে হামেশা আলাপ আলোচনা করে থাকেন। তাঁর ধারণা পশ্চিমবাংলা হেজে মজে গেছে। সমাজকে নিয়ে কিছু যদি করার থাকে, তা বাংলাদেশের ছেলেদের দিয়েই সম্ভব। তত্ত্বের জঙ্গলে ওদের ধ্যান ধারণা এখনো পথ হারিয়ে ফেলেনি। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেকেই সুমন্তবাবু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গণবিপ্লবের একেক জন সৈনিক হিসেবে দেখেন। এরই মধ্যে উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের ছেলেদের নিয়ে তিন তিনটে কবিতার সংকলন প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনটিতেই সুমন্তবাবুর তিনটি কবিতা সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে। মানুষটি রসগোল্লার মতো। মনে হয় টিপলেই রস বেরুবে। কী কারণে বলতে পারব না, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়টা মামুলিপনা অতিক্রম

করে হৃদ্যতার স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। আমার পরনে ধুতি দেখে মাসুমই প্রথম ফোড়ন কাটল। দানিয়েল ভাই, বলুন দেখি কলকাতার হাওয়া এখন কার গায়ে লাগছে? মাসুম কলকাতার মানুষের মতো টানটোন লাগিয়ে ঢাকার বাংলা ভাষাটি বলতে চেষ্টা করছে আজকাল। একবার সেদিকে ইঙ্গিত করেছিলাম। আজ আমার পরনে ধুতি দেখে মাসুম তার শোধ দিতে চেষ্টা করছে। মাসুমের কথার পিঠে কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। নীরবে নরেশদার পাশে গিয়ে একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। নরেশদা জিগগেস করলেন, কী খবর? আমি বললাম, ভালো নয়। কীরকম বলো দেখি? এসব শেষ হোক পরে বলব। আমি চোখ দুটো বন্ধ করে রইলাম। মনে হচ্ছিল একটা প্রচণ্ড সংজ্ঞাহীনতা আমাকে এখখুনি গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে পারছিলাম না। এক ভদ্রলোক যিনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরভর্তি মানুষের সামনে বলছিলেন। বোধ করি তিনি আগের থেকেই কথা বলছিলেন। আমার আগমনে হঠাৎ করে তাঁর কথায় ছেদ পড়ে থাকবে। বাংলাদেশের ফ্রিডম ওঅরের কথা শুনে লেখাপড়া ছেড়ে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা এসেছি আজ পঁচিশ দিন। কিন্তু এখানে এসে কী দেখেছি। দেখেছি থিয়েটার রোডে যারা বসে আছে তাদের অধিকাংশই এ বাঞ্চ অস রাস্কেলস। খাচ্ছে দাচ্ছে মজা করছে এভাবে নাকি ফ্রিডম ওঅরের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভয়ংকর ডিজ-ইল্যাশানড হয়ে গেছি। মাও সে তুঙও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই লং মার্চের খবর জানেন?

আপনার মাও সে তুঙ এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে কী করছেন, সে খবর রাখেন? পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে খুন জখম হত্যা ধর্ষণ সবকিছু অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছে। আর আপনার মাও সে তুঙ সে ইয়াহিয়ার জল্লাদ সৈন্যদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জাহাজ ভর্তি করে বোমা, কামান, অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে, লং মার্চ তো অতীতের ঘটনা। হালের খবর বলুন। আমার মনে হল, প্রশ্নকারীর কণ্ঠস্বরটি আমার পরিচিত। ওহ্ মনে পড়েছে। গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনের মনকুমার সেন একবার যিনি এখানে এসেছিলেন, এই ভদ্রলোক, তাঁরই বড় ছেলে। নামটি মনে আসছে না। অমর্ত্য সেন না কী একটা হবে। তাঁর বাড়িতে একবার খেতে গিয়েছিলাম। সকলেই কথা বলছে। কোনো আগামাথা নেই। কোথায় শুরু এবং শেষ কোথায় হচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বাংলাদেশের সালাম এবার মুখ খুলল। মাওলানা ভাসানী মাও সে তুঙ এবং চৌ এন লাইয়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, যাতে চীন পাকিস্তানিদের এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে কোনোরকম সহায়তা না করে। আরে থোন ফালাইয়া, আপনার মাওলানা ভাসানীর টেলিগ্রাম দুইখান চৌ এন লাই আর মাও সে তুঙ যতন কইর‍্যা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে থুইয়া রাখছে। মাওলানা এখন ইন্ডিয়া কেন আইছে হেইডা কইবার পারেন? তাবিজ দেয়ার মৌলবি আপনেরা তারে বিপ্লবী লিডার বানাইছেন। কথাগুলো খুরশিদের। খুরশিদ সম্পর্কে একটু পরিচয় দিতে হয়। সে সব জায়গায় ঘটা করে আওয়ামী লীগের লোক বলে প্রচার করে। জায়গা বুঝে মাঝে মাঝে হাই কম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, একথা বলতেও পেছপা হয় না। তবে মুশকিল হল, আওয়ামী লীগের লোকেরা তাকে পাত্তা দেয় না। সত্যিকার আওয়ামী লীগের কাছে ঘেঁষতে না পেরে খুরশিদ আমাদের ডেরায় এসে আওয়ামী লীগ-বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করে। ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত

ভদ্রলোক জিগগেস করলেন, বাই দ্যা বাই, ক্যান এনি ওয়ান অব ইউ টেল মি হোয়ার মাওলানা ইজ নাউ। উয়ি হিয়ার দ্যাট হি ওয়াজ আন্ডার অ্যারেস্ট। মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। কে একজন বলল, মাওলানাকে ধরে লাল কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরেকজন বলল, অ্যারেস্ট করা হয়েছে, একথা সত্যি নয়, তবে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নিজে অবশ্য শুনেছি পয়লা মাওলানাকে বালীগঞ্জের একটা বাড়িতে রাখা হয়েছিল। মাওলানা সন্ধে হলেই সে বাড়ির ছাদের ওপর পায়চারি করতেন। তাঁর লম্বা দাড়ি, পাঞ্জাবি, বেতের টুপি, লুঙ্গি এসব দেখেই আশেপাশের মানুষের সন্দেহ হতে থাকে যে, এ মাওলানা ভাসানী না হয়ে যান না। তা ছাড়া মাওলানার আরেকটা একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য ভারত সরকার তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। আর তা এই সন্ধেবেলা সব সময়ে আজান দিয়ে ছাদে চাদর বিছিয়ে মাগরেবের নামাজ পড়তেন।

একসময় মাওলানা ভাসানী প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। আলোচনা শুরু হল শেখ মুজিবকে নিয়ে। খুরশিদ বলল, থিয়েটার রোডের যেসকল মাস্তান আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে সবকিছু লুটপাট করে খাচ্ছে. এখানে বঙ্গবন্ধু হাজির থাকলে পেঁদিয়ে তাদের পিঠের ছাল তুলে ফেলতেন। সালাম ঠোঁট উলটে জবাব দিল, আরে রাখো তোমার বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই ধরা দিয়েছে। পৃথিবীর কোন বিপ্লবী সংগ্রামের নেতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তোমার ওই বঙ্গবন্ধুর মতো শত্রুর কাছে সগৌরবে আত্মসমর্পণ করেছে তার কোনো নজির আছে কি? শেখ মুজিব সব সময় সুটকেস গুছিয়ে রাখতেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই জেলে চলে যেতেন। আর আন্দোলন শেষ হয়ে গেলে বিজয়ী বীরের বেশে জেলখানা থেকে বেরিয়ে ক্রেডিটটুকু নিতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে। শেখ পাকিস্তানের জেলে আর আমরা এখানে কলকাতার পথে পথে ভেরেণ্ডা ভেজে চলছি। এই অবস্থাটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তোমার ওই শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ। শেখের মতো এত বড় জাতীয় বেইমান আর দ্বিতীয়টি নেই। খুরশিদ হুংকার দিয়ে উঠল, খবরদার সালাম ছোট মুখে বড় কথা বলবে না। অন্য লোকের নামে বললে কিছু মনে করতাম না। বঙ্গবন্ধুর নামে কিছু বললে, মুখের বত্রিশটি দাঁতের একটিও আস্ত রাখব না। সালাম এবং খুরশিদ উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পর শক্তিপরীক্ষার মাধ্যমে একটি মীমাংসায় পৌঁছার উপক্রম করলে সকলে ধরাধরি করে দুজনকে থামিয়ে দিল।

এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। এরকমের একটা বিস্ফোরণের পর আলোচনা আর স্বাভাবিক খাতে এগুচ্ছিল না। ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত ভদ্রলোক বললেন, সরি আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সুতরাং এখখুনি আমাকে উঠতে হবে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তবাবুও উঠে গেলেন। বোঝা গেল, ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত ভদ্রলোকটি সুমন্তবাবুই সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আসরের একেকজন করে উঠে যাচ্ছিল। ওমা এমনি করে সবাই উঠে গেলে চলবে কেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখনো তোলাই হয়নি। মাসুমকে কথা বলতে শুনলাম। 'গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি মনে হয় সকলের মনে একটু দাগ কাটল। মাসুম খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িঅলা এক ভদ্রলোকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নাহিদ ভাই এবার আপনার কাহিনীটা একটু বলুন। তিনি যে দুঃখে পড়েছেন, চেহারা সুরত দেখলেই মনে হয়। উদ্ভ্রান্তের মতো চোখের দৃষ্টি। জামার

একটি হাতা গুটোনো, অন্যটি ছেড়ে দেয়া। ভদ্রলোক কথা শুরু করতে গিয়ে একটু একটু করে কাঁপছিলেন। গলার স্বরটিও কাঁপছিল। যাহোক তিনি তাঁর কাহিনীটা বলতে আরম্ভ করলেন। বগুড়া দখল করার পর আমরা দেড়মণ সোনা স্টেট ব্যাংকের স্ট্রং রুমের সেফটি ভল্ট ভেঙে এখানে নিয়ে আসি। আমরা তিনজন সোনাসহ নৌকোতে করে বর্ডারে এসে পৌঁছোই। সেখান থেকে গাড়িতে করে কলকাতা এসে দুটো সুটকেস কিনে সোনাগুলো ভাগাভাগি করে রাখি। তারপর তিনজন শেয়ালদার কাছে একটা হোটেলে উঠি। একদিন না যেতেই অন্য দুজন হোটেল ছেড়ে সুটকেস দুটো নিয়ে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। আমাকে বলেছিল, তিনজন একসঙ্গে গেলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। আমি সরলভাবে তাদের কথা বিশ্বাস করেছি। তারা কোনো সেফ জায়গায় ওঠার পর আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

সেই যে গেল আর কখনো তাদের দেখা আমি পাইনি। নরেশদা বললেন, এই সোনা তো বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি। আপনারা এখানে নিয়ে এলেন কেন? থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো নালিশ-টালিশ করেননি? নাহিদ সাহেব বললেন, থিয়েটার রোডে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। কেউ আমার কথা কানেও তুলতে চান না। যে তিনজন আমরা সোনা নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে একজন এম. পি.-র আপন ছোট ভাই। আরেকজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের শালা। তারা এখন কোথায় আছে, কী করছে, কিছু জানিনে। অথচ এদিকে শুনতে পাচ্ছি সেই সোনা ইতিমধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে। দেখছেন তো এই অবস্থায় আমার কথা কে গ্রাহ্য করে? তিনি নিজের দীন দশার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সত্যিই তো এরকম একজন মানুষ দেড়মণ সোনা বয়ে নিয়ে এসেছে শুনলে এখন কে বিশ্বাস করবে। ভদ্রলোক বললেন, এখন আমি কী করি বলুন তো, পথেঘাটে বের হওয়া একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কলকাতার এবং বাংলাদেশের চেনা অচেনা মানুষ ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যদি কলকাতা শহর ছেড়ে না যাই, তা হলে আমাকে খুন করা হবে অথবা পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে ভারতের পুলিশের কাছে তুলে দেয়া হবে। আমি এখন কী করব বুঝতে পারছিনে। আপনারা কি আমাকে কোথাও আশ্রয় দিতে পারেন? তাঁর গল্পটি কেউ অবিশ্বাস করল না। কেননা এরকম ঘটনা এই একটি নয়। আকছার ঘটছে। মুখে মুখে অনেক সহানুভূতিও প্রকাশ করা হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। খুরশিদ কিন্তু নাহিদ সাহেবকে একটা পাকা আশ্বাস দিয়ে ফেলল। কাল এই সময়ে আপনি এখানে আসবেন। থিয়েটার রোডে নিয়ে গিয়ে তাজুদ্দীন সাহেবকে সবকিছু খুলে বলে বদমায়েশদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করব। আজ বাড়ি চলে যান। নাহিদ সাহেব বললেন, এখানে আমার বাড়ি কোথায় যে যাব। খুরশিদ বলল, যেখানে থাকেন, চলে যান। আমার তো থাকার কোনো জায়গা নেই। খুরশিদ বিরক্ত হয়ে বলল, কাল কোথায় ঘুমিয়েছিলেন? কাল তো গোটা রাত শেয়ালদা স্টেশনে কাটিয়েছি। দূর মশায় আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল।

আমার চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে আসছিল। এত ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় কী করে যে এতসব কথাবার্তা নীরবে শুনে আসছিলাম, তার কারণ কী ঠিক বলতে পারব না। সবাই চলে গেলে নরেশদা জিগগেস করলেন, গতরাতে কি তোমার ঘুম হয়নি? আমি বললাম,

না। এখন কি ঘুমোবে? বললাম, হ্যাঁ। কিছু খাবে না? ঘুমজড়ানো অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলাম, খেয়ে এসেছি।

বেলা তিনটের দিকে আমার ঘুম ভাঙল। দেখি রুমে আর কেউ নেই। নরেশদা বসে বসে সুবলচন্দ্র মিত্র এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান দুটো নিয়ে কীসব করছেন। অভিধান পাঠ করা এবং একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে দেখা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ঢাকায় থাকার সময়ে আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম, বছর তিনেকের মধ্যে তিনি নিজে একখানা অভিধান জন্ম দিতে যাচ্ছেন। জিগগেস করলেন, দানিয়েল গতরাতে কোথায় ছিলে? আমি বললাম, তায়েবার ডাক্তার মাইতিবাবুর কোয়ার্টারে। তায়েবার রোগ সম্পর্কে ডাক্তার কিছু বললেন? বললাম, হ্যাঁ লিউক্যামিয়া। ওটা নাকি ক্যান্সারের একটা ভ্যারাইটি। ডা. মাইতি বললেন, এ ধরনের রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই নাকি? গলার স্বরটা চমকে গেল। তিনি অভিধান দুটো বন্ধ করে গালে হাত রেখে কীসব ভাবলেন। এখন তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, গোল পার্কের কাছে অর্চনাদের বাড়ি আছে না সেখানেই যাব। অর্চনা তো চাকরি করে কলেজে। তিনি কি কলেজে যাননি? এখন গেলে পাবে? আমি বললাম, আজ অফিসে আসবে না। গিয়ে দেখি পেলেও পেতে পারি। সেকী, খাবে না? আপনি খেয়েছেন? হ্যাঁ আমাকে খেতে হয়েছে। রাজারমঠ থেকে দাদা এসেছিলেন। তাঁকেসহ খেয়ে নিয়েছি। মা-বাবার কোনো খবর-টবর পেলেন? হ্যাঁ, মা-বাবা আজ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। আমি বললাম, ভালো খবর। তিনি এখন কোথায়? খবরটা দিয়েই চলে গেছেন আবার। কাপড়চোপড় পরে আমি জিগগেস করলাম, নরেশদা আপনার কাছে টাকা আছে? বললেন, কত? এই ধরুন পনেরো বিশ। তিনি আমার হাতে বিশ টাকার একখানি নোট দিলেন। আমি বেরিয়ে আসছি, তিনি ডাক দিলেন, একটু দাঁড়াও। তায়েবার হাসপাতালের ওয়ার্ড নম্বর এবং বেড নম্বরটি লিখে দিয়ে যাও। আমি কাগজ নিয়ে লিখে দিলাম।

৬

অর্চনার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল। উনিশশো আটষট্টির দিকে অর্চনা একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। ওতে আমার একটি গল্প ছাপা হয়েছিল; আমি এমন আহা মরি লেখক নই। তথাপি কী কারণে বলতে পারব না, লেখাটি অর্চনার মনে ধরেছিল। তখন থেকেই সম্পর্ক। অবশ্য চোখের দেখা হয়নি। এখানে আসার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে অর্চনাই ছিল একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি। বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করে তাকে পেতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। বড় আশ্চর্য মেয়ে অর্চনা। এখানকার একটি কলেজে ফিলসফি পড়ায়। একসময় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অধ্যাপক সুশীতল রায়চৌধুরী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ করে দলের লোকদের হাতে নিহত হওয়ার পর থেকেই অর্চনা নিজেকে আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত নয় কিন্তু অনেকের সঙ্গে ওঠাবসা আছে। ছাত্র পড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে বটে কিন্তু একটা অস্থিরতা সর্বক্ষণ

মনের মধ্যে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তা আমি অনুভব করতে পারি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই খোলামেলা। আমরা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করি। মাঝে মাঝে আমার অবস্থা যখন খুবই অসহ্য হয়ে ওঠে, কয়েক ঘণ্টা ওদের ওখানে কাটিয়ে মনটাকে ঝরঝরে করে তুলি।

আজও প্রাণের ভেতর থেকে একটা গভীর তাগিদ অনুভব করছিলাম। পা দুটো আপনা থেকেই চলতে আরম্ভ করল। বাসে গড়িয়াহাটা পর্যন্ত এসে বাকি পথটা টানা রিকশায় গেলাম। এ অবস্থায় এটা একটা বিলাসিতা বটে। কিন্তু হাঁটার মতো পায়ে কোনো জোর পাচ্ছিলাম না।

গোল পার্কের বাড়িতে গিয়ে বেল টিপতেই অর্চনা নিজে এসে দরোজা খুলে দিল। আমাকে দেখে তার চোখজোড়া খুশিতে চকচক করে উঠল। জান দানিয়েল আজ ভেবেছিলাম বৌবাজার গিয়ে তোমাকে খুঁজে বের করব। হোস্টেলটা চিনিনে বটে। তবে ঠিকানা তো ছিলই। খুঁজে বের করতে কতক্ষণ। বাংলাদেশের ছেলেদের একটা সারপ্রাইজ দিতাম। আমি বললাম, যাওনি যখন, সেকথা বলে আর লাভ কী? সে বলল, আমি তো প্ল্যান করেছিলাম যাবই, মাঝখানে বৌদি পাকড়ে ফেলে তার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে এসেই দেখি মা রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন। যেই আমি বাড়িতে পা দিয়েছি, অমনি মা ঘরের মধ্যে বন্দি করে নিজে বেরিয়ে গেলেন। মিশনে অক্ষরানন্দ নামে এক মহারাজ এসেছেন। আর তাঁর মুখের বচন নাকি ভারি মিষ্টি। তা কী আর করা। আমি বেচারি বাড়িতে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি। অর্চনা নিতান্ত আটপৌরে কথাও সুন্দর করে বলতে জানে। আমি বললাম, অর্চনা এক কাপ চা খাওয়াবে? ওমা চা তো খাবেই। সে অনুচ্চস্বরে ডাকল, শোভা এই শোভা। কাজের মেয়েটি এলে বলল, দুকাপ চা করে নিয়ে আয়। আর দেখো খাবার কিছু আছে কি না। আমি বললাম, অর্চনা শুধু চা, আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অর্চনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বলল, দানিয়েল নিশ্চয়ই তোমার একটা কিছু হয়েছে। মুখটা ভয়ানক শুকনো দেখাচ্ছে। জবাবে বললাম, কিছু একটা না হলে শুধুশুধু তো আর তোমার কাছে আসিনে। সে বললে, বাপু কথা না বাড়িয়ে সেটা বলে ফেলো না। আমার সে পরিচিতা বান্ধবী যার কথা তোমাকে বলেছি, গত পরশু তার দেখা পেয়েছি। তা হলে তো পেয়েই গেছ, আমাদের এখানে এসেছ কেন? আচ্ছা যাক, তোমার সে ভদ্রমহিলার গল্প শুনি। আমি বললাম, বলার মতো আর কোনো গল্প নেই। সেকী, দেখা না হতেই ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছ নাকি। আমাকে বুঝি মধ্যস্থতা করতে হবে। আমাকে বলতেই হল, তার মারাত্মক অসুখ। ডাক্তার বলছে ক্যান্সার। ওমা সেকী! এখন কোথায় আছে। আমি বললাম, পি. জি. হাসপাতালে। তুমি কেমন করে খুঁজে বের করলে। সেকথা থাকুক অর্চনা। খুঁজে বের করে কী লাভটা হল। সে ফোঁস করে উঠল, তোমরা ব্যাটাছেলেরা ভয়ানক নেমকহারাম। সব সময় লাভ খুঁজে বেড়াও। এরই মধ্যে চা এসে গেল। চুমুক দিতে দিতে টুকটাক কথাবার্তা হল। অর্চনা জিগগেস করল, তুমি এখন কী করবে। কী করব সেটাই প্রশ্ন। ওসব হেঁয়ালি রাখো। বাস্তবে কী করবে সেটাই বলো। আমি বললাম, যা ঘটবার ঘটে যাবে, আমাকে শুধু দেখে যেতে হবে। বাস এর বেশি আর কিছু না। দানিয়েল তুমি ভয়ানক ভেঙে পড়েছ। ব্যাটাছেলেদের একটু শক্ত হতে হয়। এ

সময় শক্ত হওয়াই প্রয়োজন। ঠাণ্ডা মাথায় স্থির করো কী করবে। আমি বললাম, স্থির করাকরির আর কিছু নেই। তার পার্টির লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে চিকিৎসাতে ফল হবে না। সে মারা যাবেই। অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল। তুমি নেগেটিভ সাইডটা সব সময় বড় করে দেখ। মাথা ঠাণ্ডা করো একটু। আগে রোগী দেখি। তারপর স্থির করা যাবে, কী করতে হবে। আমি অনেক কষ্টে হাসতে চেষ্টা করলাম। বললাম, অর্চনা তোমাকে ধন্যবাদ। সব রকমের বিপদে-আপদে সব সময়ে তোমার মুখ থেকে চমৎকার সান্ত্বনার বাণী বেরিয়ে আসে।

এ সময়ে আবার কলিং বেল। অর্চনা উঠে দরোজা খুলে দিল। দুজন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের একজন হ্যাংলামতো। গায়ের রং ফর্সা, তবে কিছুটা জ্বলে গেছে। পরনে ধুতি আর শাদা শার্ট। ভদ্রলোকের চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। মাথার চুল লম্বা কোঁকড়ানো। সঙ্গের অন্য ভদ্রলোকটি বেঁটেখাটো। চকোলেট রঙের প্যান্ট এবং নীল হওয়াই শার্ট পরনে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে, এ ভদ্রলোক অত্যন্ত গোছালো। ওঁরা দুজন সোফায় বসলে অর্চনা বলল, এসো দানিয়েল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে সত্যব্রত আমার কলিগ এবং বন্ধু। আমি ধুতিপরা হ্যাংলাপনা ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলালাম। আর উনি হলেন অনিমেষদা। আশা করি দেখে চিনে নিতে তোমাদের অসুবিধে হবে না।

এ হচ্ছে দানিয়েল, আমার বাংলাদেশের বন্ধু। তার সম্পর্কে তো তোমাদের অনেক বলেছি। সত্যব্রতবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আরে দানিয়েল সাহেব, আপনার সম্পর্কে অর্চনার কাছে এত শুনেছি যে বলতে গেলে আপনার সমস্ত কিছু মুখস্থ হয়ে গেছে। তাঁর কথায় হাসলাম। তিনি ফের জিগগেস করলেন, আপনি কেমন আছেন, এখানে কোথায় উঠেছেন, আর আপনাদের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ কী? আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্বন্ধে জানতে চাইলে কেমন নার্ভাস এবং অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকি। মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে আমি কতটুকু বলতে পারি। দেশের ভেতরে কী হচ্ছে কিছু জানিনে। সীমান্তে যা ঘটছে তারও খবর ঠিকমতো পাইনে। থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিরা কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন? আমি সমস্যাতাড়িত অস্তিত্বের ভারে পীড়িত একজন অতি অসহায় মানুষ। আমার কাছে মানুষ যুদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে জবাব দিতে গিয়ে কেমন বাধোবাধো ঠেকে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশে একটি মুক্তিযুদ্ধ চলছে। এবং এই যুদ্ধের কারণেই কলকাতা মহানগরীর নাভিশ্বাস উঠেছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সাজো সাজো রব উঠছে। আমি সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের একটা ছিটকে-পড়া অংশ। যতই বিব্রত বোধ করি না কেন, এ জাগ্রত জ্বলন্ত সত্যকে এড়িয়ে যাই কেমন করে। সত্যব্রতবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা আমাকে দিলেন এবং একটা নিজে ধরালেন। তারপর একটুখানি হেসে বললেন, আমরা আশা করেছিলাম, আপনারা অন্য রকমের একটা ঘটনা ঘটাবেন। মার্চ মাসের প্রাথমিক দিনগুলোতে পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার ছেলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। আপনারা যুদ্ধের সমস্ত মাঠটা পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে একেবারে চূড়ান্ত নাজুক অবস্থায় ইন্দিরা সরকারের অতিথি হয়ে ভারতে চলে এলেন, এটা আমরা আশা করিনি। কথা

বলতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু কিছু না বলাটাও অশোভন। তাই আমাকে বলতে হল পাকিস্তানি আর্মির ক্র্যাক ডাউনের এক সপ্তাহ আগেও আমরা ধারণা করতে পারিনি যে আমাদের এভাবে এখানে চলে আসতে হবে। কিন্তু দেখতে পারছেন তো এসে গেছি। এখন করার বেশি কিছু কি আছে? সত্যব্রতবাবু অনেকটা আফসোসের ভঙ্গিতে বললেন, আপনাদের দেশ এবং জনগণের ভাগ্য এখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ চাইবে আপনাদের উপলক্ষ করে দাবায় নিজের চালটি দিতে। মাঝখানে আপনারা চিরে চ্যাপটা হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় কী জানেন আপনাদের ওই শেখ মুজিব মানুষটি হাড়ে হাড়ে সুবিধেবাদী অথবা আস্ত একটা বোকারাম। কী সুবর্ণ সুযোগই না আপনাদের হাতে ছিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা বুকের ভেতর জমিয়ে রাখলাম। অর্চনা বলল, তোমরা আলাপ করো, আমি দেখি চা দেয়া যায় কি না। সে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

অনিমেষবাবু মুখ খুললেন, আচ্ছা দানিয়েল সাহেব একটা কথা বলুন তো। আমি শুনেছি শেখ মুজিব নাকি বলেছিলেন, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকাতে হলে সবাইকে তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে। কথাটা কতদূর সত্যি। বললাম, কথাটা, আমিও শুনেছি। নিশ্চয়ই সত্যি হবে। তিনি বললেন, আমার অনুমানটা সত্যি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের যুদ্ধে পরিণত হবে। বাংলাদেশ হয়তো স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু কোন স্বাধীনতা? আখেরে জনগণের কোনো লাভ হবে না। দোদুল্যমান বিপথগামী নেতৃত্ব দেশের জনগণকে সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অর্চনা ট্রেতে করে চা নিয়ে এল। সকলে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে, এই সময়ে অর্চনা কথা বলল, বাংলাদেশের কথা বাদ দাও। পশ্চিমবাংলার কথা চিন্তা করে দেখো। তোমাদের গলাকাটা এবং মূর্তি ভাঙা প্রোমটার কী হাল হয়েছে কখনো কি তলিয়ে দেখেছ। অনিমেষদা আমার তো ইচ্ছে হয়, তোমাদের সবাইকে একটা করে আয়না কিনে দিই যাতে করে নিজেদের চেহারা নিজেরা ভালো করে দেখতে পার। দিনে দিনে যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে পশ্চিমবাংলায়ও কি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় না। ভুল শুধু বাংলাদেশের নেতারা করেছে আর তোমরা করনি, এটা কি সত্যি?

সত্যব্রতবাবু বললেন, বাংলাদেশ সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করে শাসক কংগ্রেস এখানকার পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে করে তুলেছে যে সত্যিকার বিপ্লবীদের চেহারা দেখানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ঠং করে পেয়ালাটা পিরিচের ওপর রেখে অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল, সত্যব্রত তুমি সত্যিকার বিপ্লবী কাদের বলছ! যারা মূর্তি ভেঙেছে, গ্রাম-গঞ্জের জোতদার মহাজনের গলা কেটেছে, চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলেছে, তারাই কি সত্যিকারের বিপ্লবী? আজকে তোমরা বাংলাদেশের ছেলেদের দায়ী করছ। তোমাদের বন্ধুরা কি অবগত আছেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য তাঁরা কম দায়ী নন। পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী আন্দোলন বাংলাদেশের আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে সবচাইতে বেশি। সেজন্য বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলো একটা সময় পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তোমাদের নেতাদের মতো তারাও বলেছে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান! যেহেতু পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব আছে তাই বামপন্থী কতিপয় দল এখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের

আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আসতে তোমাদের ভ্রান্তনীতি কি সহায়তা করেনি? আগে নিজেদের দোষগুলো দেখো তারপরে বাংলাদেশের দোষ ধরতে যেয়ো। দুঃখ এই জায়গায় যে কেউ সহজ বিষয় সহজভাবে দেখছ না।

বাহ্ চমৎকার আড্ডা হচ্ছে দেখছি। সুনীলদা ঘরে ঢুকলেন। দরোজা খোলাই ছিল। তিনি অর্চনার বড় ভাই। একটি বিদেশী কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভের চাকরি করেন। সব সময়ে হাসিখুশি থাকার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সুনীলদার। তিনি ঘরে ঢুকতেই মনে হল, দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিয়েছে কেউ। অনিমেষ, সত্যব্রত, দানিয়েল সবাই একসঙ্গে, বাহ্ চমৎকার। তিনি হাতের ব্যাগটা রেখে একসঙ্গে বসে গেলেন। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের। অর্চনা বলল, দাদা তুমি তো অফিস থেকে এইমাত্র এলে। কাপড়চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে তারপর বসো না, এখন তো তুমি ক্লান্ত। আরে রাখো, ক্লান্ত হব কেন, আমার নার্ভের মধ্যে জীবনযাপনের ঝকমারি ছাড়া অন্য কোনো টেনশন নেই। তাই আমি ক্লান্ত হইনে। তোদের মতো অত প্যাঁচগোচ তো আমি বুঝিনে। আমার ওই একটাই কথা, যে-কেউ নিজের শরীরের চাইতে বড় কোনো কিছুর জন্য আত্মদান করবে, যত ভুলই করুক, তার একটা ফল আলবত ফলবে। এই ধরো না বাংলাদেশের কথা, সেখানে এত মানুষ প্রাণ দিচ্ছে তার একটা সুফল আসবেই। আবার ধরো শয়ে শয়ে নকশাল ছেলে সি. আর. পি. এবং পুলিশের হাতে প্রতিদিন খুন হচ্ছে তারও একটা ফল হবে। হয়তো তুমি আমি যেভাবে চাই সেভাবে হবে না। কিন্তু ফল একটা অবশ্যই হবে। সত্যব্রতবাবু বললেন, সুনীলদা আপনার একটা সুবিধে কী জানেন? আপনি সমস্ত জাগতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব আকাশে টেনে নিয়ে একটা সমাধান টেনে আনতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি হেগেলেরও এক কাঠি ওপরে। পরম সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত জাগতিক দ্বন্দ্বের অবসান করে ফেলতে পারেন। সুনীলদা বললেন, তোমার ওই হেগেল-টেগেল বুঝিনে। আমি অত্যন্ত সহজ মানুষ এবং শাদা চোখে দুনিয়াটা দেখি। সুনীলদা অন্যরকমের মানুষ। উনাদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বেমানান। একথাটা দুপক্ষই বুঝতে পারে। তাই সত্যব্রতবাবু বললেন, চলুন অনিমেষদা যাই। সুনীলদা বললেন, সেকী তোমরা এরই মধ্যে চলে যাবে? তা কেমন করে হয়। বসো গল্প করি। চা খাও। অনিমেষবাবু বললেন, চা খেয়েছি। আরেক দিন নাহয় আসব আজ চলি। সুনীলদা বললেন, রোববার ছুটির দিন আছে, সকালবেলা এসো, চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

উনারা দুজন চলে গেলে সুনীলদা আমার কাছে ঘেঁষে বসলেন। ধরো দানিয়েল, তোমাকে একটা ভালো সিগারেট দিই। টেনে দেখো যদি ভালো লাগে আস্ত একটি প্যাকেটই প্রেজেন্ট করব। আজ এক পার্টি আমাকে আস্ত একটা কার্টুন গিফ্‌ট করেছে। তিনি সিগারেটে টান দিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুনিয়াতে বিস্তর ভালো জিনিস আছে, মাঝে মাঝে চেখে না দেখলে জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে যায় বুঝলে দানিয়েল। তারপর তিনি জুতো জোড়া এবং গায়ের জামাটি খুলে টেবিলের ওপর পা দুটি তুলে দিয়ে বললেন, কিছু মনে কোরো না দানিয়েল। ইচ্ছে হলে তুমিও তুলে দাও। এখন বলো তোমার যুদ্ধের সংবাদ। আমি বললাম, চলছে। সুনীলদা আসলে কথা বলার একটা উপলক্ষ চাইছিলেন। তারপর বলতে থাকলেন। দেখবে একদিন তোমাদের জয়

হবেই। এ তোমাদের ন্যায়যুদ্ধ। জান তো যথা ধর্ম তথা জয়। ধর্ম তোমাদের পক্ষে। একদিন আমি তোমাকে বিজয়দার কাছে নিয়ে যাব। এসব কথা তিনি আমার চাইতে আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। বিজয়দা এখন রামকৃষ্ণ মিশনে থাকেন। মনে কোরো না, তিনি ধর্মকর্ম নিয়ে ডুবে থাকেন। মোটেই সত্যি নয়। দেখবে কীরকম বিচক্ষণ মানুষ। জগৎসংসারের সব খবর রাখেন। আধুনিক ফিজিক্সের জটিল সব তত্ত্ব ক্যাট মানে বেড়ালের মতো করে বুঝিয়ে দিতে পারেন। দেখে বিশ্বাসই হবে না এই মানুষটি যৌবনে বাঘা যতীনের সঙ্গে বালেশ্বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, মানুষের মনের এই যে টেনশন তার পেছনে দুটি কারণ, একটি হল লোভ, অন্যটি অনিশ্চয়তা। মনের ভেতর থেকে এই দুবস্তুর অবসান ঘটাতে পারলে দেখবে জীবন অনেক ফলবান এবং পৃথিবী অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। সুনীলদার বক্তৃতাটি আরো দীর্ঘ হতে পারত। কাজের মেয়েটি খবর দিয়ে গেল, কে একজন তাঁকে টেলিফোনে ডাকছে। আমি বললাম, সুনীলদা আজ আমার একটু কাজ আছে সুতরাঙ চলি। আরেক দিন নাহয় আসব। তিনি জোর করলেন না।

আমার সঙ্গে অর্চনা বড় রাস্তার গোড়া পর্যন্ত এল। বলল, কোনো কথা হল না। দানিয়েল আমি খুবই দুঃখিত। বললাম, অর্চনা, দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। যা ঘটবার ঘটে যাবে, সত্যিকার অবস্থাটি ভুলে থাকতে পারলে আমি খুশি হই। কিন্তু পারি কই? অর্চনা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, এক কাজ করো। তোমার বান্ধবীর নাম এবং হাসপাতালের ওয়ার্ড নাম্বারটি লিখে দাও। কলেজ থেকে আসার পথে একবার দেখে আসব। একটা কাগজ নিয়ে আমি তায়েবার ওয়ার্ড নাম্বার লিখে দিলাম। বাইরে পা বাড়িয়ে আমার বুকের ব্যথাটি মোচড় দিয়ে উঠল। এই অবস্থার সঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে আছে। একবার দাঁতের খুব ব্যথা হয়েছিল, যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলাম। এই সময়ে দেখি পাশের বাড়িতে মারামারি লেগেছে। থামাতে গিয়ে তিন ঘণ্টার মতো প্রাণান্তকর যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিলাম। বড় রাস্তার ধারে ধারে টিউব লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। গাড়িগুলো তীব্রবেগে ছুটছে। আমি ফুটপাথ ধরে হাঁটছি। কোনোকিছুর প্রতি খেয়াল নেই। ছাড়া ছাড়া ভাবে নানা কিছু আমার মনের মধ্যে হানা দিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে তায়েবার মুখখানা ভেসে উঠল। কিছুদিনের মধ্যে সে জগৎসংসারের হিসেব চুকিয়ে নেই হয়ে যাবে। তার মায়ের কথা মনে হল। ওঁরা কি এখনো দিনাজপুরে আছেন? আমার মা, গ্রামের বাড়িঘর, আত্মীয়-পরিজন, ঢাকার বন্ধু বান্ধব কখনো কি আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে? আমার সমস্ত স্মৃতির পেছনে আপনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধটি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে আমার অস্তিত্বও যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কলকাতা শহরে যে আমি ছায়ার মতো বেড়াচ্ছি, তা যেন আমার সমগ্র সত্তার একটি প্রক্ষিপ্ত টুকরো মাত্র। সেই সংগ্রামের মূল শরীরটির সঙ্গে আমি যুক্ত হতে পারছিনে কেন? ঘুরে ঘুরে কথাগুলো মনে বেজে যেতে থাকল। কিন্তু জবাব দেবে কে?

৭

তার পরদিন সকালবেলাও আমাকে হাসপাতালে যেতে হল। তখন বোধ হয় বেলা দশটা এগারোটা হবে। তায়েবার মা, বড় ভাই, ডোরা, জাহিদুল হক এবং দোলা সবাই

তায়েবার বিছানার চারপাশে ভিড় করে আছে। দরোজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমি কেমন অন্যরকম হয়ে যাই। এই পারিবারিক সম্মেলনে আমার তো কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। স্বভাবতই আমি ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু চলে আসাটা ছিল আরো অসম্ভব। আমার দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ল তায়েবার। এই যে দানিয়েল ভাই আসুন, ইতস্তত করছেন কেন? দেখতে পাচ্ছেন না মা এবং বড় ভাইয়া এসেছেন। আমি কেবিনে ঢুকে তায়েবার মাকে সালাম করলাম। মহিলা আমার মাথায় হাত রাখলেন। সহসা মুখে কোনো কথা জোগালনা। এ মহিলাকে তায়েবার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই মা বলে ডাকে। আমিও চেষ্টা করেছি মা ডাকতে। কিন্তু বলতে পারব না, কী কারণে জিভ ঠেকে গেছে। যাহোক, তিনি জিগগেস করলেন, কেমন আছ বাবা। আমি স্মিত হেসে বললাম, ভালো। তায়েবার বড় ভাইয়া তাঁকে আমরা হেনা ভাই ডেকে থাকি, জিগগেস করলেন, দানিয়েল তোমার সব খবর ভালো তো? তারপর বললেন, চলো, একটু বাইরে যাই। কেবিন থেকে বেরিয়ে দুজনে হেঁটে গেটের কাছের মহানিম গাছটির গোড়ায় এলে হেনা ভাই বললেন, চলো এখানে শানের ওপর একটু বসি। বসার পর জিগগেস করলেন, তোমার পকেটে সিগারেট আছে? ভুলে আমি প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। নীরবে পকেট থেকে চারমিনার বের করে দিলাম। মুখের একটুখানি অপ্রিয় ভঙ্গি করে হেনা ভাই বললেন, আঃ চারমিনার খাচ্ছ। ভালো সিগারেটের প্রতি হেনা ভাইয়ের মস্ত একটা অনুরাগ আছে। মনঃক্ষুণ্ন হলেও তিনি একটা চারমিনার ধরালেন। হেনা ভাই সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছেন। সারা গায়ে পাউডার মেখেছেন। চুলটাও বোধ করি আগের দিন কেটেছেন। আমাদের জীবনকে ঘিরে এতসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো যেন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করেনি। আপাতত তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি গেন্ডারিয়ার বাড়ির খোশগল্প করার মুডে রয়েছেন। এ সময়ে তাঁর পায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন, এ বিদ্যাসাগরী চটিজোড়া গতকাল কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কিনলাম। জান তো বিদ্যাসাগরী চটির মাহাত্ম্য? 'নীল দর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেব যখন ক্ষেত্রমণিকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, বিদ্যাসাগর মশায় রাগে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে পায়ের চটিজোড়া ছুড়ে মেরেছিলেন। তার পরবর্তী দৃশ্যে গিরীশ ঘোষ যিনি নীলকর সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, চটিজোড়া মস্তকে ধারণ করে হলভর্তি দর্শকের সামনে এসে বলেছিলেন, জীবনে আমি অভিনয় করে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের চটিজোড়ার মতো এতবড় পুরস্কার কোনোদিন পাইনি এবং পাবও না। তারপর তো ড্রপসিন পড়ে গেল। হলভর্তি লোকের সে কী বিপুল করতালি। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করো।

কেবিনে এসে দেখি ভাইবোন সবাই মিলে ডোরার রবীন্দ্রসঙ্গীতের গল্প করছে। জাহিদুল তাতে আবার মাঝে মধ্যে ফোড়ন কাটছেন। উৎসাহটা মনে হচ্ছে তায়েবারই অধিক। এমন খোশগল্প করার এ আশ্চর্য প্রশান্তি এরা সকলে কেমন করে আয়ত্ত করলেন, আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই। তায়েবা জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ডোরা তার জীবনের মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটিয়ে বসে আছে। আমাদের সকলের অস্তিত্ব চিকন সুতোয় ঝুলছে। এই ধরনের অবস্থায় নির্বিকার মুখ ঢেকে এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের

আলোচনা কী করে করতে পারেন! জীবন সম্ভবত এরকমই। আঘাত যত মারাত্মক হোক, দুঃখ যত মর্মান্তিক হোক, একসময় জীবন সবকিছু মেনে নেয়। দুনিয়াতে সবচাইতে আশ্চর্য মানুষের জীবন।

তায়েবার মা তায়েবার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ভদ্রমহিলার তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে এক পোঁচ ঘন গাঢ় বিষাদের ছায়া। সকলেই কথা বলছে, তিনি বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন। শাদা কালো চুলের রাশি একপাশে হেলে পড়েছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চেহারা। যৌবনে কী সুন্দরীই না ছিলেন! মহিলার দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। চেহারায় এমন একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে, বারবার তাকাতে বাধ্য করবে। আপাতত মাধুর্যমণ্ডিত মনে হলেও গভীরে ধারালো কিছু কঠিন কিছু আত্মগোপন করে আছে। অনেক বার এই মহিলার কাছাকাছি এসেছি। কিন্তু খুব কাছে যেতে সাহস পাইনি। মহিলার প্রতি যেমন একটি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতাম, তেমনি আবার ভয়ও করতাম।

উনারা যখন উঠলেন, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা হবে। আমি কী করব স্থির করতে না পেরে উসখুস করছিলাম। তায়েবার মা বলে বসলেন, বাবা দানিয়েল, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি সসংকোচে জানতে চাইলাম, কোথায়? তিনি বললেন, ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে আমার দেওরের বাসায়। আর কেউ যাবেন না? না আর কেউ যাবে না, দোলা যাবে ক্যাম্পে। হেনা দিনাজপুরের লোকদের সঙ্গে থাকে। ডোরার কোথায় রিহার্সেল না কী আছে। তায়েবা কলকলিয়ে উঠল, যান দানিয়েল ভাই মার সঙ্গে যেয়ে চাচার সাথে পরিচয়টা করুন। আপনার অনেক লাভ হবে। আপনি তো মীর্জা গালিবের কবিতা ভালোবাসেন। চাচার সঙ্গে খাতির করতে পারলে উর্দু ভাষাটা তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারবেন। চাচাদের বাড়িতে কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে না। যান, আপনার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

আমি একটা টানা রিকশায় চেপে তায়েবার মাকে নিয়ে পথ দিলাম। যেতে যেতে তিনি আমাকে বললেন, আমার দেওরের বাসা যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে একটু সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। ওরা কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে না, এমনকি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে প্রাণের থেকে ঘৃণা করে। তথাপি আমি থাকছি, কারণ আমার অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই। ওরাও আমাকে থাকতে জায়গা দিয়েছে কারণ এই বাড়িটার অর্ধেকের দাবিদার ছিলাম আমরা। কিন্তু সেকথা আমরা কখনো উত্থাপন করিনি। ওদের জীবনের এমন একটা ধাঁচ তার সঙ্গে আমাদের একেবারেই মেলে না। আর আমাদের মধ্যে কীসব ঘটছে না-ঘটছে সে বিষয়ে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই। এই কথাগুলো বললাম, মনে রাখবে। তোমাকে ওই বাড়িটাতে অনেকবার আসতে হবে। তায়েবাদের পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে আবছা আবছা অনেক কথা শুনেছি। সেগুলো কানে নেয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিনি। শুনেছিলাম তাদের বাবার পরিবারের কেউ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলেন না। বর্ধমান তাদের স্থায়ী নিবাস হলেও হাড়ে, মাংসে অস্থি মজ্জায় তায়েবার বাবা চাচারা মনে করেন তাঁরা পশ্চিমদেশীয়। বাংলা মুলুক তাদের পীর মুরিদি ব্যবসার ঘাঁটি হলেও অত্যন্ত যত্নে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের ভেদচিহ্নগুলো ঘষেমেজে তকতকে ঝকঝকে করে

রাখেন। এ ব্যাপারে উর্দু ভাষাটা তাঁদের সাহায্য করেছে সবচাইতে বেশি। স্থানীয় মুসলিম জনগণ তাঁদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে মেনে নিয়েছে। কারণ পীর বুজুর্গরা উর্দু ভাষার মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দেবেন, কোরান কেতাবের মানে বয়ান করবেন এটা তো স্বাভাবিক। সাথে সাথে তাঁরা যদি দৈনন্দিন কাজকর্মে ঐ ভাষাটিকে ব্যবহার করেন, তাতে তো দোষের কিছু নেই, বরং স্থানীয় জনগণের চোখে তাঁদের সম্ভ্রম অনেক গুণে বেড়ে যাওয়ার কথা। এই পরিবারটিতে তায়েবার মায়ের মতো একজন মহিলার বিয়ে হওয়া সত্যিকারের বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটে যায়।

তায়েবার মা শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিবেশ থেকে। তাঁদের বাড়ি ছিল বোলপুরের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের একেবারে সন্নিকটে। তায়েবার মা বালিকা বয়সে পাঁচ ছয় বছর শান্তিনিকেতনে পড়ালেখা করেছেন। বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে এসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। নতুন বউ উর্দু ভাষায় কথা বলে না। এমনকি পারিবারিক ভাষাটি শিক্ষা করার কোনো চাড়ও নতুন বউয়ের নেই। দীর্ঘ ইতিহাস সংক্ষেপে করে বলতে গেলে, শ্বশুর-বাড়িতে স্বামী এবং দাসী চাকর ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলে না। এই অবস্থাটা অনেক দিন কেটেছে। এই সময়ে ভারতবর্ষ দুটুকরো হয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল। নতুন বউ স্বামীকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বর্ধমান এবং কলকাতার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে এসে নতুন সংসার পেতে বসেন।

নতুন সংসারে থিতু হয়ে বসার পর মহিলা তাঁর পুত্রকন্যাদের গড়ে তোলায় মনোযোগ দিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ভীতি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। দিনাজপুরে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে অনেক দিন বসবাস করার পরও সে ভীতি তাঁর পুরোপুরি কাটেনি। সমাজে বাস করতেন বটে, কিন্তু একটা দূরত্ব সব সময় রক্ষা করতেন। সে কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য সব সময় হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করতেন। তা ছাড়া বালিকা বয়সে তাঁর মনে শান্তিনিকেতনে যে সংস্কৃতির রং লেগেছিল, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও তা ফিকে হতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো এবং রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ানোর একটা অনমনীয় জেদ মহিলাকে পেয়ে বসে। এই ফাঁক দিয়ে প্রগতিশীল রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি এসব একেবারে বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তিনি নিজেও এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। মহিলার স্বামী নির্বিরোধ শান্তশিষ্ট মানুষ। সংসারের সাতে পাঁচে থাকেন না। অধিকন্তু মহিলা তাঁর ইচ্ছাশক্তির সবটুকু পরিকল্পনার পেছনে বিনা বাধায় ব্যয় করতে পেরেছিলেন।

তায়েবারা তিন বোন যখন একটু সেয়ানা হয়ে উঠল তিনি তাদের স্থায়ীভাবে ঢাকায় রেখে লেখাপড়া গানবাজনা ইত্যাদি শেখাবার একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। বিনিময় করে দিনাজপুরে যে ভূসম্পত্তিটুকু পেয়েছিলেন, তার একাংশ বিক্রি করে ঢাকা শহরে গেণ্ডারিয়ায় এই ছোট্ট বাড়িটা কিনলেন। বাড়ির পেছনের খালি জায়গাটিতে দুটি কাঠচেরাই কল বসালেন এবং ছোট্ট ছেলেটাকে তার দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। সেই সময়ে ঢাকা শহরে জাহিদুলরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার প্রসার নিয়ে আন্দোলন করছিলেন।

এই রবীন্দ্র সঙ্গীতের সূত্র ধরেই জাহিদুল এবং রাশেদা খাতুনদের সঙ্গে তায়েবাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। তায়েবার মা তো জাহিদুলদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন। এতদিন তিনি মনে মনে এমন সুরুচিসম্পন্ন কাউকে সন্ধান করছিলেন, যার ওপর তাঁর অবর্তমানে মেয়েদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করতে পারবেন। একথা মানতেই হবে যে অনেকদিন পর্যন্ত জাহিদুল এবং রাশেদা খাতুনেরা সে দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন। আমি নিজের চোখেই দেখেছি রাশেদা খাতুন আপন পেটের মেয়েটির চাইতে ডোরার প্রতি অধিক যত্নআত্তি করেছেন। আর জাহিদুল প্রতিদিন তাদের খবরাখবর নিচ্ছেন। কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস! আজ রাশেদা খাতুন আর ডোরা পরস্পরের সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন। আর জাহিদুলকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে রাশেদা খাতুন শশীভূষণকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন। এই সবকিছুর জন্য কি একটা যুদ্ধই দায়ী? দেশে যদি স্বাভাবিক জীবনযাপন করত তা হলে এই জীবনগুলো কি এমনভাবে বেঁকেচুরে যেত? কী জানি জীবন বড় আশ্চর্য জিনিস। জীবনের বিস্ময়ের অন্ত নেই।

এই মহিলা যাঁর পাশে আমি বসে আছি, যাঁর তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে চিন্তার বড় বড় গভীর বলিরেখা পড়েছে, যাঁকে দেখলে সব সময় সিংহীর কথা মনে উদয় হয়েছে, জানিনে তিনি কী ভাবছেন। তিনি সারা জীবন যে সমস্ত বস্তুকে মূল্যবান মনে করে লড়াই করে এসেছেন, সে বিশ্বাসগুলো কি এখনো তাঁর মনে কাজ করে যাচ্ছে? সমস্ত জীবন ধরে যে অপার আগ্রহ নিয়ে আকাশ দেখবেন বলে অক্লান্ত জঙ্গল কাটার কাজ করেছেন, আজ সেই নীল নির্মেঘ আকাশ থেকে তাঁর মাথায় বজ্র ঝরে পড়ল। তিনি দোষ দেবেন কাকে? দায়ী করবেন কাকে? তায়েবার মার পাশাপাশি রিকশা চেপে যাচ্ছি। আমি জানি তিনি আমার কাছে কিছু জিগগেস করবেন না, আমিও কিছু জানতে চাইব না। হঠাৎ গলায় ঘর্ঘর শব্দটি শুনতে পেলাম। ভদ্রমহিলার হাঁপানি ছিল সেটি জাগতে চাইছে। ভদ্রমহিলা প্রাণপণ শক্তিতে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বললেন, এই রিকশা বাঁয়ে রোখো। এরই মধ্যে আমরা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এসে পড়েছি। তায়েবার মা আমাকে নিয়ে একটা সেকেলে ধরনের তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়িটার গঠনশৈলী দেখে মনে হবে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে ধরনের বাড়ি হত এটি তার একটি। প্রকাণ্ড চওড়া দেয়াল। লাল ইটগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। দরোজা জানালাগুলো আকারে আয়তনে বেশ বড়সড়। কার্নিসের কাছে দুতিনটে অশ্বত্থ গাছের চারা বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। কতকাল সংস্কার হয়নি কে জানে।

তায়েবার মা আমাকে বললেন, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি ভেতরে যাই। যা বলছি মনে থাকে যেন। তোমার তো আবার অস্থির মেজাজ। একটু বুঝেশুনে কথাবার্তা বলবে। আমার তো মনে হচ্ছে এখানে আমাকে অনেক দিন থাকতে হবে। মহিলা পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। আমার মনে হল এই বাড়িতে এখনো সদর অন্দর মেনে চলা হয়।

একটু পর বুড়োমতো দাড়িঅলা এক লোক এসে বলল, আপ মেরে সাথ আইয়ে। লোকটির পেছন পেছন আমি তিনতলা দালানের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। ছাদটি অনেক উঁচু। বিরাট বিরাট লোহার বিমের ওপর বসানো রয়েছে ছাদ। দরোজা জানালায়

খুব দামি মোটা কাপড়ের পর্দা টাঙানো আছে। কিন্তু সেগুলো এত ময়লা যে দেখতে ইচ্ছে করে না। ঘরে হাল আমলের একজোড়া সোফাসেট আছে বটে। কিন্তু না থাকলেই যেন অধিক মানানসই হত। দেয়ালে মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, বাগদাদ শরিফ ও আজমির শরিফের ছবি; মোটা মোটা দামি ফ্রেমে টাঙানো। সোনালি অক্ষরে আরবিতে আল্লার নাম, মুহম্মদের নাম বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত একখানা ইসলামি ক্যালেন্ডার দেয়ালে ঝুলছে। সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হল আমি অন্য একটা জগতে এসে প্রবেশ করেছি। অবাক হয়ে সবকিছু লক্ষ করছি, এই সময়ে খুবই মোলায়েম ভঙ্গিতে সালাম দিয়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তাকিয়ে দেখলাম দোহারা চেহারার অত্যন্ত দীর্ঘকায় গৌরকান্তি এক ভদ্রলোক। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। হঠাৎ করে দেখলে বাঙালি বলে মনে হতে চায় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি বললেন, বসেন বসেন, আমি তায়েবার চাচা। আমার নাম আসগর আলী শাহ। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের মাতৃভাষা বাংলা নয়।

ভদ্রলোক বললেন, ভাবির মুখে আপনার কথা শুনেছি। আপনি কেমন আছেন, তবিয়ত ভালো তো। আমি উপস্থিত মতো কিছু একটা বলে ভদ্রতা রক্ষা করলাম। তার পরে ভদ্রলোক মৃদু হাততালি দিলেন। সেই আগের লোকটি দেখা দিল। তিনি আদেশ দিলেন, মেহমান কি লিয়ে শরবত আওর নাশতা লে আও। কিছুক্ষণ পর লোকটি একটি খাঞ্চায় করে নাশতা এবং শরবত নিয়ে এল। খাঞ্চাটি রুপোর এবং ওপরে ফুলতোলা কাপড়ের ঢাকনা দেয়া, গেলাসটি মজবুত এবং কারুকাজ করা। এই বাড়িতে সব কিছুই পুরোনো। এমনকি তায়েবার চাচা যিনি আমার বিপরীতে বসে আছেন, বসনে ভূষণে অপেক্ষাকৃত একালের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক মনে হলেও কোথায় একটা এমন কিছু আছে আমার মনে হতে থাকল ভদ্রলোকের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটা যোগ রয়েছে। ভদ্রলোক সেটা ঢেকে রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। সে যাহোক ভদ্রলোক ঢাকনা উঠিয়ে বললেন, নাশতা নিন। আমি তো দেখে অবাক। পাঁচ ছটা বিরাট বিরাট পরোটা, আবার তার সঙ্গে পেয়ালাভর্তি খাসির মাংস, হালুয়া, শরবত। এতসব খাব কী করে। পেটে জায়গা থাকতে হবে তো। তা ছাড়া আমি সকালবেলা ডা. মাইতির বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। তিনি বললেন, কিছু মুখে দিয়ে দেখেন। একেবারে না করতে নেই। আমিও বুঝতে পারলাম একেবারে না খেলে তিনি খুবই অপমানিত বোধ করবেন। এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিলাম। পরোটা মাংসের স্বাদ পেয়ে মনে হল আমি যে প্রথমে পেটে ক্ষুধা নেই মনে করেছিলাম সেটা সত্যি নয়। দেখতে দেখতে চারটা পরোটা, পেয়ালার সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললাম। সেই লোকটি আমাকে চিলুমচিতে হাত ধুইয়ে দিল। আমি চামচ দিয়ে কেটে কেটে প্লেটের সব হালুয়া খেয়ে শেষ করলাম। ভদ্রলোক একদৃষ্টে এসে আমার খাওয়া দেখতে লাগলেন। হালুয়া খাওয়া শেষ হলে ভদ্রলোক শরবতের গ্লাসটি এগিয়ে বললেন, শরবত পান করেন। আমি ঢকঢক করে শরবতটাও খেয়ে নিলাম। ভদ্রলোক আমার খাওয়ার ধরন দেখে কিছু একটা মনে করেছেন। সেটা আমি বুঝতে পারলাম। আমাকে লজ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্যই বললেন, ভাবি বলেছেন, আপনি অনেক এলেমদার মানুষ। অনেক কেতাব লিখেছেন। তা এখন আপনাদের খবর কী? যুদ্ধ কেমন চলছে? আমি একটুখানি

মুশকিলে পড়ে গেলাম। ভদ্রলোককে কী জবাব দিই। জানতে পেরেছি ভদ্রলোক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। এই ফ্রি স্কুল এলাকাটিও ভয়ংকর বিপজ্জনক স্থান। এখানকার কসাইরা ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলমানে রায়টে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এখনো ভারত পাকিস্তানে কোনো ধরনের গোলযোগ হলে এই ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে শহরের রাজপথে পাকিস্তানের সপক্ষে মিছিল বের হয়ে যায়। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সালের সেই বিখ্যাত স্লোগান : কান মে বিড়ি মুমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের রেশ এখানকার মানুষের মন থেকে একেবারে অবসিত হয়ে যায়নি। তথাপি ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করার জন্যে কিছু একটা বলতে হয়। তাই বললাম, সবটা তো আমি জানিনে। তবে এটা নিশ্চিত যে একদিন আমরা জিতব। জিতবেন তো বটে তবে আপনারা নয়, জিতবে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরা। আপনারা তো জানেন না লাখো জান কোরবান করে মুসলমানেরা পাকিস্তান কায়েম করেছে। আর আপনারা সেটা ভেঙে ফেলতে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমার হাত ধরে বললেন, একটু এদিকে আসুন। তিনি আমাকে জানালার পাশে নিয়ে গেলেন। তারপর একটা একতলা বাড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করে বললেন, ওই যে দেখছেন ওটা আবদুল ওয়াহেদের বাড়ি। আবদুল ওয়াহেদ কে ছিল জানেন? জবাবে আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। আপনি আবদুল ওয়াহেদের নাম শোনেননি? আমি আবার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি দুহাতে তালি দিলেন। সেই বুড়ো লোকটি দেখা দিলে তিনি বললেন, হান্নান সাহেবকো বোলাকে লে আও।

কিছুক্ষণ পর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে সালামালায়কুম দিলেন। ভদ্রলোক বেশ বুড়ো। চোখের ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে। শাহ আসগর আলী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও দাঁড়াতে হল। শাহ সাহেব বললেন, ইনি হান্নান সাহেব, আবদুল ওয়াহেদের চাচা। উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। তারপর প্রৌঢ় হান্নান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে জয় বাংলাকা আদমি হ্যায়। তাজ্জব কা বাত হ্যায় ইয়ে কভি আবদুল ওয়াহেদ কো নাম নেহি শুনা।

হান্নান সাহেবের সঙ্গে আমাকে বসিয়ে দিয়ে শাহ আসগর আলী সাহেব কাজের দোহাই দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। হান্নান সাহেব আমার সঙ্গে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে থাকলেন এই কলকাতা শহরে একসময়ে তাঁরা মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেতে পারতেন না। দোকানের বাইরে মুসলমানদের দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, তখনো আপনাদের জন্ম হয়নি। সেজন্য পাকিস্তান কী চিজ বুঝতে পারবেন না। আমি বিনীতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। পাকিস্তান কী বস্তু সে বিষয়ে কিছুটা কঠিন জ্ঞান আমাদের হয়েছে। পাকিস্তানিরা তিরিশ বছর আমাদের উপর শোষণ করেছে। বিগত পঁচিশে মার্চ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তারা আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। স্মৃতিভারাতুর বৃদ্ধকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করিনে কেন, তিনি তাঁর স্মৃতি স্বপ্নের জগৎ থেকে এক তিলও অগ্রসর হতে রাজি নন। ফের তিনি বলে যেতে লাগলেন, জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানের ডাক দিয়েছেন, কিছু কিছু এলেমদার মানুষ মুসলিম লীগে যোগ দিতেও আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ কলকাতা শহরে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করবার

কোনো লোক ছিল না আমার ভাইপো ওয়াহেদ মিয়া ছাড়া। ওই যে আপনাদের শেখ মুজিব। তিনিও তো আমার ভাইপোর পেছন পেছন ঘোরাফেরা করতেন। তখন টিঙটিঙে ছোকরা শেখ মুজিবকে চিনত কে? ওয়াহেদের চেষ্টার ফলেই তো তিনি অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস মুসলিম লীগের সামনের কাতারের একজন নেতা বনে গেলেন। ওই যে একতলা বাড়িটা দেখছেন, ওখানে শেখ মুজিব কতদিন কতরাত কাটিয়েছেন। ওই বাড়িতে শুধু শেখ মুজিব কেন, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দি, স্যার নাজিমুদ্দীন, আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লীগের বড় বড় নেতারা তশরিফ আনতেন। একবার তো স্বয়ং কায়িদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ অসুস্থ আবদুল ওয়াহেদকে দেখতে এসেছিলেন। আমি অনুভব করতে পারলাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাসিন্দাদের চোখে এই বাড়িটা অত্যন্ত পবিত্র। কেননা এই বাড়িতে এমন একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল যিনি পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে শ্রম, স্বপ্ন সব ব্যয় করে অকালে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি এই সমস্ত লোক এত অনুগত তথাপি তারা অন্যদের মতো পাকিস্তানে বসবাস করতে যাননি কেন? সত্যিই তো এটা একটা গভীর প্রশ্ন। আমি হান্নান সাহেবকে জিগগেস করলাম, আপনারা পাকিস্তানকে এত ভালোবাসেন, তবু বসবাস করতে পাকিস্তান যাননি কেন? এই সময়ে তায়েবার চাচা শাহ আসগর আলী ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনিও শুনলেন প্রশ্নটা। জবাবে বললেন, হ্যাঁ এটা একটা কথার মতো কথা বটে। শুরুতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, কলকাতা পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কলকাতা তো হিন্দুস্থানের অংশ হয়ে গেল। আমরা সাত পাঁচ পুরুষ ধরে এই কলকাতায় মানুষ। এর বাইরে কোথাও যেতে হবে সেকথা চিন্তাও করতে পারিনি। তা ছাড়া আমার মনে বরাবর একটা সন্দেহ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা সত্যিকারের ইসলামি আহকাম মেনে চলে একথা বিশ্বাস করতে মন চাইত না। আমার কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতে গেছেন। তাঁদের চলাফেরা দেখে মনটা দমে গিয়েছিল। দেখেশুনে আমার ধারণা হয়েছিল, তামাম হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা লড়াই করে যে পাকিস্তান কায়েম করেছে এই মানুষগুলো সেই রাষ্ট্রটিকে টিকে থাকতে দেবে না। বাংলা ভাষার নামে কোনো মুসলমান এত হল্লাচিল্লা করতে পারে, তা তো ছিল আমার ধারণার অতীত। বলুন, এসব হিন্দুদের চক্রান্ত নয়? তখন পাকিস্তান ধ্বংসের আলামত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। হিজরত করতে পারতাম। কিন্তু লাভ হত না। এখন যেমন হিন্দুস্থানে আছি তখনো হিন্দুস্থানে থাকতে হত। আপনাদের বাংলাদেশ তো আরেকটা হিন্দুস্থান হতে যাচ্ছে, সেখানে সত্যিকার মুসলমানের স্থান কোথায়? এঁদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। পাকিস্তান কী বস্তু বাস্তব অর্থে তার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা এঁদের নেই। এঁরা আছেন তাঁদের স্বপ্ন এবং স্মৃতির জগতে। যেহেতু তাঁরা মনের থেকে হিন্দুদের ঘৃণা করেন, সেজন্য তাঁদের একটা কল্পস্বর্গের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশের চিন্তাভাবনা এই একই রকম। তাঁরা ভারতে বসবাস করবেন, কিন্তু মনে মনে চাইবেন পাকিস্তানটা টিকে থাকুক। আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে তায়েবার চাচার বাড়িতে এসেছি কোনো বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য নয়। এ ব্যাপারে তায়েবার মা আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং শাহ আসগর আলী এবং হান্নান সাহেব পাকিস্তানের পক্ষে যা

বললেন, হাঁ হাঁ করে শুনে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে পালিয়ে আসি। কিন্তু পারছিলাম না তায়েবার মার কথা ভেবে। যেখানে আমার একদণ্ড অপেক্ষা করতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে সেই পরিবেশে এই মহিলা কী করে দিবস রজনী যাপন করছেন, সেকথা চিন্তা করে চুপ করে রইলাম। এই পুঁতিগন্ধময় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহিলা সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে স্বেচ্ছায় এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে অগাধ অটুট বিশ্বাস ছিল তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য ভিন্নরকমের একটা সুন্দর জীবন নির্মাণ করতে পারবেন। সামাজিক আচার সংস্কার দুপায়ে দলে যা শ্রেয় উজ্জ্বল সুন্দর বলে মনে হয়েছে সেদিকে সমস্ত কর্মশক্তিকে ধাবিত করেছেন। আজকে আবার তাঁকে সেই বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এ যেন বয়স্ক সন্তানের মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। যে অবস্থায় তিনি এই বাড়ি এই আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে গিয়েছিলেন সেই বাড়ির অবস্থা এখনও তেমনই আছে, তিল পরিমাণ পরিবর্তন হয়নি। আত্মীয়স্বজনেরা সেই স্মৃতি স্বপ্নের জগতে বসবাস করছেন। মাঝখানের তিরিশটি বছর যেন কিছু নয়। চেষ্টা করলে তিনি অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ বাড়িতে কেন উঠলেন তা আমার বোধবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। আমি বাইরের মানুষ। আমার কাছে এঁরা যেভাবে কথাবার্তা বললেন, তার মধ্যে গভীর একটা ঘৃণার রেশ রয়েছে। মহিলা কি উঠতে বসতে প্রতিনিয়ত আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছেন না? এইসব কথা ঢেউ দিয়ে মনে মনে বারবার জেগে উঠছিল। তায়েবার মা আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

অনেক কথাবার্তার পর শাহ আসগর এবং হান্নান সাহেব আমাকে রেহাই দিলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠে যাওয়ার সময় শাহসাহেব বললেন, আপনি আরাম করে বসুন। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। ভাবি সাহেবা বোধকরি আপনার সঙ্গে কী আলাপ করবেন। উনারা চলে গেলে তায়েবার মা ঘরে প্রবেশ করে আমার মাথায় হাত দিয়ে জিগগেস করলেন, কী বাবা দানিয়েল, তোমার কি খুব খারাপ লেগেছে? এঁরা এরকমই সেকথা তো তোমাকে আগে বলেছি। আশা করি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা হয়েছে। আমি ঈষৎ হাসলাম। তিনি আমার উলটোদিকে বসলেন। তারপর ঠোঁট ফাঁক করে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসিটা ভারি মলিন দেখাল। তিনি বললেন, তোমাকে বাবা ডেকে এনেছি একটু কথাবার্তা বলার জন্য। দেখছ না চারপাশে কেমন দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। কথা না বলে বলে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছি। এভাবে কিছুদিন থাকলে, আমি নিজেও অসুখে পড়ে যাব। এখন যে এখানে সেখানে অল্প-স্বল্প হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি সেটিও আর সম্ভব হবে না। আসলে মহিলা কোন কথাটির অবতারণা করতে যাচ্ছেন সেটি আমি অনুমান করতে চাইলাম। আমি জানতাম তাঁর স্বভাব বড় চাপা। খুব প্রয়োজন না হলে মনের কথা কখনো মুখে প্রকাশ করবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে চাইলেন, আমি কলকাতা এসেছি কবে এবং চট্টগ্রামে আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কোনো বিপদ হয়েছে কি না। তারপর তিনি এদিক ওদিক ভালো করে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, তায়েবার অসুখটা কী জান? আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ জানি। তিনি এ নিয়ে আর কথা

বাড়ালেন না। ডোরার খবরও কি পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ পেয়েছি। মহিলা বললেন, আমার হয়েছে কী বাবা জান চারদিক থেকে বিপদ। কাউকে কইতেও পারছিনে আবার সইতেও পারছিনে। জাহিদুলটা এমন একটা কাণ্ড ঘটাবে তা আমি কখনো বিশ্বাসই করতে পারিনি। তার সততা এবং ভালোমানুষির ওপর আমি বড় বেশি নির্ভর করেছিলাম। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন। তিনি আবার জিগগেস করলেন, হেনার খবর শুনেছ কিছু? বললাম, হেনাভাই সম্পর্কে আমি কিছু জানিনে। আজ সকালে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। জান হেনা একটা বিয়ে করে ফেলেছে। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এরই মধ্যে হেনা ভাই আবার বিয়ে করে ফেললেন? মনের ঝাঁঝ কথার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। চেপে রাখতে পারলাম না। আমার মনোভাব টের পেয়ে মহিলা হেনা ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করেই বললেন, বিয়েটা করে হেনা মানুষের পরিচয় দিয়েছে। মেয়েটির স্বামীকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। কচি মেয়ে কোথায় যাবে? তাই বিয়ে করে এখানে নিয়ে এসেছে এবং বালুহাক্কাক লেনে আলাদা বাসা করে থাকছে। আমি মনে করি হেনা আরো কিছুকাল পর বিয়েটা করলে শোভন হত। কী করব, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কি আর মা-বাবার কথার বাধ্য থাকে! আমার হয়েছে কী বাবা জান সমূহ বিপদ। কোথাও গিয়ে শান্তি পাইনে। মনে সর্বক্ষণ একটা উথালপাথাল ঝড় বইছে। দুদণ্ড স্থির হয়ে বসব সে উপায় নেই। এরই মধ্যে আবার হাঁপানির জোরটা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। আমার বড় মেয়েটি, যে ছিল আমার সব রকমের ভরসার স্থল, এখন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আমার বুকে ভীষণ ব্যথা, ভীষণ জ্বালা। কোথায় যাব, কী করব পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। ভদ্রমহিলার দুচোখ ফেটে ঝরঝর করে পানি বেরিয়ে এল। বুকটা কামারের হাপরের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মাত্র অল্পক্ষণ। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাসহকারে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে বসলেন। আশ্চর্য সংযম ভদ্রমহিলার। স্বাভাবিক কণ্ঠে নিচু স্বরে বললেন, লোকে মনে করতে পারে এই ছেলেমেয়েরা আমার গর্ভের কলঙ্ক। কিন্তু মায়ের কাছে ছেলেমেয়ে তো ছেলেমেয়েই। তারা যত ভুলই করুক আমি কিছু মনে করিনে। কথাগুলো নিজেকে না আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, বুঝতে পারলাম না।

মহিলা আমার আরো কাছে ঘেঁষে এলেন। আমার হাত দুটি ধরে বললেন, বাবা আমার একটি অনুরোধ রাখবে? আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, আগে কথা দাও রাখবে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। তোমার প্রতি তায়েবার একটা অন্ধ আকর্ষণ আছে। তুমি হাসপাতালে তাকে দেখতে এলে সে বড় খুশি হয়। তোমরাও খুব সুখে নেই জানি। তবু সময় করে যদি একটু ঘনঘন দেখতে যাও। বলো মায়ের এই অনুরোধটা রক্ষা করবে? জবাব দিতে গিয়ে আমার চোখে পানি বেরিয়ে গেল। তিনিও আমার মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেললেন। আমরা দুজনে দুজনকে বুঝতে পেরেছি। তবু আমি আমতা আমতা করে বললাম, কেউ যদি কিছু মনে করে। আমি হাসপাতালে যাই ওটা অনেকে সুনজরে দেখেন না। কারো মনে করাকরি নিয়ে বাবা কিছু আসে যায় না। আমি ও আমার মেয়ে, সেটা আমি বুঝব। আমাদের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষ করে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে হল মধ্যযুগীয় অন্ধকার গুহা থেকে মুক্তি পেলাম।

৮

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট থেকে বৌবাজারের হোস্টেলে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মধ্যেই মাদুর বিছিয়ে খাওয়াদাওয়া চলছে। খাসির মাংস, ভাত, ডাল সব দোকান থেকে আনা হয়েছে। খেতে বসেছেন নরেশদা, খুরশিদ, মাসুম, বিপ্লব এবং অপর একজন, যাঁকে আমি চিনিনে। বয়স তিরিশ টিরিশ হবে, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে উনি কোনো ক্যাম্প থেকে এসে থাকবেন। খুরশিদই পরিচয় করিয়ে দিল, ক্যাপ্টেন হাসান। মুর্শিদাবাদের লালগোলার কাছাকাছি একটি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে এসেছেন। উনারা খেতে বসেছেন, হ্যান্ডশেক করার উপায় ছিল না। একটা ব্যাপার আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি। বাংলাদেশ থেকে যত মানুষ কলকাতায় এসেছে, তাদের একটা অংশ কী করে জানিনে আমাদের এই আস্তানাটা শিগগির কি বিলম্বে চিনে ফেলেছে। আমাদের সঙ্গে কী করে জানিনে নানা জাতের নানা পেশার অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের মধ্যে গায়ক আছে, অ্যাকটর আছে, সাংবাদিক, শিল্পী, ভবঘুরে বেকার, পেশাদার লুচ্চা, বদমায়েশ, চোরছ্যাঁচড়ও আছে। সকলের একটাই পরিচয়, আমরা বাংলাদেশের মানুষ। এই সময়ের মধ্যে আমাদের আস্তানাটির কথা গোটা কলকাতা শহরে প্রচার হয়ে গেছে। আমরা সব ভাসমান কর্মহীন মানুষ। একে অপরকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করি। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে না যাবে তো কোথায় যাবে। তার পরেও খুরশিদের কৃতিত্বটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রায় প্রতিদিন নিত্যনতুন মানুষকে এই হোস্টেলে নিয়ে আসার কৃতিত্ব মুখ্যত খুরশিদের। সে বাইরে বড় গলা করে নিজেকে আওয়ামী লীগের লোক বলে ঘোষণা করে। পেছনে অবশ্য কারণও আছে। আওয়ামী লীগের ছোট বড় মাঝারি নেতাদের অনেককেই খুরশিদ চেনে এবং তাঁরাও খুরশিদকে চেনেন। পারতপক্ষে তাকে তাঁরা এড়িয়েও চলেন। তাই কার্যত খুরশিদ আমাদের ডেরায় এসে তার আওয়ামী লীগত্ব জাহির করে। আজকের ক্যাপ্টেন হাসান ভদ্রলোককেও নিশ্চয়ই খুরশিদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এতসব খাবারদাবারের আয়োজন পয়সাটা এসেছে কোত্থেকে। নির্ঘাত টাকাটা ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে গেছে এবং এতে খুরশিদের শিল্পকলার সামান্য অবদান থাকা বিচিত্র নয়।

নরেশদা বললেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে তুইও বসে যা। যা খাবার আছে, তাতে আরো দুজনের হয়ে যাবে। আমি মুখহাত ধুয়ে এসে খেতে বসে গেলাম। আজ খুরশিদের মেজাজটি ভয়ঙ্কর রকম উষ্ণ হয়ে আছে। এমনিতেও উত্তেজনা ছাড়া খুরশিদের জীবনধারণ একরকম অসম্ভব। একটা না একটা ঝগড়া বিবাদের বিষয়বস্তু খুঁজে আবিষ্কার করতে তার কোনো জুড়ি নেই। আজকে তার অসন্তোষটা অন্যান্য দিনের চাইতে পরিমাণে অনেক অধিক। আমি তাই কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করলাম, খুরশিদ আজ তোমার আলোচ্য বিষয়সূচি কী? নরেশদা জবাব দিলেন, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ। মুশতাকের মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষও তোমার আলোচনার বিষয় হতে পারে, এ তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি। হলই বা ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ মন্ত্রী। আমি তো তোমাকে আরো ওপরের তরিকার মানুষ বলে মনে করতাম।

আমার কথায় খুরশিদের মেজাজের কোনো পরিবর্তন হল না। সে প্রায় ধমক দেয়ার সুরে বলল, আরে মশায় শুনবেন তো শালার ব্যাটা শালা, নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কী কাণ্ডটা করে বসে আছে। এইখানে এই কলকাতায় বসে বসে বেটা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে এতকাল যোগাযোগ করে আসছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে ভান করে মুক্তিসংগ্রামকে পেছন থেকে ছুরিকাহত করাই ছিল তার প্ল্যান। তলায় তলায় আমেরিকার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছিল। শালা, মেনি বিড়াল কোথাকার। ফন্দি টন্দি এঁটে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার নাম করে ভারত থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ঝুলির ভেতর থেকে সবগুলো বেড়াল বের করবে এটাই ছিল তার ইচ্ছা। মাঝখানে ভারতের ইনটিলিজেন্স তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা উদ্ঘাটন করে ফেলেছে। তাজুদ্দিন তার নিউইয়র্কে যাওয়া আটকে দিয়েছেন। তাজুদ্দীনকে যতই অপবাদ দিক আসলে কিন্তু মানুষটা খাঁটি। দেশের প্রতি টান আছে।

ক্যাপ্টেন হাসান হাত ধুয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, তাজুদ্দীন বলুন, মুশতাক বলুন থিয়েটার রোডে যারা বসে তারা সকলে একইরকম। নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, সর্বক্ষণ একজন আরেকজনকে ল্যাং মারার তালে আছে। দেখেছেন একেক জনের চেহারার কেমন খোলতাই হয়েছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, আমোদ ফুর্তি করছে। সবাই তোফা আরামে আছে। যুদ্ধটা কী করে চলছে সেদিকে কারো কি কোনো খেয়াল আছে? কেউ কি কখনো একবার গিয়ে দেখেছে ক্যাম্পগুলোর কী অবস্থা? সাহেব, আমরা যে অবস্থায় এখন থাকছি, বনের পশুও সে অবস্থায় পড়লে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। আমাদেরকে বলা হয়েছে যুদ্ধ করো। কিন্তু কী দিয়ে যুদ্ধ করবে আমাদের ছেলেরা? শুধু হ্যান্ডগ্রেনেড দিয়ে কি পাকিস্তানি সৈন্যের দূরপাল্লার কামানের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়? আমরা প্ল্যান করি ভারতীয়রা সে প্ল্যান নাকচ করে। নালিশ করে প্রতিকারের কথা দূরে থাকুক, কোনো উত্তর পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আমরা ছেলেদের সব জেনেশুনে প্রতিদিন আত্মহত্যা করতে পাঠাচ্ছি। একেকটা সামান্য অস্ত্র জোগাড় করতেও প্রতিদিন কত দুয়ারে ধন্না দিতে হয়। মাঝে মাঝে ভয়ংকর দুঃখ হয়, এত কষ্ট করে আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে কেন মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে এখানে এলাম। ক্যাম্পে থাকলে তবু ভালো থাকি। ছেলেদের সঙ্গে একরকম দিন কেটে যায়। কিন্তু কলকাতা এলে মাথায় খুন চেপে বসে। ইচ্ছে জাগে এই ফর্সা কাপড় পরা তথাকথিত নেতাদের সবকটাকে গুলি করে হত্যা করি। এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। একদিন আমরা দেশে ফিরে যাব। তখন এই সবকটা বানচোতকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মারব। দেখি কোন বাপ সেদিন তাদের উদ্ধার করে। কলকাতায় নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পোলাও কোর্মা খাওয়ার মজা ভালো করে দেখিয়ে দেব। ক্যাপ্টেন হাসান চেয়ারের হাতলে তোয়ালেখানা রেখে পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন এবং নরেশদাকে একটা দিলেন।

থিয়েটার রোডের লোকদের বিরুদ্ধে এসব নালিশ নতুন নয়। সবাই নালিশ করে। কিন্তু তাদের করবার ক্ষমতা কতদূর তা নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তাভাবনা করে বলে মনে হয় না। আমি মনে মনে তাজুদ্দীনের তারিফ করি। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আমার বিশ্বাস সবদিক চিন্তা করে দেখার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তিনি কতদূর কী করবেন।

আওয়ামী লীগারদের মধ্যে অনেকগুলো উপদল। ভারত সরকার সবকটা উপদলকে হাতে রাখার চেষ্টা করছে। আবার তাদের অনেকেই তাজুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। পাকিস্তানি এবং আমেরিকান গুপ্তচরেরা এখানে ওখানে ফাঁদ পেতে রেখেছে। তাদের খপ্পরে আওয়ামী লীগারদের একটা অংশ যে পড়ছে না, একথাও সত্যি নয়। এই প্রবাসে অন্য একটি সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। ভারত সরকারের মর্জি মেজাজ যেমন মেনে চলতে হয়, তেমনি অজস্র উপদলীয় কোন্দলের মধ্যে একটা সমঝোতাও রক্ষা করতে হয়। ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদের আবার একেজনের একেক মত। কেউ মনে করেন এদলকে হাতে রাখলে ভালো হবো। আবার আরেকজন মনে করেন, আখেরে এই উপদলের টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। সুতরাং অন্য দলটিকে ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা দিলে উপকার হবে। দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত অবস্থায় সবকটি উপদলই মনে করছে তারাই প্রকৃত ক্ষমতার দাবিদার। কোনো নেতা ক্ষমতা দাবি করছেন, কেননা তিনি শেখ মুজিবের আত্মীয়। আরেক নেতা ক্ষমতা দাবি করছেন, কারণ তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়স্বজনদের দুচোখে দেখতে পারেন না। হয়তো আরেক নেতা মনে মনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করেন বলেই ক্ষমতা অধিকার করতে চান। ধৈর্য ধরে সবকিছু দেখে যাওয়া ছাড়া তাজুদ্দীনের করবার কী আছে?

সবাই মুখহাত ধুয়ে বসে বসে পান চিবুচ্ছি। এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে মাসুম ঘরে প্রবেশ করে বলল, নরেশদা, দানিয়েল ভাই শিগগির চলুন, রেজোয়ান আত্মহত্যা করেছে। মাসুমের মুখে সংবাদটি শুনে আমরা সকলেই অভিভূত হয়ে গেলাম। দুচারদিন আগেও আমাদের আড্ডায় এসেছিল, ফর্সাপানা, সুন্দর চেহারার লিকলিকে ছেলেটি। নিজে সর্বক্ষণ হাসত এবং সর্বক্ষণ অপরকে হাসাত। সব সময়ে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নবদ্বীপ হালদারের কমিক মুখস্থ বলত। এই যুদ্ধ, দেশত্যাগ, খুন জখম, বীভৎসতা কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, মানুষ এত হাসে কেমন করে? স্বীকার করতে আপত্তি নেই রেজোয়ানের প্রতি মনের কোণে একটুখানি বিদ্বেষ পুষে রাখতাম।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটি কেটে গেলে মাসুমের মুখে রেজোয়ানের আত্মহত্যার কারণটা জানতে পারলাম। কিছুদিন আগে রেজোয়ানদের আড্ডায় কুমিল্লা থেকে মজিদ বলে আরেকটি ছেলে আসে। রেজোয়ানরা থাকত রিপন স্ট্রিটে। মজিদ আর রেজোয়ান দুজনেই কুমিল্লার কান্দিরপাড় এলাকার একই পাড়ার ছেলে। মজিদ কলকাতা এসে সকলের কাছে রটিয়ে দেয় যে রেজোয়ানের যে বোনটি উম্যান্স কলেজের প্রিন্সিপাল সে একজন পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করে ফেলেছে। এই সংবাদটা পাওয়ার পর রেজোয়ান দুদিন ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে একদম কথাবার্তা বলেনি। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। অবশেষে রাত্রিবেলা ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সকালে সে বিছানা ছেড়ে উঠছে না দেখে রুমের অন্যান্যরা ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে দেখে মরে শক্ত হয়ে গিয়েছে। আর মুখের লালা পড়ে বালিশ ভিজে গেছে। তার মাথার কাছে পাওয়া গেল একটি চিরকুট। তাতে লিখে

রেখেছে, বড় আপা যাকে আমি বিশ্বাস করতাম সবচাইতে বেশি, সে একজন পাকিস্তানি মেজরের স্ত্রী হিসেবে, তার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমোচ্ছে একথা আমি চিন্তা করতে পারিনে। দেশে থাকলে বড় আপা এবং মেজরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতাম। এখন আমি ভারতে। সুতরাং সে উপায় নেই। অথচ প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার রক্ত এত পাগল হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত নিজেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিই। যার আপন মায়ের পেটের বোন দেশের চরমতম দুর্দিনে, দেশের শত্রুকে বিয়ে করে তার সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করতে পারে, তেমন ভাইয়ের বেঁচে থেকে লাভ কী? কী করে আমি দেশের মানুষের সামনে কলঙ্কিত কালো মুখ দেখাব। আমার মতো হতভাগ্যের বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। সকলকে কষ্ট দিতে হল বলে আমি দুঃখিত এবং সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ইতি রেজোয়ান।

শুনেই আমি, নরেশদা এবং খুরশিদ রিপন স্ট্রিটে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে শুনি রেজোয়ানের লাশ থানায় নিয়ে গেছে। অগত্যা থানায় যেতে হল। ময়না তদন্ত ছাড়া লাশ বের করে আনতে কম হ্যাঙ্গাম হুজ্জুত পোহাতে হল না। এতে সমস্যার শেষ নয়। তার পরেও আছে কবর দেয়ার প্রশ্নটি। আমরা কলকাতা শহরে সবাই ভাসমান মানুষ। মৃত ব্যক্তিকে এখানে কোথায় কবর দিতে হয়, কী করে কবর দিতে হয়, এসব হাজারটা কায়দা কানুনের কিছুই আমরা জানিনে। তা ছাড়া আমাদের সকলের পকেট একেবারে শূন্য। টাকা থাকলে বুকে একটা জোর থাকে। সেটাও আমাদের নেই। কী করি। আমাদের একজন ছুটল কাকাবাবু মুজফফর আহমদের কাছে। তিনি নিজে অসুস্থ মানুষ। তাঁকে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। তিনি একসময়ে বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন, এই দাবিতে আমরা সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পেতেছি। তিনি সাধ্যমতো আমাদের দাবি পূরণ করেছেন। এইরকম একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিব্রত করা ঠিক হবে কি না এ নিয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। তবু তাঁর কাছে যেতে হল। তিনি তাঁর পার্টির একজন মানুষকে বলে গোবরা কবরস্থানে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পরেও আমাদের টাকার প্রয়োজন। লাশকে গোসল দিতে হবে, কাফন কিনতে হবে, কবর খুঁড়তে হবে, কবরস্থানে নিয়ে যেতে হবে, জানাজা পড়াতে হবে—এসবের প্রত্যেকটির জন্য টাকার প্রয়োজন। টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। আমাদের আরেকজন ছুটল প্রিন্সেপ স্ট্রিটে অধ্যাপক ইউসুফ আলির কাছে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তা হলেও আমাদের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে। ইচ্ছে করলে তিনি টাকাটা ম্যানেজ করে দিতে পারেন। আমাদের অনুমানই সত্য হল। ইউসুফ সাহেব কাফন-দাফনের টাকাটা ব্যবস্থা করলেন। ক্ষেত্রবিশেষে জীবিত মানুষের চাইতে মৃত মানুষের দাবি অধিক শক্তিশালী।

রেজোয়ানকে গোসল ইত্যাদি করিয়ে কবর দিতে দিতে সন্ধে হয়ে গেল। আমার ধারণা হয়েছিল মৃত্যু আর আমাকে বিচলিত করে না। পঁচিশে মার্চের পর থেকে ভারতে আসার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু তো কম দেখিনি। আমি নীলক্ষেত দেখেছি, রাজারবাগ দেখেছি, শাঁখারি বাজার দেখেছি। আমার নিজের কানের পাশ দিয়েও পাকিস্তানি সৈন্যের রাইফেলের গুলি হিস হিস করে চলে গেছে। কিন্তু রেজোয়ানের মৃত্যুটি একেবারে অন্যরকম। আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে গেছে। যার বোন

পাকিস্তানি মেজরকে বিয়ে করেছে, তাকে হত্যা করতে হয়। যদি হত্যা করা সম্ভব না হয় তা হলে নিজেকেই হত্যা করতে হয়। সেদিন আমাদের সকলের হৃদয় এমন গভীর বিষাদে ভারাক্রান্ত ছিল যে কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারিনি।

রেজোয়ানকে কবর দিয়ে সকলে চলে এল। আমার সকলের সঙ্গে ফিরতে ইচ্ছে হল না। নরেশদা বললেন, কী রে দানিয়েল যাবিনে। আমি বললাম, আপনারা যান আমি পরে আসছি। সকলের অন্তঃকরণ গভীর ভাবাবেগে পরিপূর্ণ। কেউ কাউকে টেনে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা ছিল না। আমি রেজোয়ানের কাঁচা কবরের কাছে ছাতাধরা একটি পাথরের বেঞ্চির ওপর বসে রইলাম। চারপাশে সার সার কবর। গোবরা কবরস্থানে চারদিক থেকে চরাচরপ্লাবী অন্ধকার নেমে আসছে। হাজার হাজার মৃত মানুষ ঘুমিয়ে আছে। আমি একা হাতের ওপর মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছি। কেবল কেয়ারটেকারের কুকুরটি অদূরে দুপায়ের ওপর বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। বোধ করি ভাবছে কবরস্থানে এই ভর সন্ধ্যায় জীবিত মানুষ কেন?

মানুষের জীবন-মৃত্যু এসব ছায়াবাজির খেলা বলে মনে হল। নিজের অস্তিত্বটাও অর্থহীন প্রতীয়মান হল। আকাশে ছায়াপথে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে। এই অনাদি অসীম বিশাল বিপুল ব্রহ্মাণ্ড, তার মধ্যে মানুষ এবং মানুষের পৃথিবীর গুরুত্ব কতটুকু। আমার আগে পৃথিবীতে কত মানুষ এসেছে, তারা কত কী কাজ করেছে, চিন্তা করেছে, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, তারপরে সকলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব-বিবাদ ওই সুদূরের তারকারাজি অনাদিকাল থেকে সবকিছু মুগ্ধ চোখে দেখে আসছে। আমি যেন মৃত মানুষদের চুপিচুপি সংলাপ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাদের অভিশপ্ত কামনা বাসনার ঢেউ যেন আমার বুকে এসে আছড়ে পড়ছে। কেবল রেজোয়ানের কাঁচা কবরটির অস্তিত্ব কাঁটার মতো যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ছেলেটা দুদিন আগেও আমাদের সঙ্গে হাঁটাচলা করেছে। অবিশ্রাম হেসেছে, অপরকে হাসিয়েছে। এত সকালে তার মরার কথা নয়। বাংলাদেশের যুদ্ধটা না লাগলে হয়তো ছেলেটাকে এমন অকালে মরতে হত না। আমার মগজের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বদলে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধটা চক্কর দিতে লাগল। বড় ভাগ্যহীন এই বাঙালি মুসলমান জাতটা। আবহমানকাল থেকে তারা ভয়ংকরভাবে নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সেই হিন্দু আমল, বৌদ্ধ আমল, এমনকি মুসলিম আমলেও তারা ছিল একেবারে ইতিহাসের তলায়। এই সংখ্যাগুরু মানবমণ্ডলী কখনো প্রাণশক্তির তোড়ে সামনের দিকের নির্মোক ফাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। যুগের পর যুগ গেছে, তাদের বুকের ওপর দিয়ে ইতিহাসের চাকা ঘরঘর শব্দ তুলে চলে গেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। রেজোয়ান ছেলেটা যে অকালে মারা পড়ল তার মধ্যে ইতিহাসের দায়শোধের একটা ব্যাপার যেন আছে।

বাঙালি মুসলমানেরাই প্রথম পাকিস্তান চেয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, সীমান্ত প্রদেশ কোথায় লোকে পাকিস্তানের কথা বলত। জিন্নাহ সাহেব বাংলার সমর্থন এবং আবেগের ওপর নির্ভর করেই তো অপর প্রদেশগুলোকে নিজের কব্জায় এনেছিলেন। যে বাঙালি মুসলমানদের অকুণ্ঠ আত্মদানে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, সেই পাকিস্তানই তিরিশ বছর বুকের ওপর বসে তাদের ধর্ষণ করেছে। একটা জাতি এতবড় একটা ভুল করতে পারে? কোথায় জানি একটা গড়বড়, একটা গোঁজামিল

আছে। আমরা সকলে সেই গোঁজামিলটাই ব্যক্তিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অদ্যাবধি বহন করে চলেছি। পাকিস্তানের গণপরিষদে তো পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাভাষার দাবিটি তো তাঁরা সমর্থন করতে পারতেন। হলেনই বা মুসলিম লীগার। তবু তাঁরা কি এদেশের মানুষ ছিলেন না? তাঁদের সাতপুরুষ বাংলার জলহাওয়াতে জীবনধারণ করেননি। তবু কেন, বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের ছাত্র তরুণদের প্রাণ দিতে হল? পূর্বপুরুষদের ভুল এবং ইতিহাসের তামাদি শোধ করার জন্য কি এই জাতিটির জন্ম হয়েছে?

উনিশশো আটচল্লিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত এই জাতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে আমাদের সবাইকে দেশ ও গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে। আমাদের হাতে সময় ছিল, সুযোগ ছিল। কোলাহল আর চিৎকার করেই আমরা সে সুযোগ এবং সময়ের অপব্যবহার করেছি। পাকিস্তানের কর্তাদের আমরা আমাদের বোকা বানাতে সুযোগ দিয়েছি। তারা সৈন্য এনে ক্যান্টনমেন্টগুলো ভরিয়ে ফেলেছে এবং সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমরা আমাদের যুদ্ধটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে ভারতে চলে এসেছি। হয়তো যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, তারপর কী হবে? আমাদের যুদ্ধটা ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মন বলছে পাকিস্তান হারবে, হারতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কী পাব? ইতিহাসের যে গোঁজামিল আমরা বংশ-পরম্পরা রক্তধারার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছি তার কি কোনো সমাধান হবে? কে জানে কী আছে ভবিষ্যতে।

ঢেউ দিয়ে একটা চিন্তা মনে জাগল। যা-ই ঘটুক না কেন আমার বাঙালি হওয়া ছাড়া উপায় কী? আর কী আমি হতে পারি? দুনিয়ায় কোন জাতিটি আমাকে গ্রহণ করবে। গোরস্থানের কেয়ারটেকার এসে বলল দশটা বেজে গেছে। এখখুনি গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আমাকেও চলে আসতে হল।

তার পরের দিন আমার পক্ষে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পয়সার ধান্ধায় কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছুটে বেড়াতে হয়েছে। তা ছাড়া একসঙ্গে আমরা অনেক মানুষ থাকি। যৌথ জীবনযাপনের নানা সমস্যা তো আছেই। আমাদের কাজ নেই, কর্ম নেই তবু জীবন প্রতিনিয়ত সমস্যার সৃষ্টি করে যায়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বচসা, অভিমান এসব তো লেগেই আছে। সেসবের ফিরিস্তি দিয়ে বিশেষ লাভ হবে না।

রোববার দিনটিতে আমি সন্ধের একটু আগেই হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখি জমজমাট ব্যাপার। ডোরা এসেছে, দোলা এসেছে। তায়েবার মাও এসেছেন। আর তায়েবা বালিশ হেলান দিয়ে বসে অর্চনার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। আজকে তায়েবাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। চমৎকার একটা ধোয়া দাদা শাড়ি পরেছে। খোঁপায় বেলি ফুলের মালা জড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল গেভারিয়ার বাড়িতে আনন্দঘন সময় কাটাচ্ছে। আমাকে প্রথম দেখতে পেল অর্চনা। সে কলকল করে উঠল, এই যে দানিয়েল, কাল থেকে টিকিটিরও দেখা নেই কেন। আমি হেসে বললাম, আটকে গিয়েছিলাম। তায়েবাদি হাসপাতালে, আর তুমি গা ঢাকা দিয়ে আছ। আমি জিগগেস করলাম, অর্চনা তুমি কালও এসেছিলে নাকি? অর্চনাদি কালও এসেছিলেন এবং অর্ধেক

দিন আমার সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন। আজকে আমার জন্য বেলি ফুলের মালা নিয়ে এসেছেন। খোঁপা থেকে মালাটা খুলে হাতে নিয়ে দেখাল। কী ভালো অর্চনাদি! তার সঙ্গে কথা বললে মনটা একেবারে হালকা হয়ে যায়। অর্চনা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, বাজে বোকো না তায়েবাদি, তোমার মতো এত প্রাণখোলা মেয়ে এতদিন হাসপাতালে পড়ে আছ এখবর আমি আগে পাইনি কেন? দু মহিলার এই পারস্পরিক প্রস্তুতি বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল। তায়েবার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, বাবা দানিয়েল, কাল কি তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছিল। তোমাকে খুব দুর্বল এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, না আমি সুস্থই ছিলাম। তা হলে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন। মা তুমি যেন একটা কী! মনে করতে চেষ্টা করো, তাকে কখন তুমি সুস্থ মানুষের মতো দেখেছিলে। সব সময় তো একই রকম দেখে আসছি। গোসল করবে না, জামাকাপড় পরিষ্কার রাখবে না, দাড়ি কাটবে না আর এমন একটা মেকআপ করে থাকবেন, দেখলে মনে হবে রোগী অথবা সাত জন, পাঁচ জনে ধরে কিলিয়েছে। কথা বলা অবান্তর। এই নালিশটি তায়েবা আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই করে আসছে। তায়েবার কথা শুনে ডোরা খিলখিল করে হেসে উঠল। ডোরার এই হাসিটিও আমার পরিচিত। গেভারিয়ার বাসায় তায়েবা অপরিচ্ছন্ন থাকার অনুযোগ করলেই ডোরা এমন করে হেসে উঠত। আশ্চর্য ডোরা আজও তেমন করে নির্মলভাবে হাসতে পারে? নানা অঘটন ঘটে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে, সকলে ঠিক আগের মতোই আছে। কিন্তু আমি একা বদলে যাচ্ছি কেন? বোধ করি মানুষের ভালো মন্দ সবকিছুর বিচারক সেজে বসি বলেই আমার এ দুরবস্থা। মানুষের কৃতকর্মের বিচারক সেজে বসার আমার কী অধিকার? তায়েবার মা কথা বললেন, কী বাবা হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? ডোরা ফোড়ন কেটে বলল, একটুখানি গম্ভীর না দেখালে লোকে ইন্টেলেকচুয়াল বলবে কী করে? কথাটা তায়েবার, ডোরা ধার করে বলল। কলকাতা এসে দেখেছি ডোরার মুখ খুলে গেছে। সে কায়দা করে কথা বলতে শিখে গেছে। এবার দোলা মুখ খুলল। বেচারিকে তোমরা খেপাচ্ছ কেন? আসলে দানিয়েল ভাই খুব সরল সহজ ভালো মানুষ। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নাক সিধে চলেন, ডানে বামে তাকান না। তাঁর দোষ ঐ একটাই, তিনি রসিকতা বোঝেন না। আজকে হাসপাতালে এসে আমার একটা ভিন্নরকম ধারণা হল। এতদিন মনে করে এসেছি এরা তায়েবার এই ভয়ংকর অসুখটিকে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে সবাই নিজের নিজের তালে আছে। আজকে মনে হল, সবাই তায়েবাকে তার মারাত্মক অসুখটির কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যই এমন হাসিখুশি এমন খোশগল্প করে। মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ ঘনিয়ে উঠল। আমিই তো প্রথম থেকে তায়েবাকে তার একান্ত ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত করে আসছি। হাবে ভাবে আচার আচরণে তায়েবাকে তার ভাইবোন আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা করে ফেলার একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ক্রমাগত দেখিয়ে এসেছি। এটা কেমন করে ঘটল? তায়েবার ওপর আমার কী দাবি? যদি বলি তায়েবাকে আমি প্রাণের গভীর থেকে ভালোবাসি। তা হলে ভালোবাসার এমন উদ্ভট দাবি কেমন করে হতে পারে যে আমি তাকে তার ডাল মূল থেকে আলাদা করতে চাইব। আমি নিশ্চিত জানি সে মারা যাবেই। প্রতিদিন একটু একটু করে তার জীবন-

প্রদীপের তেল শুকিয়ে আসছে। তথাপি আমার মনের অনুক্ত আকাঙ্ক্ষা এই মৃত্যুপথযাত্রী তায়েবার সবটুকুকে আমি অধিকার করে ফেলব। পারলে, তার স্মৃতি থেকেও নিকটজনের নাম-নিশানা মুছে ফেলব। নিজের মনের ভেতর জমাটবাঁধা একটা ঈর্ষার পিণ্ড যেন দুলে উঠল। এই প্রথম অনুভব করলাম, আমি একটা পশু, একটা দানব। যা পেতে চাই সবকিছু ভেঙেচুরে ছত্রখান করে গুঁড়িয়ে পেতে চাই। অথচ মনে মনে একটা ভালোমানুষির আত্মপ্রসাদ অনুভব করে দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে আসামি বানিয়ে বিচারক সেজে বসে আছি। এই সন্ধের হাসপাতালে আমার মনের এই কুৎসিত দিকটির পরিচয় পেয়ে ক্রমশ নিজের মধ্যেই কুঁকড়ে যেতে থাকলাম। স্বাভাবিকভাবে কোনো কথাবার্তা বলতে পারছিলাম না।

হাসপাতালের শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তায়েবাদি আজ আসি। শিগগির আবার আসব। সে ব্যাগটা কাঁধে দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলল, শোনো দানিয়েল, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। থাক ভালোই হল, কথাটা মনে পড়ল। পারলে এরই মধ্যে একবার সময় করে আমাদের বাড়িতে আসবে একটা জরুরি ব্যাপার আছে। জরুরি ব্যাপারের কথা শুনে আমি অর্চনার পিছুপিছু করিডোর পর্যন্ত এলাম। জানতে চাইলাম, আসলে ব্যাপারটা কী? অর্চনা বলল, জান আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদা এসেছেন ফ্রান্স থেকে। তিনি একসময়ে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নেতাজি সুভাষ বোসের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা অনেকদিন তাঁর কোনো সংবাদ পাইনি। অনেক বছর পরে জানতে পারলাম, তিনি ফ্রান্সে চলে গিয়েছেন এবং এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেছেন। আমরা তো তাঁর কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তো তাঁকে কোনোদিন চোখেও দেখিনি। হঠাৎ করে গত সপ্তাহে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাড়ির লোকজন কলিযুগেও এমন আশ্চর্য কাণ্ড ঘটতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। তিনি সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ পাঠ করে আর টেলিভিশন রিপোর্ট দেখে সোজা কলকাতা চলে এসেছেন। একেই বলে বিপ্লবী। তিনি এখন আমাদের বাড়িতেই আছেন। তুমি একদিন আসবে। তোমার সঙ্গে কথা বললে দাদা ভীষণ খুশি হবেন। অর্চনা চলে গেল।

অর্চনাকে বিদায় করে তায়েবার কেবিনে ঢুকে দেখি জাহিদুল এবং হেনাভাই দুজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে পারলাম। আমি নিজের ভেতরে সহজ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি বলেই যেন চারপাশের জগৎটা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। দোলা, ডোরা এবং তায়েবার মা উনারাও উঠে দাঁড়ালেন। দোলাকে যেতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে দমদম তার ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। ডোরা, জাহিদুলের সঙ্গে কোন বাড়িতে গান গাইতে যাবে। আর মাকে হেনাভাই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রেখে তারপর নিজের ডেরায় চলে যাবেন। আমি নিজে খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। সকলে গেল, অথচ আমি রয়ে গেলাম। ভাবলাম, চলেই যাই। কিন্তু তায়েবাকে বলা হয়নি। কথাটা কীভাবে তাকে বলব, চিন্তা করছিলাম। কেবিনে আর কেউ নেই। উৎপলাকে বোধ হয় অন্য কোথাও শিফট করা হয়েছে। মাঝখানে শুনছিলাম, তার অসুখটির খুব বাড়াবাড়ি চলছে। জিগগেস করতে ইচ্ছে

হয়নি। পাছে একটা খারাপ জবাব শুনি। তায়েবাই নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলল। আচ্ছা দানিয়েল ভাই, একটা কথা জিগগেস করি। আমি বললাম, বলো। আপনি এত অপরিষ্কার থাকেন কেন? এটা বহু পুরোনো কথা। সুতরাং জবাব দিলাম না। সে বলল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুন ঝাঁটার শলার মতো দাড়িগুলো কীরকম খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। এভাবে গালভর্তি বিশ্রী দাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে আপনার লজ্জা লাগে না। চুপ করে রইলাম। আজকাল ওর কথার পিঠে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। কী, চুপ করে রইলেন যে, কথা বলছেন না কেন। তার কথার মধ্যে দিয়ে ঝাঁঝ বেরিয়ে এল। অগত্যা আমি বললাম, তায়েবা, লজ্জাবোধ সকলের সমান নয়।

সে বিছানা থেকে সটান সোজা হয়ে বসল। আমার চোখে সরাসরি চোখ রেখে বলল, আপনি আমাকে খুব সোজা মেয়ে পেয়েছেন তাই না, সব সময় যাচ্ছে তাই ব্যবহার করেন। অর্চনাদির মতো কোনো শক্ত মহিলার পাল্লায় পড়লে দুদিনে আপনার মাথার ভূত ঝেঁটিয়ে একেবারে সিধে করে দিত। আমি আর কদিন। আল্লার কাছে মুনাজাত করি অর্চনাদির মতো কোনো শক্ত মহিলার সঙ্গে যেন সারাজীবন আপনাকে ঘর করে কাটাতে হয়। তায়েবা ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু আমি সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। সে অর্চনাকে নিয়ে কী অন্যরকম একটা ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছে? আমি বললাম, এর মধ্যে অর্চনার কথা আসবে কেন? তার সঙ্গে আগে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় তো এই কদিনের। তায়েবা বলল, অর্চনাদির কথা বললে আপনি অত আঁতকে ওঠেন কেন? তার কথা আমি বারবার বলব। একশো বার বলব। অত্যন্ত ভালো মেয়ে। আমার ভীষণ মনে ধরেছে।

আমি উসখুস করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ হয়েছে, শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। তার পরেও হাসপাতালে যদি থাকি, কেউ কিছু বলতে পারে। এখানকার নিয়ম-কানুন বড় কড়া। কী কারণে বলতে পারব না, আমি চলে আসতে চাই, একথাটা তায়েবাকে বলতে পারছিলাম না। কোথায় একটা সংকোচ বোধ করছিলাম। এই দোদুল্যমানতা কাটাবার জন্য একটা চারমিনার ধরাব স্থির করলাম। কেবিনের বাইরে পা দিতেই তায়েবা অনুচ্চস্বরে বলল, কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, একটা সিগারেট খেয়ে আসতে যাচ্ছি। বাইরে যেতে হবে না। এখানে ওই উৎপলার বেডে বসে খান। আমি ইতস্তত করছিলাম। তায়েবা বলল, আপনার ভয় নেই। মনের সুখে সিগারেট খেতে পারেন। ডা. ভট্টাচার্য আজ কলকাতার বাইরে গেছেন। থাকার মধ্যে আছেন মাইতিদা, তাঁকে আমি সামাল দেব। আমি সত্যি সত্যি উৎপলার বেডে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। সে বলল, বুঝলেন দানিয়েল ভাই, তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না, আজকে আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে কাটাব। হোস্টেলে এক ভদ্রলোককে নয়টার সময় আসতে বলেছি। তার সঙ্গে আমার টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার আছে। এসে যদি ভদ্রলোক ফেরত যান, আবার কবে দেখা হয় বলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনটা আমার। আমারই প্রয়োজনে ভদ্রলোককে আমি অনুরোধ করেছি আসতে। তাই মনে মনে একটুখানি দমে গেলাম। তায়েবা সেটা বুঝতে পারল। কী, আপনার সঙ্গে গল্প করতে চাই সেটি বুঝি পছন্দ হল না। পছন্দ না হয় তো চলে যান। আমি আপনাকে আটকে রাখিনি। আমি তো অর্চনাদি নই যে জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি।

আমি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে টুলটা টেনে তার বিছানার পাশে এসে বসলাম। বললাম, ঠিক আছে গল্প করো আমি আছি। কতক্ষণ থাকবেন? আমি বললাম, যতক্ষণ গল্প কর। আমি সারারাত গল্প করতে চাই, সারারাত আপনি থাকবেন? বললাম, সারারাত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থাকতে দেবে? সে মাথার বেণীটি দুলিয়ে বলল, সে দায়িত্ব আমার। এবার সে সত্যি সত্যি রহস্যময়ী হয়ে উঠল। জানেন দানিয়েল ভাই, আপনার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না হয়, আপনি এত বিষণ্ন এবং অপরিষ্কার থাকেন। মাঝে মাঝে তো বমি বেরিয়ে আসতে চায়। এটা তো ভূমিকা মাত্র। আসলে তায়েবা গোটা রাত কিসের গল্প করতে চায়, সেটা আমাকে ভয়ানক কৌতূহলী করে তুলল। আমি ভুলে গেলাম যে সে একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। সে যেমন করে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে বসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়ল। বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল। আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। এই অবস্থায় কী করি। ডা. মাইতিকে ডাকব কি না চিন্তা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর তার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে এল। চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আহ্ দানিয়েল ভাই। আপনি আরেকটু এগিয়ে এই আমার মাথার কাছটাতে বসুন এবং হাতখানা দিন। ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে দুহাতে মুঠি করে ধরে দু-তিন মিনিট চুপ করে রইল। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে এমনি ফিসফিস করে বলল, জানেন এ বছর আমি সাতাশে পা দিয়েছি। রাঙা আমার দুবছরের ছোট। তার একটি মেয়ে আছে। গোলগাল পুতুলের মতো। আঃ কী সুন্দর! দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। রাঙার বয়সে বিয়ে হলে এতদিনে আমারও ছেলেমেয়ে থাকত। গোটা জীবনটা কী করে কাটালাম, ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যেতে চায়। তায়েবার এ সমস্ত কথার প্রত্যুত্তর আমার জানা নেই। বুকটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছিল। বহু কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখলাম। কিছু বললাম না। তায়েবা বলে যাক যা মন চায়। তার প্রাণপাতালের তলা থেকে যদি অবরুদ্ধ কামনা বাসনার স্ফুলিঙ্গগুলো বেরিয়ে আসতে চায়, আসুক। এতকাল আমার মনে হয়েছিল তায়েবা ঠিক মানবী নয়। সাধারণ মেয়েদের মতো সে কামনা বাসনার ক্রীতদাসী নয়। অন্যরকম। আজ এই সন্ধেয় ওপরের নির্মোক বিদীর্ণ করে তার অন্তরালবর্তী নারী-পরিচয় এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। দানিয়েল ভাই, আবার সে ফিসফিস করে কথা বলল। মনে হল ওটা তার কণ্ঠস্বর নয়। পাথরচাপা কামনা বাসনারাই যেন কথা কইছে। জানেন দানিয়েল ভাই, আমার সারাশরীরে প্রচণ্ড আগুনের তাপ। আমি জ্বলে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি। আর বুকে কী ভয়াবহ তৃষ্ণা, মনে হয় সমুদ্র শুষে নিতে পারি। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণার তাপে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। আর বেশিদিন, নয়, শিগগিরই আমি মারা যাব। তারপর সবকিছুর শেষ হবে! ও মা! আপানি অত দূরে কেন। কাছে আসুন, আপনি এত লাজুক এবং ভীতু কেন? কই আপনার হাত দুটি কোথায়? সে আমার দুহাত টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখল। স্তন দুটি কবুতরের ছানার মতো গুটিসুটি মেরে বসে আছে। আমার বুকের মধ্যে যেমন একটা ভূমিকম্প হচ্ছিল, তেমনি একটা পুলক প্রবাহও রি রি করে সমস্ত লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় কাঁপছিল। এই নারী, এতকাল যাকে মনে করে আসছি ধরাছোঁয়ার বাইরে, সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, কত সহজে আমার কাছে নিজেকে

উন্মোচন করেছে। মুসা নীলনদের তল দেখেও কী এতটা পবিত্র পুলকে শিউরে শিউরে উঠেছিলেন? দানিয়েল ভাই শব্দটা বাদ দিয়ে শুধু আমার নামটা ধরে ডাকল। জান তোমাকে আপনাকে ভালোবাসি। এতদিন বলিনি কেন জান? আমি অনেকদিন আগে থেকে, এমনকি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব থেকেই আমার অসুখটার কথা জানতাম। আমার ভয় ছিল, জানালে কেটে পড়বেন। আর আপনাকে ভালোবাসি একথা জানাতে পারিনি, একটা কারণে পাছে তুমি মনে কর, আমি আপনাকে প্রতারিত করেছি। এ দোটানার মধ্যে বহুকষ্টে আমার জীবন কেটেছে। আজকে আমার কোনো দ্বিধা কোনো সংশয় নেই। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের সামনে বলতে পারি, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আজ আমার কোনো ভয়, কোনো ডর নেই। আমার ভেতর বাইরে এক হয়ে গেছে। আজ কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় নেই। আহ, আপনাকে আমি দেখতে পারছিনে। ওইখানে যেয়ে একটু আলোর কাছে বসুন। ভালো করে দেখি। আমি আলোর কাছে সরে বসলাম। আহ্ চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। মনে আছে, যেদিন প্রথম আমাদের গেন্ডারিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন গায়ে একটা ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি ছিল। বুকের কাছটিতে রং লেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয় গতকাল এ ঘটনা ঘটে গেছে।

জুতো মচমচিয়ে ডা. মাইতি কেবিনে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে দানিয়েল সাহেব যে আসুন আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম। করমর্দনের পালা সাঙ্গ হলে ডা. মাইতি বললেন, এবার দানিয়েল সাহেব আপনাকে কিন্তু একটা কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি বললাম, কিসের কৈফিয়ত ডা. মাইতি। আপনার তো অজানা থাকার কথা নয়, হাসপাতালে ছটার পরে কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। এখন আটটা বেজে তিরিশ মিনিট। মাইতিদা উনি চলে যেতে চেয়েছিলেন, আমি একরকম জোর করেই রেখে দিয়েছি। জবাব দিল তায়েবা। ভালো করনি। এখানকার একটা ডিসিপ্লিন তো আছে। সেটা যদি জোর করে ভেঙে ফেল আমরা টলারেট করব কেন? তায়েবা ডা. মাইতির কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বলল, ঠিক আছে দানিয়েল ভাই, চলে যান। আমিও চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিলাম। এমন সময় ডা. মাইতি তায়েবার হাত দুটো ধরে হো হো করে হেসে উঠলেন। দিদি তোমার আচ্ছা রাগ তো। এটা যে হাসপাতাল বাড়ি নয়, সেকথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই। ঠিক আছে, দানিয়েল সাহেব আর দশ মিনিট বসুন। বিছানার একপাশে বসলাম। এখনো তায়েবা রাগ করেনি। দানিয়েল সাহেব আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, ভালো। সে-রাতের পর আপনার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। মাঝেমধ্যে সময় হলে গরিবের দরোজায় একটু টোকা দেবেন। সে-রাতের পর থেকে কেন জানিনে আমি ডা. মাইতির মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। কেমন ভয় ভয় করে। তায়েবা বলল, কালকে আসবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাকে হাসপাতাল থেকে চলে আসতে হল।

৯

সেদিনটি ছিল আগস্ট মাসের চৌদ্দ তারিখ। চারদিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। সকালবেলা ঢাকা রেডিও ধরেছিলাম। গোটা বাংলাদেশে আজ

পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠস্বর শুনলাম। জঙ্গিলাট পাকিস্তানের দুঅংশের ঐক্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অটুট থাকবে, এ ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করে ঘোষণা করছেন, কোনো দুশমন পাকিস্তানের এক ইঞ্চি মাটি একজন পাকিস্তানি বেঁচে থাকতেও দখল করতে পারবে না। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ শব্দটি উচ্চারণ করে ইয়াহিয়া খান তাঁর উর্দু বক্তৃতা শেষ করলেন। পরপর ইংরেজি এবং বাংলায় তাঁর বক্তৃতা অনুবাদ করে শোনানো হল। ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পাকিস্তানকে সমর্থন করে এমন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, শুনে আমার শিরার সমস্ত রক্ত চট করে মাথায় এসে জমা হল। এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমরা দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। হয়তো অধ্যাপক শখ করে পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য রেডিওতে বক্তৃতা দিতে আসেননি। সৈন্যরা বন্দুক দেখিয়ে বাড়ি থেকে টেনে বের করে রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবু আমার ভীষণ খারাপ লাগতে আরম্ভ করল। আগস্ট মাসের এই সকালটি অত্যন্ত সুন্দর। শিশু-সূর্যের প্রাণপূর্ণ উত্তাপে প্রাসাদ নগরী কলকাতা যেন ভেতর থেকে জেগে উঠেছিল। মনটা অকারণে খুশিতে ছেয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সে গানটির কলি মনের ভেতর আসা-যাওয়া করছিল। আজি প্রভাত স্বপনে শরৎ তপনে, কী জানি পরান কীযে চায় গো শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো। ঢাকা রেডিও শুনে সবকিছু অশ্লীল মনে হতে লাগল। বন্ধ করে দিলাম। এই কান্তিমান দিনের সমস্ত আলো, উত্তাপ প্রতিশ্রুতি আমার কাছে একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। আজ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আগামীকাল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আর আমরাও একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আকাশে বাতাসে সর্বত্র শাড়ির আঁচলের মতো স্বাধীনতা যেন দুলে দুলে খেলা করছে। হায়রে স্বাধীনতা!

আমার মনে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের মতো একটা বিশ্রী অনুভূতির জন্ম হচ্ছিল, বিমর্ষতাটা আরো বেড়ে গেল। ঘরের বন্ধুদের কারো কাছে এ অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে পারছিনে। এমনকি নরেশদাকেও না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কণ্ঠনালি দিয়ে একটার পর একটা তেতো ঢেকুর উঠে আসতে চাইছিল। সকালে নাশতা খাওয়া হয়নি। ঠিক আছে এ বেলা কিছু খাব না। রুমে একটা তুমুল বির্তক চলছে। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ব্যাপারে সিরিয়স কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমতী গান্ধী যা ইচ্ছে করুন। আমি প্যান্ট শার্ট পরে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু গেটের কাছে এসে চিন্তা করলাম, কোথায় যাওয়া যায়। সত্যি সত্যি কলকাতা শহরে যাওয়ার মতো জায়গা খুবই অল্প আছে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল অ্যান্টনি বাগান লেনে মজহারুল ইসলামের বাড়িতে গেলে মন্দ হয় না! সকালের নাশতাটাও ওখানে খেয়ে নেয়া যাবে। আর ইসলামের কাজকর্মের একটু ফাঁক থাকলে তাঁকে নিয়ে অর্চনার ফ্লাট থেকে আগত দাদার কাছে গিয়ে আলাপ করা যাবে।

আমি যখন অ্যান্টনি বাগানে এসে পৌঁছলাম, দেখি ইসলামেরা সবেমাত্র নাশতার টেবিলের চারপাশে এসে বসেছে। এখনো কেউ খেতে আরম্ভ করেনি। আমাকে দেখে ইসলাম হাসতে হাসতে বললেন, আরে মশায় আপনার উৎপাতে সকালবেলাটাও দেখছি নিরাপদে কাটানো যাবে না। বলেন কোন মহা প্রয়োজনে এই সাতসকালে বাড়িতে

এসেছেন। আমি বললাম, কাজ না থাকলে কি আর আসি। আপনারা বাংলাদেশের মানুষেরা বেশ আছেন, গোটা কলকাতা শহরে একেকজন ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একেক মহাপুরুষের সুকীর্তির কাহিনী শুনতে শুনতে কানে পচন ধরে গেছে। আপনারা তো ইন্দিরা সরকারের অতিথি হিসেবে দিব্যি আছেন। এদিকে ইন্দিরাজি আমাদের কোন হাল করেছেন, সেটার কিছু খোঁজখবর রাখেন? গতকাল এই পাড়ায় আমাদের পার্টির যত কর্মী ছিল সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমি বাসায় ছিলাম না। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হল। মজহারুল ইসলাম সি. পি. আই. এম.-এর ডেডিকেটেড ওয়ার্কার। এখন পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশংকরের কংগ্রেস সরকারের সমস্ত রোষ সি. পি. আই. এম.-এর বিরুদ্ধে। কেননা জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাসগুপ্তের নেতৃত্বাধীন সি. পি. আই. এম.-ই হল কংগ্রেসের পয়লা নম্বরের দুশমন। প্রতিদিন কর্মীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছে। কেউ নিজের বাড়িতে থাকতে পারছে না। মজবুত ঘাঁটিগুলো একে একে কংগ্রেসের হাতে গিয়ে পড়ছে। বাইরে থেকে ঠিক বোঝার উপায় নেই। এখানেও কংগ্রেস সরকার একটি ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

মজহার সুযোগ পেলেই আমাদের খোঁচা দিতে ছাড়েন না। তাঁর অভিযোগটির মর্মবস্তু অনেকটা এরকম, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কৌশলে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুটি অস্বাভাবিক বড় করে জনমত সেদিকে আকর্ষণ করে রাখতে চাইছেন। আর সে সুযোগটি পুরোপুরি নিয়ে বিরোধী দলের অস্তিত্ব একবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য অবিরাম হামলা করে চলেছেন শ্রীমতী। তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই মনে করেন আমরা এখানে এসে শ্রীমতী গান্ধীর হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছি। তথাপি সি. পি. আই. এম.-এর লোকদের আমাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি আছে। নকশাল ছেলেরা তো সরাসরি মনে করে আমরা জনগণের বিপ্লবের জানী দুশমন। আর ভারতীয় গোঁড়া মুসলমানেরা বাংলাদেশের মানুষদের হিন্দুদের খেলার পুতুল ছাড়া কিছু মনে করেন না। সে যাক, আমি মজহারকে বললাম, আপনাকে মশায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মজহার প্রথমে যেতে চাননি। একাজ সেকাজের অছিলা করে পিছলে যেতে চেষ্টা করছিলেন। আমি যখন চাপাচাপি করতে থাকলাম, শেষ পর্যন্ত রাজি না হয়ে উপায় রইল না। নাশতা করার পর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ভাবলাম গড়িয়াহাটা অবধি বাসে যাব। কিন্তু মজহার রাজি হলেন না। তিনি বললেন, মশায় এখন ট্রামে যাওয়া চলবে না। গতরাতে পাড়া থেকে আমাদের পার্টির সমস্ত ওয়ার্কারকে তুলে নিয়ে গেছে। আপনার সাধ হয়েছে আমার কিছু পয়সা খরচ করাবেন। তা আর কী করা যাবে। অপেক্ষা করুন ট্যাক্সি আসুক।

ট্যাক্সি এলে দুজনে উঠে বসলাম। ডানদিকে বেরিয়ে শেয়ালদার মোড়ে এসে যানজটের মধ্যে আটকে গেল ট্যাক্সি। মজহার বললেন, আপনি মশায় মানুষটাই অপয়া ... দিন একখান চারমিনার। আর তো কিছু করার উপায় নেই। বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ি। আমি সিগারেট বের করে দিলাম, তিনি দেয়ালে সাঁটা একটা পোস্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখুন ইন্দিরা গান্ধীকে কেমন চিতাবাঘিনীর মতো দেখাচ্ছে না? আমার কিন্তু তেমন মনে হল না। ইন্দিরা গান্ধীকে ইন্দিরা গান্ধীর মতোই মনে হচ্ছিল। বোধহয় চিতাবাঘিনীর ছাপটি মজহারের মনে আছে। তাঁকে তুষ্ট করার

জন্য বললাম, তা দেখাচ্ছে বটে, আপনাদের পোস্টার? তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ছবিটা কে এঁকেছেন জানেন? তিনি বললেন, ছবিটা হল গিয়ে দেবব্রত দাশগুপ্তের। বাঁদিক থেকে তাকিয়ে দেখুন একেবারে অবিকল চিতাবাঘিনী। তাকিয়ে দেখার পর আমারও কেমন চিতাবাঘিনী মনে হল। এই সময়ে যানজট হালকা হয়ে এল।

গোলপার্কে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলাম দুজন। দরোজায় বেল টিপতেই অর্চনা নিজে এসে দোর খুলে দিল। অর্চনা স্নান করেছে, পিঠের ওপর আধভেজা চুলের বোঝা ছড়িয়ে আছে। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। চশমা না পরলে তাকে সত্যি সত্যি সুন্দর দেখা যায়। মজহারকে সামনে ঠেলে দিয়ে বললাম, তোমার প্যারিসফেরত দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এক বন্ধুকে ধরে নিয়ে এসেছি। অর্চনা মাথা নিচু করে আদাব জানিয়ে জিগগেস করল, আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? মজহার বললেন, না, আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে দুপুরুষ ধরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি এবং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে একখানা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালাই।

আপনারা বসুন আমি চা দিই। প্রমোদদা ততক্ষণে এসে পড়বেন। আমি জানতে চাইলাম তিনি কি এখন বাড়িতে নেই? অর্চনা বলল, খুব সকালবেলা উঠে তিনি একাকী বেরিয়ে পড়েন। ঘুরে ঘুরে পুরোনো আড্ডার জায়গাগুলো দেখেন। রোদটা তেতে উঠলেই চলে আসেন বাসায়, আসার সময় প্রায় হয়ে এল। চায়ে মুখ দিয়েছি, এমন সময় বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামার শব্দ শোনা গেল। অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে দরোজা খুলতে খুলতে বলল, ওই বুঝি দাদা এলেন।

লম্বা চওড়া ফর্সা সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখতে ঠিক বাঙালি বলে মনে হয় না। এখন বেলা অধিক হয়নি। তবু ভদ্রলোকের সারা শরীর ঘামে একরকম ভিজে গেছে। অর্চনা তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে এনে দিল এবং ফ্যানটা অন করে স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে জিগগেস করল, দাদা আপনার প্রাতঃকালীন তীর্থদর্শন আর কতদিন চলবে? সারা জীবন দেখলেও মনে হচ্ছে শেষ হবে না। ভদ্রলোকের অনভ্যস্ত জিহ্বায় বাংলা ভাষাটা ঠিকমতো আসতে চায় না। হঠাৎ করে বয়স্ক মানুষের মুখে শিশুর মতো বাংলাভাষা শুনলে কানটা আচমকা খুব খুশি হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, বিদেশে এই কলকাতা শহরের অনেক অপবাদ শুনেছি। কলকাতা নোংরা, ঘিঞ্জি আর দুর্গন্ধময় এসব আর কি। ঘুরে ঘুরে দেখতে কিন্তু আমার বেশ লাগে।

শেয়ালদার মোড়ে নোংরা জঞ্জাল আর আবর্জনার স্তূপ দেখে অর্চনা আমার কী মনে হল জানিস? যেন আবার নতুন করে জন্মাচ্ছি। কী জানি দাদা আপনি দার্শনিক মানুষ। আপনার দেখার ধরনটাই আলাদা। আমরা কিন্তু নোংরা আবর্জনাকে আবর্জনাই দেখি। প্রমোদবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে। এসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তোকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আহ্ কতদিন পরে আবার কলকাতা দেখছি! নিজের মাটি, নিজের মানুষ কী জিনিস যদি বুঝতে চাস তো, একটানা কয়েক বছর দেশের বাইরে কাটিয়ে আয়, তারপর বুঝতে পারবি। এই মাটি মানুষ ছেড়ে বিদেশে আপনি তো একটানা দু-যুগেরও অধিক সময় কাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মাঝে মাঝে আমি নিজেও অবাক হয়ে ভাবি এতটা সময় কী করে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কোনো সন্ধেবেলা অথবা রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ভাবতাম, আর না, ঢের হয়েছে। এবার সব

ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে গিয়ে ছোটনাগপুরের ওদিকে একটা কুটির তৈরি করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু আর হল কই? দেশে আসতে চাইলেও আসতে দিচ্ছে কে? আমি ফ্রেঞ্চ সিটিজেন হয়ে গেছি। তাছাড়া তোমার বৌদি আছে, ছেলেমেয়েরা আছে। তারা সকলে ওদেশটার জীবনধারায় অভ্যস্ত। সবকটাকে এখানে নিয়ে এলে ডাঙার মাছের মতো অবস্থা হবে। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মানুষের সব সাধ কি পূর্ণ হয়? তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বাংলাদেশের ফ্রিডম ওয়রটা শুরু হল। আর নিজেকে আটকে রাখা গেল না। ছুটে চলে এলাম। অর্চনা বলল, অন্তত একটা সাধ তো আপনার মিটল। পুরোনো দিনের কারো সঙ্গে দেখা হল? প্রমোদবাবু বললেন, দেখ, তোকে আসল খবরটাই বলা হয়নি। আমার সঙ্গে গেল পরশুদিন অনুকূলদার দেখা হয়েছে। তিনি পূর্বের মতো শক্তসমর্থ আছেন। শুধু মাথার চুলটাতেই একটু পাক ধরেছে। এ ধরনের চিরতরুণ মানুষকে দেখলে ঈর্ষা হয়। এখনো তিনি সমানে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা ষোলো আঠারো বছর বয়সে যেভাবে তাঁর কাছে ঝাঁক বেঁধে যেতাম, তেমনি এখনো তাঁর ঘরে ষোলো আঠারো বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। তাদের চোখে স্বপ্ন, বুকে কিছু একটা করার দুরন্ত কামনা। এখনো তিনি ছেলেমেয়েদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। জানিস অর্চনা অনুকূলদা পুরনো বিপ্লবীদের জড়ো করে বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স পার্টি গড়েছেন। তাঁর দলের ছেলেরা কলকাতা শহরের সব জায়গায় বড় বড় করে লিখেছে, দুবাংলার চেকপোস্ট উড়িয়ে দাও—দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। অনুকূলদাদের বি. এন. ভি. পি. ফান্ডে তিনশো ডলার ডোনেট করলাম।

প্রমোদবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল, দাদা আপনি এতদিন বাদে দেশে এসে আবার বি. এন. ভি. পি.-র পাল্লায় পড়েছেন? ছি, কী কেলেঙ্কারির কথা। কেন, বি. এন. ভি. পি. কী দোষটা করল? ওরা ভাঙা বাংলাকে আবার জোড়া লাগাতে বলছে। এ কী চাট্টিখানি কথা। জান এই বাংলা বিভাগ সহ্য করতে না পেরে উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। অর্চনা বলল, আপনি যেন একটা কী দাদা। এই বি. এন. ভি. পি.-র মতো প্রতিক্রিয়াশীল দল গোটা পশ্চিমবাংলায় আর একটিও নেই। আপনি চেনেন না বটে। ওদের আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এমন চমৎকার ডিপো আর একটাও খুঁজে পাবেন না। আপনি গিয়ে তাদের খপ্পরে পড়লেন? একদিক দিয়ে হিসেব করলে আপনি বিশেষ ভুল করেননি। মানুষের বাচ্চা বয়সে চোট লাগলে বুড়ো বয়সে সেটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। আপনার কৈশোর এবং যৌবনকাল কেটেছে অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে। মাঝখানে পঁচিশ তিরিশ বছরের মতো বিদেশে কাটিয়েছেন। কিন্তু আপনার মন ওই জায়গাটিতেই এখনো আটকে রয়েছে। মাঝখানে দু-দুটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। সমাজের কত পরিবর্তন ঘটে গেছে, রাজনীতির ধরনধারণ কত পালটে গেছে। আপনার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতি এখন অতীত যুগের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। অর্চনা অধিক কথা না বাড়িয়ে বলল, যাকগে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আমার এক বাংলাদেশের বন্ধুকে ডেকে এনেছি। ওর নাম দানিয়েল। আপনাকে ঢাকার সমস্ত খবরাখবর বলতে পারবে। প্রমোদবাবু নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়হাত করলেন।

তারপর জিগগেস করলেন, আপনি ঢাকায় থাকেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, উয়ারি চেনেন? বললাম, ঢাকায় থাকি উয়ারি চিনব না কেন? আচ্ছা আপনি জানেন উয়ারিতে একটা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট আছে। আমাকে বলতে হল, হ্যাঁ, উয়ারিতে একটা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট আছে। ওই র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ৩২ নম্বরের বাড়িতে ছোটবেলায় আমি থেকেছি। জিগগেস করলাম, ওটা কি আপনাদের বাড়ি ছিল? জবাবে প্রমোদবাবু বললেন, ঠিক আমাদের বাড়ি নয়। আমি জন্মেছি গ্রামে। ঢাকা শহর থেকে বেশি দূরে নয়। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণপাড়ে শুভাড্যায়। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বাড়িটি ছিল আমার দাদামশায় রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ চৌধুরীর। তিনি ছিলেন দুঁদে জমিদার। অসাধারণ প্রতাপশালী মানুষ। আপনি কি কখনো রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? আমাকে বলতেই হল এরকম কোনো নাম শুনেছি মনে তো পড়ে না। তিনি একটুখানি নিরাশ হলেন মনে হল। তারপর জানতে চাইলেন, আচ্ছা র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ৩২ নম্বর বাড়িটি আপনি দেখেছেন। আমি বললাম র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটটি চিনি বটে। কিন্তু কোন বাড়িটির কথা বলছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। প্রমোদবাবু বললেন, বাড়িটি দোতলা। সামনে একটা লোহার গেট। গেটের কাছে একটি বেলগাছ। বাড়ির পেছন দিকে একসার নারকেল গাছ। এবার চিনতে পারলেন? এত বিশদ করে বলার পরও বাড়িটি আমার চেনার বাইরে থেকে গেল। ভদ্রতার খাতিরে বলতে হল, আমি থাকি র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট থেকে অনেক দূরে। সে কারণে বাড়িটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে উঠতে পারেনি। ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি ফের জানতে চাইলেন, আপনি কি ফরাশগঞ্জের সত্যানন্দ সিংহের নাম শুনেছেন, একসময়ে যিনি ঢাকার অনুশীলন সমিতির সর্বেসর্বা ছিলেন। এবারেও আমাকে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হল।

প্রমোদবাবু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, একটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনি ঢাকায় থাকেন অথচ সত্যানন্দ সিংহের নাম শোনেননি। আমাদের সময়ে সত্যানন্দ সিংহকে সকলে একডাকে চিনত। ব্রিটিশ সরকার তাঁর মাথার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করছেন, অথচ অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নাম পর্যন্ত জানেন না, এটা কেমন করে হয়! আমি মনে মনে রেগে গেলাম। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। বললাম, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নাম জানার কোনো সম্পর্ক আছে কি? তিনি বললেন, বা রে সম্পর্ক থাকবে না কেন? সব ব্যাপারে একটা ধারাবাহিকতা থাকা তো প্রয়োজন।

উত্তরে আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। অর্চনা এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করল। সে প্রমোদবাবুকে জিগগেস করল, আচ্ছা দাদা বলুন দেখি আপনি দেশ ছেড়েছেন কত দিন হয়। প্রমোদবাবু মাথা চুলকে বললেন, তা হবে সাতাশ আটাশ বছর। অর্চনা ফের জানতে চাইল অগ্নিযুগের যেসকল বিপ্লবীকে চিনতেন দেশ ছাড়ার সময়ে সকলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল? প্রমোদবাবু বললেন, তা ছিল না—কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলেন তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে? কেবল অনকূলদার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল। আপনি প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে যোগাযোগ রাখতে পারেননি। এই বেচারি যদি আপনার চেনাজানা মানুষদের চিনতে না পারে, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে? মধ্যিখানে কতকিছু ঘটে গেল। দেশ বিভক্ত হল, জন্ম নিল হিন্দুস্থান, পাকিস্তান। আবার সেই

পাকিস্তানও এখন ভেঙে যেতে লেগেছে। আপনার দশা হয়েছে রিপভ্যান উইঙ্কলের মতো। আপনি যে-ঢাকার কথা বলছেন, সে হল আপনার স্মৃতি এবং স্বপ্নের ঢাকা শহর। এখনকার ঢাকা পুরোপুরি পালটে গেছে। শুনেছি রাস্তাগুলো প্রশস্ত এবং সোজা। লেখাপড়া শিক্ষা সংস্কৃতিতে ঢাকা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। কোনো কোনো দিক দিয়ে কলকাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ প্রমোদবাবু আমার চোখে চোখ রেখে জিগগেস করলেন, আচ্ছা এখনো কি ঢাকা শহরে পঙ্খিরাজ গাড়ি আছে? কথা শুনে আমার হাসি পাওয়ার দশা। বললাম, এখন কি আর পঙ্খিরাজের যুগ আছে? আমার কথায় তিনি বোধকরি খানিকটে আহত হলেন। সেকী আপনারা এমন সুন্দর জিনিসটি উঠিয়ে দিলেন? জবাবে বললাম, কেউ উঠিয়ে দেয়নি, কালের প্রভাবে আপনাআপনিই উঠে গেছে। তারপর আমার কাছে জানতে চাইলেন, আপনাদের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ বলুন। ফ্রেঞ্চ টেলিভিশনে প্রায় প্রতিদিনই খবর থাকত। মনে করেছিলাম, বাংলাদেশে একটি বড় ঘটনা ঘটছে। অনেকদিন থেকেই দেশে আসব আসব ভাবছিলাম, তবে ইনারশিয়া কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। টি. ভি.-তে বাংলাদেশের সংবাদ শুনে শুনে নিজের মধ্যে এমন একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করছিলাম আর স্থির থাকতে পারলাম না, চলে এলাম।

এরই মধ্যে চা বিস্কুট এসে গেছে। ভদ্রলোক একটা বিস্কুটের কোনায় কামড় দিয়ে এক চুমুক চা পান করলেন। সেই সময়ে তাঁর দৃষ্টি মজহারুল ইসলাম সাহেবের ওপর পড়ল। লজ্জা পেয়ে বললেন, আরে আপনার সঙ্গে তো কথাই বলা হয়নি। আপনিও কি বাংলাদেশের? ইসলাম বললেন, না আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। তবে আমরা দুপুরুষ ধরে কলকাতায় বসবাস করছি। আপনি কী করেন? ইসলাম বললেন, আমি এখানে কলেজ স্ট্রিটে একখানা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালাই। আপনার নাম? ইসলাম বললেন, মজহারুল ইসলাম। আপনি মুসলমান? ইসলাম জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ মুসলমান। প্রমোদবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। অর্চনা বুদ্ধিমতী মহিলা। কথার খেই ধরে জিগগেস করল, আপনার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নামটি কিন্তু এখনো জানা হয়নি। ইসলাম বললেন, 'নব জাগৃতি'। কেমন চলছে আপনার ব্যবসা? অর্চনার কৌতূহল মেটাবার জন্য বললেন, বর্তমানে ব্যবসার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। আমরা তো মার্কসিস্ট বইপত্র ছেপে থাকি। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার বর্তমানে মার্কসিস্ট সবকিছুর ওপর অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে আছেন। কোনো কোনো সপ্তাহে দোকান খোলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার তো আবার ডবল রিস্ক। নামে মুসলমান, তার ওপর মার্কসীয় বইপত্রের প্রকাশক। অর্চনা সোজা হয়ে বসেছিল। একটুখানি ঝুঁকে পড়ে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল। তার চোখেমুখে সহানুভূতিমিশ্রিত লজ্জার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। আপনি মুসলিম বলে ব্যবসাপত্র করতে অসুবিধে হয় কি? ইসলাম বললেন, সব সময়ে নয়, মাঝে মাঝে বেশ বিপদে পড়তে হয়। এই দেখুন না আমার দোকানটা ছিল পূরবী সিনেমার কাছে। গেল রায়টের সময় গোটা দোকানটাই জ্বালিয়ে দেয়া হয়, একটি পৃষ্ঠাও বাঁচাতে পারিনি। শুনে সহসা অর্চনার মুখে কোনো কথা জোগাল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এটা ভারি লজ্জা এবং দুঃখের। ভারতের নেতৃবৃন্দ যারা প্রকাশ্য জনসভায় বড় বড় কথা বলেন, তাঁদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। ইসলাম বললেন, আমাদের দেশে খারাপ লোকের সংখ্যা

নেহায়েতই মুষ্টিমেয়। তারা ক্ষমতাসীনদের সহায়তাতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ খুবই ভালো। এই ভালো মানুষেরা আছে বলেই এখনো পর্যন্ত টিকে আছি। আমি ধরে নিয়েছি, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। তাই আমার কোনোরকমের নালিশ বা অনুযোগ নেই।

প্রমোদবাবু হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন তারপর বললেন, অর্চনা, বোধ করি তোর কথা সত্যি। এরই মধ্যে এতসব পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানিনে। আমার মন সে সাতচল্লিশ আটচল্লিশে থিতু হয়ে আছে। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড রকমের ওলটপালট হয়ে গেছে। এই উপমহাদেশটি কোন দিকে যাচ্ছে? একবার দেশ ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তান হল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যদি সফল হয় পাকিস্তান আবার খণ্ড হবে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতে চেষ্টা করি, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে। গোটা ভারত উপমহাদেশে বাংলার স্থান কোথায়? ব্রিটিশ তাড়ানোর সংগ্রামে বাংলা দিয়েছে সবচাইতে বেশি, পেয়েছে সবচাইতে কম। বাঙালির ভাগ্য কী হবে বলতে পারেন? আমি চুপ করে রইলাম। অর্চনা বলল, দাদা, আমার ক্ষমতা থাকলে রাজনৈতিক কুষ্ঠি তৈরি করতাম। আপাতত যখন সে ক্ষমতা নেই, সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়াই উৎকৃষ্ট কর্ম মনে করি। অত ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন কী? যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। তিনি অর্চনার কথা কানে না নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, আপনাদের শেখ মুজিবুর রহমানটি কেমন মানুষ আমার জানতে খুব ইচ্ছে হয়। মুক্তিযুদ্ধ যদি জয়যুক্ত হয়, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জানেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। বাংলার ইতিহাসে আমি যত দূর জানি, এই ভূখণ্ডে বিক্ষোভ বিদ্রোহের অন্ত নেই। কিন্তু বাঙালি আপন প্রতিভাবলে নিজেদের মেরুদণ্ডের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে তা হলে একটা অভিনব ব্যাপার হবে। কলকাতায় খোঁজখবর নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তা থেকে স্থির কোনো ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। আমাকে কেউ কেউ বলেছেন মুজিব একজন গাঢ় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের সময় সোহ্‌রাওয়ার্দির চ্যালা ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য। অহিংস অসহযোগনীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই বিরাট গণসংগ্রাম রচনা করেছেন। দুচারজন কমিউনিস্ট বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে যা জেনেছি তাতে সংশয়টা আরো বেড়ে গেল। মুজিব নাকি ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী। মুজিব লোকটা কেমন, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কী সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। আমার কাছে সবটা ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া মনে হয়। কিন্তু একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মানুষটার ভেতর নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। নইলে তাঁর ডাকে এতগুলো মানুষ বেরিয়ে এল কেমন করে। আমি টি.ভি.-তে মুজিবের অনেকগুলো জনসভার ছবি দেখেছি। দেখার সময় শরীরের পশম সোজা হয়ে গিয়েছিল। এরকম মারমুখী মানুষের ঢল আমি কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না। মনে মনে কল্পনা করতাম অনুশীলন, যুগান্তর এসকল বিপ্লবী পার্টির প্রভাবে এই গণসংগ্রাম জন্ম নিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে যথেষ্ট

ইনফর্মেশন গ্যাপ ছিল। ফ্রান্সে আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু আছেন। তাঁর ছোট ভাই ওয়েস্ট বেঙ্গল কংগ্রেসের এক হোমরাচোমরা ব্যক্তি। বেলেঘাটার দিকে বাড়ি। গত পরশুদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে এবং পাকিস্তান আর টিকে থাকতে পারছে না। আমি তাঁর সরল বিশ্বাসের কোনো প্রতিবাদ করিনি। রকম-সকম দেখে মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে সামান্য অধিকার আমার আছে, তা দিয়েই বলতে পারি ভারতবর্ষের ব্যাপারে একজাতিতত্ত্ব এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনোটাই খাটে না। আসলে ভারতবর্ষ বহুজাতি এবং বহু ভাষার একটি মহাদেশ। উনিশশো সাতচল্লিশে ধর্মের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে অন্য সব প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়েছিল। আরো একটা কথা, নানা অনগ্রসর পশ্চাৎপদ জাতি এবং অঞ্চলের জনগণ তাদের প্রকৃত দাবি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই আপাত-সমাধান হিসেবে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটির জন্ম হয়েছিল। পরিস্থিতি যে-রকম দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ভেঙে পড়বেই, ভেঙে পড়তে বাধ্য। বাংলাদেশে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে। একথা যদি বলি আশা করি অন্যায় হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। তার পরে ভারতকে একই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আঞ্চলিক জাতিগত ধর্ম এবং ভাষাগত বিচ্ছিন্নতার দায় মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষের কর্তাব্যক্তিদের হিমশিম খেতে হবে। এমনকি ভারতের ঐক্যও বিপন্ন হতে পারে।

মনে মনে আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই কলকাতা শহরে ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন আমি একজন বিপন্ন ব্যক্তি মাত্র। আপন অন্তর্গত বেদনার ভারে সর্বক্ষণ কুঁজো হয়ে আছি, আপন হৃদয়ের উত্তাপে সর্বক্ষণ জ্বলছি। কোথাও পালিয়ে গিয়ে দুঃখগুলো নাড়াচাড়া করব সেরকম কোনো ঠাঁই নেই। কেউ আমাকে নিছক আমি হিসেবে দেখতে রাজি নয়। যেখানেই যাই ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসব এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এ এমন জটাজাল ছাড়াতে চাইলেও ছাড়াতে পারিনে। হাম কমলি কো ছোড়নে মাংতা, মগর কমলি হামকো নেহি ছোড়তা। আমি যেখানেই যাই বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা ওঠে। বাংলাদেশের যুদ্ধের কথা উঠলেই চীন, রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকার কথা আপনিই এসে পড়ে। বাংলাদেশের এককোটির মতো মানুষ ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার জন্য যেন আমি দায়ী। চীনা অস্ত্রে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের জনগণকে হত্যা করছে, সেজন্যও আমি ছাড়া দায়ী কে? বিশ্ববিবেক বাংলাদেশের এই দুঃখের দিনে কোনোরকমের সাড়া দিচ্ছে না, তার জন্যও আমাকে ছাড়া কাকে দায়ী করব? আমিই হলাম গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমস্যা সংকটের অঙ্কুর। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার যদি জন্ম না হত।

তায়েবা হাসপাতালে পড়ে আছে। তার সাংঘাতিক ক্যান্সার, ডাক্তার বলছে সে বাঁচবে না। এই বেদনার ভার আমি কী করে হালকা করি। যতই চেষ্টা করি না কেন আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের কিছুতেই মেলাতে পারিনে। পৃথিবী চলছে তার আপন নিয়মে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত আসতে চায়। কী করব স্থির করতে পারিনে। ঘটনাস্রোত আমার সমগ্র অস্তিত্বকে এমন একটা গহ্বরের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে, সারাজীবন চেষ্টা করলেও বোধকরি বেরিয়ে আসতে পারব না। সময় তার জটাজাল প্রসারিত করে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

এরই মধ্যে সুনীলদা বাজার সেরে এসে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। মজহার, সুনীলদা, অর্চনা, প্রমোদবাবু উনারা কথা বলে যাচ্ছিলেন। আমার কিছু বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে এক দৌড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কোথায়? প্রায় অর্ধেক কলকাতা শহর ঘুরে একটুখানি সান্ত্বনার প্রত্যাশায় তো এ বাড়িতে এলাম। অর্চনার আজকের রকম-সকম দেখে মনে মনে ভীষণ ব্যথিত হলাম। আমি জানি তায়েবা মারা যাচ্ছে। কারো করার কিছু নেই। আমারও না, অর্চনারও না। তবু অর্চনা যখন আগ্রহী হয়ে তায়েবার অসুখের কথা জিগগেস করে, আমাকে মিথ্যে আশ্বাসে আশ্বস্ত করে, আমি মনে মনে শান্তি পাই। আমি শান্তি পেলে কি তায়েবা বাঁচবে? না বাঁচবে না। সে মারা যাবে, তাকে মারা যেতেই হবে। মারা যাবার জন্যই সে অতি কষ্টে সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতা শহরে এসেছে। আসলে সংকট আমার ভেতরে। তায়েবাকে উপলক্ষ করে একটা আবরণ তৈরি করে নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

সুনীলদা এক পর্যায়ে সমস্ত আলোচনাটা তাঁর সেই সুবিখ্যাত শান্তির থিয়োরির দিকে টেনে নিলেন, জানেন প্রমোদ দা ভেতরের টেনশনই হল দুনিয়ার সমস্ত অশান্তির উৎস। যুদ্ধ, বিভীষিকা, মানুষে মানুষে সংঘাত এসব হল ভেতরের টেনশনের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। এগুলো থেকে মুক্তি না পেলে পৃথিবীর অসুখ কখনো সারবে না আর মানুষও কোনোদিন শান্তি পাবে না। ক্ষণিক ঘটনার দিকে না তাকিয়ে সমস্যার মূলটাই আমাদের দেখা উচিত। প্রমোদবাবু ফস করে জিগগেস করে বসলেন, কীরকম। এই যে ধরুন মানুষের রিপুগুলো আছে না তারাই তো মানুষকে সংঘাতের শান্তিনাশা পথে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং মানুষের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এইসব রিপু থেকে মুক্ত হওয়া। প্রমোদবাবু বললেন, তার কোনো পথ আছে কি? আছে আছে প্রমোদ দা। তা হলে তো মানুষ থাকবে না, সব দেবতা হয়ে যাবে। প্রমোদ দা, মানুষ তো আসলে দেবতাই, জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে বিচার করতে পারে না বলেই সে পশু হয়ে যায়। প্রমোদবাবু বললেন, সুনীল তোমার কথাগুলো অত্যন্ত চমৎকার। আমি অনেক বছর ইউরোপে থেকেছি। সুতরাং আস্থা স্থাপন করতে পারব না। অর্চনা ঝংকার দিয়ে উঠল, দাদা তুমি প্রমোদদার সঙ্গে চুটিয়ে শান্তিচর্চা করতে থাকো। রান্না হওয়ার বেশ দেরি আছে। আমি দানিয়েলকে নিয়ে গেলাম। বেচারি কষ্ট পাচ্ছে। তারপর ইসলামের দিকে তাকিয়ে বললেন, দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি একটু দানিয়েলকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।

অর্চনা আমাকে ভেতরের ঘরে বসিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, দানিয়েল, তোমার খবর বলো। কোনো দুঃসংবাদ নেই তো? কেমন আছেন তায়েবাদি? আমি বললাম, যেমন দেখেছিলে সেরকমই আছে। তা তোমার মুখচোখ অমন শুকনো কেন? এই সময়ে তোমাকে তো শক্ত হতে হবে। আমি বললাম, শক্তই তো আছি, যতটুকু থাকা যায়। অর্চনা ভ্রূ কুঁচকে বলল, তোমার চোখমুখ কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। বললাম, আমার পক্ষে কোথাও স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছে না। চারদিক থেকে এমন একটা চাপ এসে আমার ওপর পড়ছে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিনে। অর্চনা আমার কাঁধে হাত দিয়ে কণ্ঠস্বরটা খুবই নামিয়ে অনেকটা ফিসফিস করে জিগগেস করল,

দানিয়েল তুমি তায়েবাদিকে খুবই ভালোবাসো, তাই না? তার কথার জবাব দিতে গিয়ে আমার মুখে কথা আটকে গেল। সহসা কোনোকিছু বলতে পারলাম না। অর্চনা আমার মানসিক অবস্থাটা আঁচ করে বলল, দানিয়েল তুমি বরং আরেক কাপ চা খাও এবং একটু শান্ত হয়ে বসো। আমি একটু ভেতর থেকে আসি। বড়জোর দশ মিনিট। তার বেশি নয়।

শোভা মেয়েটি চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনে হল বাইরের গরম ভেতরের গরমকে অনেকখানি কাবু করে ফেলছে। আমার ভাবাবেগ অনেকখানি প্রশমিত হয়ে এসেছে। আমি সমস্ত বিষয় অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে পারছি। বাইরের ঘরের টুকরো টুকরো আলাপ কানে আসছে। ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমান চীন রাশিয়া আমেরিকা, বাঙালি, অবাঙালি, শেখ মুজিব, ভাসানী, ইন্দিরা গান্ধী নকশাল কংগ্রেস সি.পি.এম., এসকল বিষয় আলোচনায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই মাটি ফুঁড়ে একটি বিতর্ক জেগে ওঠে। আমার জন্যই যেন একটা মস্ত বড় বিতর্কের বিষয়। আমি যদি জন্ম না নিতাম, এতগুলো মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আসত না, তায়েবার অসুখ হত না, যেসকল সংকট সমস্যা পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার কিছুই ঘটত না। দুনিয়াতে যেখানে যা-কিছু ঘটছে তার জন্য যেন আমিই দায়ী। আমাকে নিন্দা করতে হয়, পক্ষ নিতে হয়। মনে হচ্ছে আমি দুনিয়াজোড়া প্রসারিত একটা শক্ত মাকড়সার জালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। হাজার চেষ্টা করেও তার নাগপাশ ছিন্ন করতে পারব না।

অর্চনা ভেতরের ঘর থেকে এসে জিগগেস করল, চা খেয়েছ? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। সে আমার দিকে কবার চোরাচোখে তাকাল এবং তারপর বলল, তায়েবাদির অসুখটা বেশ জটিল। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন এমন তো মনে হয় না। তুমি কী মনে কর? জবাব দিলাম, তায়েবা আর অসুখ থেকে কোনোদিনই সুস্থ হয়ে উঠবে না এবং এটাই তার শেষ অসুখ। সে আমি বিলক্ষণ জানি, তায়েবা জানে এবং তার মা-বোন-আত্মীয়স্বজন সকলেই জানে। কোন দিনটিতে সে মারা যাবে সে সংবাদটি আমরা কেউ জানিনে। সেটাই হয়েছে চূড়ান্ত সমস্যার বিষয়। অর্চনা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, দানিয়েল তুমি সময়বিশেষে ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পার। আমি বললাম, তুমি এর মধ্যে নিষ্ঠুরতার কী পেলে? যেকথাটি সকলে জানে শুধু সংকোচবশে প্রকাশ করছে না, সেকথাটিই আমি বলেছি। আচ্ছা দানিয়েল তোমাকে একটা কথা জিগগেস করব? আমি বললাম, হ্যাঁ করো। ধরো যদি তায়েবাদির কিছু একটা ঘটে যায় তুমি কি খুব কষ্ট পাবে? একথা কেন জানতে চাইছ? তোমার আর তায়েবাদির সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। আমার কী মনে হয় জান, হঠাৎ করে তায়েবাদি যদি এ অসুখটাতে না পড়তেন, তোমরা যে একে অন্যকে ভালোবাসো, সেটা এমন করে অনুভব করতে পারতে না। অর্চনার কথা শুনে সহসা আমার মুখে কোনো কথা জোগাল না। আমি চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম। তায়েবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ধরনের। সে কি আমাকে ভালোবাসে? আমিও কি তাকে ভালোবাসি? তার সঙ্গে আমার পরিচয় চার বছরেরও অধিক। কখনো এমন করে আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে হয়নি।

আজকে অর্চনার কথা শোনার পর আমাকে নিজের ভেতর ডুবে যেতে হল। তায়েবার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আমাদের মধ্যে যা যা ঘটেছে একে একে মনের মধ্যে খেলে যেতে থাকল। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকল। আমি স্পষ্টই অনুভব করলাম, সব সময়ই আমার মন তায়েবার দিকে বল্গাহারা অশ্বের মতো ছুটে গিয়েছে, কিন্তু যখনই কাছাকাছি গিয়েছি, থমকে দাঁড়াতে হয়েছে, হৃদয় মন রক্তাক্ত করে ফিরে আসতে হয়েছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব তার পার্টির ভেতর প্রোথিত। বারবার মনে হয়েছে সে যেন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত একটা মানবদুর্গের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দি এক নারী। এই দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা সে যেমন চিন্তা করতে পারে না আমিও তার ভেতর প্রবেশ করব কখনো মেনে নিতে পারিনি। আমরা পরস্পরের প্রতি যতদূর আকর্ষণ অনুভব করেছি, ঠিক সমান পরিমাণ বিকর্ষণ আমাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তার পরেও তায়েবা যখন ডেকেছে ছুটে গেছি, হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তার পায়ে অঞ্জলি দেব ভেবেছি। কিন্তু পরক্ষণেই এমন কিছু ঘটেছে আমাকে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে বুকের ভেতর একটা জখম নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে অর্চনা জিগগেস করল, দানিয়েল কী ভাবছ? আমি বললাম, আর ভাবাভাবির কী আছে, যা ঘটবার ঘটে যাবে। শোনো দানিয়েল একটা কথা তোমাকে বলি। তায়েবাদির হাসপাতালে তোমার আরো বেশি সময় থাকা উচিত। তুমি থাকলে উনি খুবই হাসিখুশি থাকেন। আমি বললাম, তার কাছাকাছি থাকতে পারলে আমারও ভালো লাগে। কিন্তু তার পার্টির মানুষেরা আমার দিকে এমন চোখে তাকায়, আমি খুবই বিব্রত বোধ করি। উনারা চোখমুখের এমন একটা ভঙ্গি করেন যেন আমি তায়েবাকে দেখতে এসে মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলেছি। আর তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা হলেই একটা না একটা খোঁটাখুঁটি লেগে যায়। শেষে তায়েবার ওপর সবকিছুর চাপটা গিয়ে পড়ে। তার রোগের যন্ত্রণাটা বেড়ে যায়। এটা এমন একটা জটিল এবং বিদঘুটে ব্যাপার তোমাকে সবটা খুলে বোঝাতে পারব না। অর্চনা বলল, কিছু কিছু বুঝতে পারি। তবু একটা কথা বলব, তুমি ভয়ানক একরোখা এবং জেদি, নিজের দিকটা ছাড়া আর কিছু দেখ না। বিশেষ বিশেষ সময়ে মানুষকে নমনীয় হতে হয়। আমি বললাম, তুমি আমাকে আমি যা নই তা হতে বলছ, সে তো সম্ভব নয়। দূর দানিয়েল আমি কী বলতে চাইছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। যাক, এখন তুমি কী করতে চাও, সেটা বলো। আমি তোমার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ করব বলে এসেছি। অর্চনা বলল, বলে ফেলো। তায়েবা তোমার খুব তারিফ করেছে। তার কথা শুনে মনে হয়েছে, সে মনের ভেতর থেকে তোমাকে খুবই পছন্দ করে। যে সমস্ত মানুষজন ওখানে আসে তার বেশির ভাগই তাকে একভাবে না একভাবে জখম না করে ছাড়ে না। অথচ সে কাউকে কিছু বলতে পারে না। সমস্ত পরিস্থিতিটাই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোথাও থেকে একটি সান্ত্বনার বাক্য শোনার সুযোগ নেই। তার যারা একেবারে কাছের মানুষ, তাদের দেখলে সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তুমি যদি এক আধটু সময় করে হাসপাতালে যাও, এটা ওটা বলে তার মনটা একটু হালকা রাখতে চেষ্টা কর, ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

অর্চনা বলল, দানিয়েল তোমার বলার প্রয়োজন ছিল না। আমি তো এমনিতেই

তায়েবাদিকে দেখতে প্রতিদিন যাচ্ছি। তাঁকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। একেবারে খড়খড়ে মহিলা। কোথাও কোনো স্যাঁতসেঁতেপনা নেই। কিন্তু তুমি যে বললে আমি এটা ওটা বলে তার মনটা হালকা করতে পারব, এটা বোধ করি সত্যি নয়। আমি জিগেস করলাম, তুমি একথা বললে কেন? অর্চনা বলল, সব কথার কারণ জানতে চাও কেন? আমি আর কথা বাড়ালাম না। অর্চনা বলল, আজ দুপুরে আমাদের এখানে খেয়ে যাও। আমি বললাম, না অর্চনা তা হয় না। আমাকে বাংলাদেশের ছেলেদের সঙ্গেই খেতে হবে। আর তা ছাড়া ইসলাম সাহেব ততক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি হবেন না। ভদ্রলোককে আমি একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছি। বাইরের ঘরে যখন এলাম, দেখি মজহারুল ইসলাম সাহেবের কাছে প্রমোদবাবু তাঁর কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিচারণ করছেন। এই ফ্রান্স-প্রত্যাগত ভদ্রলোকটিকে আমার মনে ধরেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে হয়তো কোনো ব্যাপারে আমার মতের মিল হবে না। কিন্তু তাঁর চরিত্রের একটি দিক আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। প্রমোদবাবু এখনো মনে করেন, জাতি হিসেবে বাঙালির একটি স্বাধীন অবস্থান সৃষ্টি হবে। এটা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। যদিও নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের দ্বন্দ্ব দেখে তাঁর মনে নানারকম সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। আরেক দিন সময় করে এসে গল্প করে যাব। প্রমোদবাবু বললেন, কাল আমি আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প দেখতে সীমান্ত এলাকায় যাব। হয়তো দুচার দিন থেকে যেতে হবে। আমি বাড়িতে আছি কি না খবর নিয়ে আসবেন। আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করার ইচ্ছে। আমি বললাম, আপনি একা একা সীমান্ত এলাকায় যাবেন কোনো অসুবিধে হবে না? তিনি জবাবে বললেন, ত্রিগুনা সেন হলেন তাঁর এক বন্ধুর মামা। ত্রিগুনাবাবু তাঁকে বি.এস.এফ.-এর এক কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। কর্নেল সাহেবই তাঁকে নিয়ে যাবেন।

অর্চনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ার পর মজহারুল ইসলাম সাহেব বললেন, মশায় আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। একবার ইসলামের ধুয়ো তুলে দেশ ভাগ করলেন। আবার এখন বাঙালিত্বের ধুয়ো তুলে কী সমস্ত বিষাক্ত মতামত এখানে ওখানে ছড়াচ্ছেন। দুনিয়াতে পাগলের সংখ্যা তো অল্প নয়, বস্তাপচা বাঙালি জাতীয়তার কথায় বিশ্বাস করে এমন মানুষও দেখি পাওয়া যায় ভূরিভূরি। আমি বললাম, পাওয়া যাবে না কেন? মশায় দেখছি আপনারা আমাদের অনেক জ্বালাবেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ আমাদের জ্বালাবার ক্ষমতাটুকুই শুধু দিয়েছেন। তিনি একটা চারমিনার ধরিয়ে বললেন, রাখেন আপনার আল্লাহ্, আজকের গোটা দিনটিই নষ্ট হল।

১০

দেখতে দেখতে সেপ্টেম্বর মাস চলে এসেছে। হাসপাতালে যাওয়া আমার নিত্যদিনের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। অন্য কোনো কাজকর্ম না থাকলে দিনে দুবারও যাই। রোজই দেখতে পাচ্ছি তায়েবার প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে। এখন সে নিজের শক্তিতে বিছানা থেকে উঠতে পারে না, তাকে তুলে বসাতে হয়। ধরে ধরে বাথরুমে

নিয়ে যেতে হয়। কলকাতায় আমাদের জীবনধারণ কঠিন হয়ে উঠেছে। তায়েবার মা, দুবোন, বড় ভাই সকলেই কলকাতায় আছেন। তার পার্টির কর্মীরাও নিয়মিত আসে, দেখাশোনা করে। কিন্তু তায়েবা শুয়ে থাকে। বড় বড় চোখ পাকিয়ে সবকিছু দেখে। খুব কমই কথা বলে। আগে যে তায়েবাকে দেখেছে, এ অবস্থায় দেখলে মনে হবে এই শরীরের মধ্যে আগের তায়েবার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে যখন শুয়ে থাকে, দেখলে আমার মরা নদীর মতো মনে হয়। গতি নেই, স্পন্দন নেই। আমার বুকটা ধক করে ওঠে। কী যে বেদনার স্রোত বয়ে যায় সে আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। এখনো জাহিদুল আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। ডোরা দেখলে অপ্রস্তুত বোধ করে। এমন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে, তার অর্থ দাঁড়ায় তুমি এখানে কেন?

কারো কোনো মন্তব্য আমি আর গায়ে মাখিনে। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলুক, না-বলুক আমার কিছু যায় আসে না। আমি যখন তার কেবিনে ঢুকি দেখামাত্রই তায়েবার ঠোঁটে একটা ক্লান্ত সুন্দর হাসির রেখা জেগে ওঠে। তার এই হাসিটাই আমাকে সবকিছু অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছে। আমার ইচ্ছে করে তার হাত পায়ে হাত বুলিয়ে দিই। মাথার উড়োউড়ো রুক্ষ চুলগুলো ঠিক করে রাখি। খসে-পড়া সাপের খোলসের মতো এলোমেলো শাড়িটা গুছিয়ে ঠিক করে পরিয়ে দিই। কিছুই করতে পারিনে আমি। সব সময় ঘরভর্তি মানুষ তাকে পাহারা দিয়ে রাখে। আমাকে মনের বেদনা মনের ভেতর চেপে রাখতে হয়।

আমাদের বেঁচে থাকাটাই একটা সংগ্রাম। পরের বেলার ভাত কীভাবে জোটাব সেজন্য অনেক ফন্দিফিকির করতে হয়। ভাগ্যগুণে একটা থাকার জায়গা পেয়েছি। সেখানে যারা থাকে সকলের অবস্থাই আমার মতো। যেখান থেকে যে পয়সা সংগ্রহ করে আনি, ও দিয়ে সকলে মিলে ভাত খাওয়া সম্ভব হয় না। প্রায় সময় আমাদের মাদ্রাজি দোকানে দোসা খেয়ে কাটাতে হয়। তার ওপর আমার আবার সিগারেট খাওয়ার নেশা। রোজ তায়েবার পেছনে কম করে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করতে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয় বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

এখানে সেখানে লেখালেখি করে অল্পস্বল্প অর্থ আমি আয় করেছি। তার পরিমাণ খুবই সামান্য। বাংলাদেশের নানা চেনাজানা মানুষ কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছে। অস্বীকার করব না, প্রিন্সেপ স্ট্রিটে অস্থায়ী সরকারের অফিস থেকেও নানা সময়ে কিছু টাকা আমাকে দেয়া হয়েছে। কলকাতার মানুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সহায়ক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী অল্পস্বল্প কাজ করিয়ে নিয়ে, সে তুলনায় অনেক বেশি টাকা আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু টাকার এমন ধর্ম, পকেটে পড়ার সাথে সাথে উধাও হয়ে যায়। যেদিকেই তাকাই প্রয়োজন গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে ছুটে আসে।

আমি কিছু কাজ করতে চেয়েছিলাম। বেশি নয় অন্তত দিনে পাঁচটা টাকা জোটাবার জন্য আমি কিছু কাজ করতে চাই। তিন ঘণ্টা কুলিগিরি করেও যদি পাঁচটি টাকা পাই আমি করতে রাজি। ওই টাকাটি না পেলে আমার পক্ষে তায়েবার হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হবে না। আর ইদানীং একটা সংকোচবোধ আমাকে ভয়ানক আড়ষ্ট করে ফেলেছে। তায়েবার কথা বলে চাইলে ওই টাকাটা হয়তো আমি কারো না কারো কাছ থেকে আদায় করতে পারি। আমার চেনাজানা মানুষের সংখ্যা নেহায়েত

অল্প নয়। নানা সময়ে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের কাছে হাত পেতে চেয়ে নিতে কোনোরকমের কুণ্ঠাবোধ করিনি। তায়েবার অসুখের নাম করে কারো কাছে টাকা চাওয়া গেলেও আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব হবে না। দুতিন দিন আগে অর্চনা হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে রেস্টুরেন্টে চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই সে আমার হাতে পাঁচশো টাকার একটি নোট দিয়ে বলেছিল, দানিয়েল, টাকাটা রাখো। এ সময়টাতে তোমার বোধ হয় খুবই টানাটানি চলছে। আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সময়ে পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। তথাপি অর্চনার টাকাটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, টাকাগুলো তোমার কাছে থাকুক, আমার যখন খুব প্রয়োজন পড়বে চেয়ে নেব। অর্চনা বলল, তুমি বরাবর একগুঁয়ে। আর তা ছাড়া ... । তা ছাড়া কী? তুমি আমাকে বন্ধু মনে কর না। আমি বললাম, অর্চনা আমি তোমাকে ঠিকই বন্ধু মনে করি, এই কলকাতা শহরে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যার কাছে আমার মনের বোঝা হালকা করতে পারি। তুমি না থাকলে নিঃসন্দেহে আমার কষ্ট অনেক গুণে বেড়ে যেত। আমার টাকার ভীষণ প্রয়োজন, তথাপি তোমার টাকাটি গ্রহণ করতে পারব না। দয়া করে কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি। অর্চনা টাকা ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, বক্তৃতাটি কি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল না? আমি কোনো কথা না বলে গড়িয়াহাটার ট্রামে না ওঠা পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিলাম।

আমি যে কিছু কাজ করতে চাই একথা বন্ধুবান্ধব অনেককেই বলেছি। সেদিন সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে বৌবাজারের হোস্টেলে ফেরার পর নরেশদা জানালেন সৌগতবাবু একটা কাজের খবর দিয়ে গেছেন। শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটিকে আমি কখনো পছন্দ করিনি। তাই তাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে আলাপ পর্যন্ত করা হয়নি। আজ তিনি আমার চূড়ান্ত বিপদের সময় এত বড় একটা উপকার করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলাম। নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলাম। না জেনে না শুনে না বুঝে কত সময় আমরা মানুষের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করি। নরেশদা একটুকরো কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন। দেখলাম লেখা রয়েছে অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক সাপ্তাহিক নতুন খবর, ৯১ নম্বর মঠ লেন, কলকাতা-৯১। নরেশদাকে জিগগেস করলাম, নতুন খবর নামে কলকাতায় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে তা তো জানতাম না। আমাকে কী ধরনের কাজ করতে হবে কিছু বলেছেন নাকি? তিনি জবাবে বললেন, না সেসব কিছু বলেননি। শুধু তোমাকে আগামীকাল সাড়ে নটার সময় তৈরি থাকতে বলেছেন, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। সেদিনও বাংলাদেশের ছেলেরা কেউ হোস্টেলে ছিল না। সকলে মিলে হাওড়াতে একটা অনুষ্ঠান করতে গেছে। ঘর ফাঁকা। আমার ঠিক কী হয়েছে, খুলে বলতে পারব না। যখন অধিক লোকজন থাকে একটুখানি নির্জনতার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। আর যখন লোকজন থাকে না নির্জনতা বোঝার মতো বুকের ওপর চেপে বসে। নরেশদার ভেতর কী ঘটছে অনেকদিন জিগগেস করা হয়নি। অঞ্জলি কলকাতা আসতে চায় কি না। তার বাবা মা এখন রাজার মঠে বড় ভায়ের বাসায় কী অবস্থায় আছেন, ভদ্রতার খাতিরে হলেও এসকল সংবাদ জিগগেস করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। তিনি জিগগেস

করলেন, এখন কী করবি? আমি বললাম, ঘুমোব। কাল সৌগতবাবুর সঙ্গে যাবি? হ্যাঁ বলে মশারিটা নামিয়ে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময় সৌগতবাবু এসে হাজির। বললেন, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিন। অনিমেষদা আবার সময়নিষ্ঠ মানুষ। তাঁকে কথা দিয়েছি ঠিক দশটার সময় আমরা আসব। অধিক কথা না বাড়িয়ে জামাকাপড় পরে সৌগতবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বাসের জন্য বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল। আমরা যখন মঠ লেনে এসে নামলাম দশটা প্রায় বাজে। প্রচণ্ড ভিড়ে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছি। নতুন খবরের অফিসে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিল না। মঠ লেন বড় ঘিঞ্জি জায়গা, আমাদেরকে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে একটি সেকেলে লাল ইট বের হওয়া দালানের তিনতলায় উঠতে হল। সিঁড়ির বাঁদিকে ছোট একটি নেমপ্লেট লাগানো। দরোজা খোলাই ছিল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। অফিস কামরাটি খুব বড় নয়। একপাশে দেখলাম দুজন কম্পোজিটর কম্পোজ করছে। টাইপের ঝাঁচার পাশ ঘেঁষে একটা চিকন লম্বা টেবিল পাতা। একজন অল্পবয়েসী মানুষ বসে বসে প্রুফ কাটছে। মাঝখানটিতে সম্পাদক অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেবিল। একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। ভদ্রলোকের খুব ধারালো চেহারা। নাকটি তীক্ষ্ণ এবং বাঁকানো। গোঁফজোড়া ছুঁচালো করে ছাঁটা। পরনে ধুতি এবং মটকার পাঞ্জাবি। ভদ্রলোকের চোখজোড়া ভীষণ উজ্জ্বল। বয়েস কত হবে বলা মুশকিল। পঁয়তাল্লিশ হতে পারে, আবার পঞ্চান্নও হতে পারে। কিছু মানুষ আছে যাদের চেহারা দেখে বয়েস আন্দাজ করা যায় না।

সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় নমস্কার করে বললেন, এই যে অনিমেষদা দেখলেন তো কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এসে হাজির হয়েছি। অনিমেষবাবু তাঁর রিভলভিং চেয়ারে একটুখানি নড়েচড়ে বসলেন। টেবিল থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে বললেন, বসো বসো সৌগত, একটা কাজের মতো কাজ করে বসে আছ দেখছি। জীবনে তোমাকে এই প্রথম সময় রক্ষা করতে দেখলাম। তারপর তোমার পকেট বিপ্লবী দলের সংবাদ কী। এই বুঝি তোমার নতুন কমরেড।

সৌগত অনিমেষবাবুর অন্যসব কথার জবাব না দিয়ে বললেন, আপনি একজন অনুবাদক চেয়েছিলেন। আমার ধারণা ইনি ভালো অনুবাদ করতে পারবেন। ভদ্রলোক বাংলাদেশ থেকে এসে ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে গেছেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়ার ভীষণ অসুখ। আপনি যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। এবার তিনি আপাদমস্তক আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর জানতে চাইলেন আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? আমি মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, বাংলাদেশ মানেই তো অসুবিধে। ওই মুসলমানের দেশে এতদিন পড়ে ছিলেন, আগে চলে আসনেনি কেন? ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি একরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। কী বলতে হবে খুঁজে না পেয়ে সৌগতবাবুর দিকে তাকালাম। দেখি তিনিও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তিনি আমার চাইতে কম অবাক হননি।

সৌগতবাবু আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলেন আপনি অনুবাদ করার লোক চেয়েছিলেন, আমার ধারণা ইনি ভালো অনুবাদ করবেন, আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন। আরে রাখো তোমার টেস্ট, আগে কথাবার্তা বলতে দাও। তারপর অনিমেষবাবু আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী মশায় চুপ করে আছেন, আগে চলে আসেননি কেন? আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, আগে চলে আসব কেমন করে? তিনি ফের জিগগেস করলেন, এখন কী করে চলে আসতে পারলেন? আমি বললাম পাকিস্তানি মিলিটারি আক্রমণ করে বসল, তাই বাধ্য হয়ে ...। আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগে ভদ্রলোক কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললেন, মুসলমানদের লাথি ঝাঁটা এতদিন খুব মধুর লেগেছিল তাই না, এখন মুসলমানে মুসলমানে লাঠালাঠি লেগেছে, আপনারা সকলে একসঙ্গে হুড়মুড় করে আমাদের ওপর চড়ে বসেছেন। অগত্যা আমাকে বলতে হল আমিও মুসলমান। তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। হলেনই বা মুসলমান। তাতে এমন কী এসে গেল। আমি মশায় সাফ কথার মানুষ। হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয়েছে, হিন্দুদের সে দেশ থেকে অনেক আগেই চলে আসা উচিত ছিল। দেড় কোটিরও বেশি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার জন্য আমাদেরকে দশ কোটি মুসলমানকে সহ্য করতে হচ্ছে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা ভারতবর্ষে চলে এলে আমরা মুসলমানদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করতাম। সব সমস্যার সাফ সাফ সমাধান হয়ে যেত। ওই হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার জন্যই ভারতকে মুসলমানে মুসলমানে মারামারি কাটাকাটিতে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। ভারতের কি আর কোনো সমস্যা নেই? সেকথাও থাকুক। ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ বলেই নাহয় হিন্দুরা ভারতবর্ষে এসেছে। কিন্তু আপনারা কোন মুখে দলে দলে চলে এলেন? আমি অনিমেষবাবুর কথায় রাগ করতে পারলাম না। আমার লেগেছে একথা সত্যি। তার পরেও মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা না করে পারলাম না, তাঁর মধ্যে আর যা-ই হোক কপটতার বালাই নেই।

আমি মনে করলাম, আর বসে থেকে লাভ কী? অন্তত একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হল। আমি স্যান্ডেলে পা গলিয়ে বললাম, তা হলে আমি আসি। সৌগতবাবুকে আমার সঙ্গে আসতে বলব কি না ভাবনায় পড়ে গেলাম। অনিমেষবাবু বললেন, আপনার খারাপ লেগেছে বুঝতে পারি। কিন্তু আমি মশায় যা ভাবি বলে ফেলি। আমার ভেতর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিছু পাবেন না। বসুন চা খান। চলে যাবেন কেন, আপনি তো কিছু কাজ চেয়েছিলেন। আমার তো একজন অনুবাদকের প্রয়োজন। তারপর তিনি কম্পোজিটরদের একজনকে ডেকে বললেন, ভূপতি যাও নিচে থেকে চা এবং শিঙাড়া নিয়ে এসো। উঠি উঠি করেও উঠতে পারলাম না। সৌগতবাবু বললেন, অনিমেষদা চা আনতে তো কিছু সময় লাগবে, ততক্ষণে আপনি দানিয়েল সাহেবকে টেস্ট করে দেখেন, অনুবাদে হাত আছে কি না। অনিমেষবাবু ধমক দিয়ে বললেন, সৌগত নড়াচড়া করবে না। ঠিক হয়ে বসো। আমি তোমাদের শখের কমিউনিস্টদের মতো হিপোক্রাইট নই। আমার অনুবাদের মানুষ দরকার, উনি যদি ভালোভাবে করতে পারেন, অবশ্যই কাজ দেব। সহজ কথাটা সহজভাবে বলি বলে মনে কোরো না, আমার কোনো ভদ্রতাজ্ঞান নেই।

এবার অনিমেষবাবু অপেক্ষাকৃত সহজ ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন আমার বাড়ি কোথায়। আমি বললাম চট্টগ্রাম। তিনি বললেন, আমাদের বাড়িও একসময় ওদিকে ছিল। পঞ্চাশের রায়টের পর সবকিছু বেচে কিনে চলে এসেছি। আমি তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম কোথায় জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, না চট্টগ্রাম নয়, তবে সীমান্তের অপর পাড়েই তাঁদের বাড়ি। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায়। এরই মধ্যে চা এল, শিঙাড়া এল। আমার দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খান। চা খাওয়া শেষ হলে একটা সিগারেট খাওয়া যাবে কি না অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, ফিল ফ্রি। সংবাদপত্রের অফিসে আবার কেউ সিগারেট খাওয়ার অনুমতি চায় নাকি। তারপর তিনি আমাকে ইংরেজি টাইপ করা একটি প্রবন্ধ দিয়ে বললেন, একটা পৃষ্ঠা অনুবাদ করে দেখান, দেখি আপনার হাত কেমন। আমি একটু সরে বসে অনুবাদ করতে লেগে গেলাম। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল আর্যদের আদি নিবাস। স্বামীজী বিরূপাক্ষ হলেন লেখক। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্যদের বহিরাগত প্রমাণ করে যেসকল বই-পুস্তক লিখেছেন, সেগুলো একেবারে প্রমাণসিদ্ধ নয়। আর্যদের আদি নিবাস হল ভারতবর্ষে। এই ভারতবর্ষ থেকেই আর্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার একটা পৃষ্ঠা অনুবাদ করতে আধঘণ্টার মতো সময় লাগল। তারপর আমি অনুবাদ করা অংশটি নিয়ে অনিমেষবাবুর টেবিলে রাখলাম। তিনি চশমা খুলে পড়ে দেখলেন। বললেন, আপনি তো মোটামুটি ভালোই অনুবাদ করেন। শুধু একটি শব্দ আমি পালটাচ্ছি। যেখানে সিন্ধুনদের পানি বলেছেন, আমি পানি কেটে জল শব্দটি বসাচ্ছি। আমি বললাম, জল পানিতে আমার কিছু আসবে যাবে না।

সৌগতবাবু বললেন, দেখি অনিমেষদা। তারপর মূল প্রবন্ধ এবং অনূদিত অংশ টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। অনুবাদের অংশটি পড়া শেষ করে বললেন, তা হলে এখন থেকে আপনি আর্যদের আদি নিবাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই ধরনের প্রবন্ধের পাঠক এখনো পশ্চিমবঙ্গে আছে নাকি? আপনার কাগজ কেউ পড়ে? সৌগত তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। শখের কমিউনিস্টগিরি করে বেড়াও বলে দেখতে পাওনি। দশ বছর থেকেই প্রতি সপ্তাহে আট হাজার কাগজ ছেপে আসছি। বাজারে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, গ্রাহকদের বাড়িতে আমি কাগজ পাঠিয়ে দিই। তাঁরা আমাকে ডাকে চাঁদা পাঠান। তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তোমার মতো পশ্চিমবাংলায় সকলে বিটকেলে জাতখোয়ানো বামুন নয়। কিছু খাঁটি এবং সৎ ব্রাহ্মণ এখনো আছেন। সৎ হিন্দুও অনেকে আছেন। তাঁরা অনেকদিন থেকেই আমার কাগজ নিয়মিত পাঠ করে আসছেন। তুমি যদি দেখতে চাও আমি গ্রাহক লিস্ট দেখাতে পারি।

অনিমেষবাবুর খোঁচা খেয়ে সৌগত একটু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, বুঝলাম, সৎ হিন্দুরা আপনার কাগজ পড়েন। কিন্তু আপনি কাগজে কী লিখেন? কেন আমি হিন্দুদের কথা লিখি। হিন্দুদের মহান ঐতিহ্যের কথা লিখি। স্বার্থের কথা লিখি। হিন্দুরা যে মহান জাতি সেকথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিই। অনিমেষবাবুর কথার মধ্যে কোনো জড়তা নেই। যে-কেউ তাঁর কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, তাঁর মন এবং মুখের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। অনিমেষবাবু বললেন, সৌগত আর কথা বাড়িয়ে লাভ নিই। তোমার বাংলাদেশের কমরেডের সঙ্গে কথাবার্তাটা আগে ফয়সালা করে নেই। প্রতি

সপ্তাহে এরকম একটা করে প্রবন্ধ অনুবাদ করতে হবে। প্রতি হাজার শব্দে আমি পঁচিশ টাকা করে দিয়ে থাকি। আমাদের যিনি অনুবাদ করতেন, তিন চার মাস যাবৎ অসুস্থ। বাঁচবেন কি না সন্দেহ। তোমার বন্ধু যদি রাজি থাকেন, তাঁকে কাজটা দিতে আমি প্রস্তুত। সৌগতবাবু বললেন, কিন্তু দাদা আমার একটা খটকা থেকে গেল। আপনার কাগজ হিন্দুদের কাগজ। একজন মুসলিম যদি অনুবাদ করে আর সে লেখা যদি আপনি ছাপেন, তাতে কোনো দোষ হবে না? অনিমেষবাবু স্পষ্টভাবে বললেন, না কোনো দোষ হবে না। কেন দোষ হবে? যদি হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা থাকত, তুমিও বুঝতে পারতে এতে দোষের কিছু নেই। আমি একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসেবে অনুভব করি সঠিক বিষয়টি চিন্তা করা ছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য নেই। যুগে যুগে ব্রাহ্মণেরা তাই করে এসেছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করেছে, বৈশ্যেরা ব্যবসা করেছে, শূদ্রেরা পরিশ্রম করেছে। আর ব্রাহ্মণ সব সময়ে বিধান দিয়েছে। কেউ না কেউ ব্রাহ্মণের কাজ করে দিয়েছে। একজন গুণবান পণ্ডিত ব্রাহ্মণের লেখা একজন মুসলমান দিয়ে অনুবাদ করালে এবং সে লেখা হিন্দুদের পড়তে দিলে এতে দোষের কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে।

সৌগতবাবু এবং অনিমেষবাবুর বিতর্কটি শুনে আমি তো দিশেহারা। ভাবনায় পড়ে গেলাম। কাজটা নেব কি না। আমার যে অবস্থা রাস্তায় কুলিগিরি হলেও আপত্তি ছিল না। আমার দৈনিক মাত্র পাঁচ ছয়টি টাকার প্রয়োজন। কুলিগিরিতে শারীরিক পরিশ্রম লাগে কিন্তু মানসিক নির্যাতন নেই। এই কাজটি গ্রহণ করলে তার চাইতে ঢের কম শ্রমে আরো বেশি আমি পেতে পারি। আমার অন্তরাত্মা বলছে, এই কাজের ভেতরে এমন কিছু আছে, গ্রহণ করলে আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব। কিন্তু তায়েবার কথা মনে হওয়ায় বুকটা হহ করে উঠল। কথা মনে কথা দিলাম অনুবাদের কাজটা আমি করব।

১১

অনিমেষবাবুর অনুবাদের কাজটা গ্রহণ করার পর থেকে আমার মানসিকতার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আমার সেই উড়ু উড়ু ভাবটা অনেক পরিমাণে কমেছে। আসলে এতদিন আমার ভেতরে যে হা-হুতাশ চলছিল এবং যা আমি তায়েবার প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ মনে করে আসছিলাম, সর্বাংশে সঠিক নয়। আমার নিজের প্রতি নিজের যে কর্তব্যবোধ তা পালন করার অক্ষমতা থেকেই আমার ভেতরে ভাবাবেগ জন্ম নিচ্ছিল। তায়েবার চারপাশে যারা জড়ো হয়, যারা তাকে সকাল বিকেল দেখতে আসে আমি মনে করতাম, কেউ তায়েবার মঙ্গল চায় না। তারা আসে মজা দেখার জন্য, কষ্ট বাড়াবার জন্য অথবা জাহিদুল এবং ডোরার মতো নিজেদের কৃতকর্মের অপরাধবোধ লাঘব করার জন্য। আমি মনে করতাম, গোটা কলকাতা শহরে আমিই হলাম একমাত্র ব্যক্তি যে তায়েবার মঙ্গল চায়। আর সকলেই তায়েবার শত্রু।

দৈনিক দশ টাকা আয় করার জন্য তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার কঠোর খাটুনি খাটতে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেল। আমি আবিষ্কার করলাম তায়েবার চিকিৎসার যাবতীয় ওষুধপত্তর সবটা হাসপাতাল দেয় না, বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তার পেছনে

অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিনশো টাকা লাগে [illegible]
সংগ্রহ করে, কার কাছ থেকে সংগ্রহ করে, কে [illegible]
কিছুরই সংবাদ জানিনে। অথচ আমি [illegible]
ভালোবাসার দাবিতে না করতে পারব [illegible]
দেখাশোনার সব দায়িত্বটা যদি আমার ওপর পড়ত, [illegible]
ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। তার পার্টির মানুষদের [illegible]
আছি। কিন্তু তারা তো টাকাটা ম্যানেজ করছে। [illegible]
নিয়েছি। আমার বিবেচনায় ডোরা একটি ভালো মেয়ে। [illegible]
জাহিদুল এখানে সেখানে ডোরাকে নিয়ে গিয়ে যে [illegible]
আসে, তার সবটা তায়েবার পেছনে খরচ করে। এমনকি [illegible]
ডোরা পেয়েছিল, ও দিয়ে আমেরিকা থেকে কী একটা [illegible]
ডোরা জাহিদুলকে বিয়ে করেছে। তাতে এমন অন্যায়টা কী [illegible]
তো ঘটে। হেনাভাই একটা বিধবা মেয়েকে এ সময়ে বিয়ে করে অপরাধ কী করেছে [illegible]
মহিলা এবং হেনা ভাই পরস্পরকে পছন্দ করেই তো বিয়ে করেছে। আমি [illegible]
সকলকে অপরাধী মনে করি, কেন। পৃথিবীর সকলে ঘোরতর পাপে লিপ্ত, আর [illegible]
একা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এ কেমন করে হয়।

তায়েবার ক্যান্সারের জন্য অন্য সবাই দায়ী হবেন কেন? ক্যান্সার রোগ তো আরো অনেকের হয়। এই ওয়ার্ডের অধিকাংশই তো ক্যান্সার রোগী। তারা কাকে দায়ী করে? বড়জোর ভাগ্যকে? আমি যে তায়েবার পক্ষ অবলম্বন করে মনে মনে এত লম্ফঝম্ফ করছি এ পর্যন্ত তায়েবার জন্য কী করতে পেরেছি? হ্যাঁ এ পর্যন্ত একটা কৃতিত্ব আমার আছে। তায়েবাকে সন্ধেবেলা হাসপাতালে প্রতিদিন দেখতে যাওয়ার খরচটা আয় করার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি। নিজের দীনতা, তুচ্ছতা এবং হীনমন্যতার পরিচয় পেয়ে একটা আত্মঘৃণা ঘুরে ঘুরে বারবার আমাকে দগ্ধ করতে থাকল। সেদিন সকালবেলা আমি হাসপাতালে গেলাম। ডা. মাইতি আমাকে একটা পাশের ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন। দিনটি খুবই সুন্দর। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। হাওয়াতে সামান্য [illegible] আকাশে চনচনে রোদ উঠেছে। শিশু-সকালের রোদে চারপাশের গাছপালা [illegible] আমার মনের ভেতরে একটা ব্যথাবোধ ঢেউ দিয়ে জেগে উঠল। গাছপালা [illegible] এমনই সবুজ থাকবে, সূর্য এমনি করে সুন্দর আলোকরাশি [illegible] মানুষজনের কলকাকলিতে রাজপথ মুখরিত হবে, রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি [illegible] ধরনের আওয়াজ করে বাতাস কম্পিত করে তুলবে, শুধু [illegible] চলমান স্রোত থেকে বাদ পড়ে যাবে শুধু একজন। আমার [illegible] মধ্যে তার প্রস্থানের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আমার [illegible] করব কী করে।

তায়েবার কেবিনে যখন প্রবেশ করলাম, দেখি খুবই [illegible] বসেছে। সকালবেলা বোধ হয় গোসল করে ফেলেছে। [illegible] শাড়ি পরেছে। তাকে খুবই প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। মুখে [illegible] পাউডারের দানা ছড়িয়ে আছে। হাসপাতালে আমি [illegible]

হাসিখুশি দেখেছি মনে পড়ে না। আমার মনের ভেতরে একটা সূক্ষ্ম আশার রেখা খেলে গেল। তা হলে কি তায়েবার অসুখ সেরে যাবে!

আমাকে দেখামাত্রই তায়েবা কলকল করে উঠল। এই যে দানিয়েল ভাই এসে গেছেন। তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটো কলি গুনগুন করে উঠল। এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার। পূর্বের দিনের মতো হাততালি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। জানেন দানিয়েল ভাই এই সকালবেলায় আপনি প্রথম মানুষ নন। আপনার আগেও একজন এসেছিলেন, কে বলুন দেখি। আমি বললাম, কেমন করে বলব কে এসেছিল। সে ঠোঁট দুটো একটুখানি ফুলিয়ে বললে, এসেছিল অর্চনাদি। আমি বললাম, এত সকালে অর্চনা কেমন করে এল। তার তো কোনো পাশও ছিল না। তায়েবা জবাব দিল অর্চনাদি চাইলে কী না করতে পারে। তার কত প্রভাব প্রতিপত্তি। এই হাসপাতালে ড. সেনগুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি অর্চনাদির কী ধরনের আত্মীয় হন। ড. সেনগুপ্তকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম না অর্চনাদি খুউব ভালো, আর খুউব রুচিবান মহিলা। দেখুন এই শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেছে। খুব সুন্দর না, আমাকে মানিয়েছে? আমি জিগগেস করলাম, এটা কি নতুন শাড়ি? সে কপট রাগের ভঙ্গি করে বলল, আপনি এখনো পর্যন্ত একটা মিষ্টি কুমোড়, নতুন শাড়ির সঙ্গে পুরোনো শাড়ির পার্থক্য পর্যন্ত ধরতে পারেন না। এমন রং-কানা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তারপর তায়েবা বলল, অর্চনাদি আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে গোসল করিয়েছে। তারপর শাড়ি পরিয়েছে। আমার মুখে ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছে। ভীষণ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আমার অসুখবিসুখ কিছু নেই। অর্চনাদির শাড়িতে আমাকে মানিয়েছে। কই কিছু তো বললেন না। আমি বললাম হ্যাঁ খুব মানিয়েছে। জানেন দানিয়েল ভাই, জীবনে আমি আপনার মতো বেরসিক মানুষ বেশি দেখিনি। আপনার কোনো ভদ্রতাজ্ঞান নেই। এমন মুখগোমড়া স্বভাবের মানুষকে অর্চনাদির মতো এমন একজন রুচিবান মহিলা কী করে সহ্য করেন, আমি তো ভেবে পাইনে।

তায়েবা কথাটা যত সহজভাবেই বলুক, শুনে আমার কেমন জানি লাগল। হাজার হোক মানুষের মন তো। তার কথাটা গায়ে না মেখে আমি বললাম অর্চনার আমাকে সহ্য করার কী আছে? তাকে আমি আগে থেকে চিনতাম, চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এই তো সম্পর্ক। অনেক মানুষই তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল, অর্চনাও তার একজন। আর তা ছাড়া ...। তাছাড়া আর কী। অর্চনা তোমাকে খুবই পছন্দ করে। একথা আমাকে বারবার বলেছে। তায়েবা বলল, অর্চনাদি আপনাকে খুব পছন্দ করে। আপনাকে পছন্দ করে বলেই আমাকে দেখতে আসে। আমার সঙ্গে অর্চনাদির তো সেরকম কোনো পরিচয় ছিল না। আমি বললাম, মানুষ একসূত্রে না একসূত্রে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমার সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল না। এখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। অর্চনাদি কী সুন্দর আর কী লম্বা আর কত লেখাপড়া জানে। আপনার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে। আমি বললাম, অর্চনা শুধু আমার বন্ধু, আর কিছু বলতে পারব না। এবার তায়েবা কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি দেখতে একটুও সুন্দর নন, তবু এত ভালো মহিলাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয় কী করে আমি বুঝতে

পারিনে। আমি বললাম, তোমার সঙ্গেও আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এটাকে তুমি কী বলবে?

তায়েবা তার হাতটা আমার মুখে চাপা দিয়ে বলল, দানিয়েল ভাই, মনে আছে একবার আপনি সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। আপনি শুনেই কারফিউর মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। পরের দিন সকালবেলা আপনাকে কত জায়গায় খুঁজে শেষ পর্যন্ত ড. মনির চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, মনে আছে? আমি বললাম, মনে থাকবে না কেন, ওসমস্ত ঘটনা কেউ কি ভুলতে পারে। আচ্ছা সেদিন আপনি অমন করে চলে গিয়েছিলেন কেন? আমি মনে মনে খুবই চেয়েছিলাম, আপনি রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যাবেন। কোনোদিন বলিনি, আজ বলছি, খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। আচ্ছা সেদিন থেকে গেলেন না কেন? আমি বললাম, তুমি থাকতে বললে না কেন? আমি বললে আপনি থাকতেন? অবশ্যই থাকতাম! আপনাকে থাকতে বলতে হবে কেন, আপনি নিজে থেকে গেলেন না কেন? সব কথা কি বলতে হয়?

তারপর তায়েবা আমার হাত ধরে বলল, দানিয়েল ভাই আপনাকে একটা কথা বলব, রাখবেন? আমি বললাম, বলো। আগে বলুন রাখবেন। আচ্ছা রাখব, এখন কথাটি বলো। আপনি আমাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলুন, চলুন আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। তার কথাটি শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তায়েবা পাগলামি করছে না তো। আমি তাকে কোথায় নিয়ে যাব। আর সে হাসপাতাল থেকে যাবেও তা কেমন করে। জবাব না দিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। সে আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, কী চুপ করে রইলেন যে? আমি বললাম, হাসপাতাল থেকে তোমাকে যেতে দেবে? আমি যদি যেতে চাই হাসপাতাল আমাকে ধরে রাখবে কেমন করে? সে ঝংকার দিয়ে উঠল আপনি আমাকে চেনেন না? চিনব না কেন, তায়েবাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে যখন কোনো কিছু করবে ঠিক করে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যেদিন আসাদ মারা যায় সে রিকশা করে হাসপাতাল থেকে আসছিল। হঠাৎ করে মিছিল দেখে বেরিয়ে পড়ে, একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল। আমরা কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারিনি। আমি মনে মনে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আজকেও যদি সে এরকম একটা কিছু করে বসে। আমি তো জানি তাকে আটকে রাখব এমন ক্ষমতা আমার নেই। আপাতত তাকে একটু শান্ত করার জন্য বললাম, আগে একটু বসো, আলাপ করি কোথায় যেতে চাও। একটা ব্যবস্থা নাহয় করা যাবে। সে জেদ ধরে রইল, না আমি ওভাবে পড়ে থাকব না। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। আমি বললাম, কোথায় নিয়ে যাব আগে বলো, তারপর নাহয় যাওয়া যাবে। সে জবাব দিল, আমাকে বলতে হবে কেন, আপনার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান। আমি যদি তোমাকে এ অবস্থায় এখান থেকে নিয়ে যাই, তোমার বোন, মা, ভাই এবং পার্টির লোকেরা আমায় কি আস্ত রাখবে? কোনো একটা কারণে যদি তোমার অসুখটা হঠাৎ করে বেড়ে যায়, সকলের কাছে আমি কী জবাব দেব। আমার মা, ভাই, বোন, পার্টির লোক কী মনে করবে, আমি দেখব, আপনি নিয়ে যাবেন কি না বলুন। তুমি তো জান, এখানে আমার নিজের থাকার জায়গাও নেই। তোমাকে আমি কোথায় নিয়ে যেতে পারি? সে বলল, অন্তত আপনি কোথাও আমাকে

বেড়িয়ে নিয়ে আসুন। এই হাসপাতালে থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। এখন কেউ নেই, এই সময়ে বেরিয়ে পড়াই উত্তম। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ড. মাইতির সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। তুমি একটুখানি অপেক্ষা করো। ড. মাইতির কাছে যাবেন কেন? আপনি যখন অর্চনাদিকে নিয়ে বেড়াতে যান, তখন কি ড. মাইতির পারমিশন চান? আমি বললাম, অর্চনাকে নিয়ে কখন আবার বেড়াতে গেলাম। এ উদ্ভট সংবাদ কার কাছে শুনলে? তায়েবা চোখের রাঙা পুতুলি দুটো দেখিয়ে বলল, ফের মিথ্যে কথা বলছেন, অর্চনাদি আমাকে নিজেই বলেছেন, অর্চনাদিকে নিয়ে আপনি বেলেঘাটা না কোথায় গিয়েছিলেন? আমি হেসে ফেললাম, ওহ্ সেই কথা বলো। বেলেঘাটাতে তার এক নকশাল বন্ধুর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। অর্চনা আমাকে বাসা চেনাতে নিয়ে গিয়েছিল। তায়েবা বলল, থাক আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনাকেও আমার চেনা হয়ে গেছে। তায়েবাকে আমি কোনোদিন সাধারণ মেয়েমানুষের সঙ্গে এক করে দেখিনি। আমি মনে করতাম, সে মেয়েলি ঈর্ষা, বিদ্বেষ এসবের অনেক উর্ধ্বে। আজকে তার অন্য একটা পরিচয় পেলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমি মনের মধ্যে একটা সংশয় লালন করে আসছিলাম তায়েবার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেটার ভিত কী? আমি তার অসুখকে উপলক্ষ করে তার পরিবার এবং পার্টির লোকদের বিরুদ্ধে মনে মনে অসংখ্য অভিযোগের যে খসড়া এঁকেছি তার একটা বাস্তব ভিত্তি পেয়ে গেলাম। আমার নালিশ করার অধিকার আছে, হ্যাঁ আছে একশোবার আছে। আমার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। হঠাৎ সে অতিকষ্টে বলে বসল, দানিয়েল ভাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেন। আমার কেমন জানি লাগছে। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার মুখে কোনো কথা নেই। ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

১২

সেপ্টেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমরা যারা কলকাতা শহরের ভাসমান প্রাণী, দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আড্ডা জমাচ্ছি, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছি, ঘরেরও না, ঘাটেরও না; সেই চূড়ান্ত সত্যটা ভুলে থাকার জন্য অষ্ট প্রহর এটা ওটায় ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই দিকচিহ্নহীন সময়প্রবাহ আমাদের সবাইকে ঠেলে একটা কঠিন জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। এতদিন আমরা জানতাম সীমান্তে একটা যুদ্ধ চলছে। ঠিক যুদ্ধটা কোথায় হচ্ছে, কারা করছে, সে বিষয়ে আমাদের একেবারে যে ধারণা ছিল না সেকথা সত্যি নয়। মাঝেমধ্যে আমরা সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে গিয়েছি। সেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি যেটুকু চলছে নিজেদের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে ট্রেনিং চলছে ঠিকই, কিন্তু এই ট্রেনিং থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নিরস্তিত্ব করে দিতে পারে এরকম একটা মুক্তিযুদ্ধ জন্ম নিতে পারে সেকথা প্রাণের ভেতর থেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আমাদের কোথাও কিছু নেই, সবকিছুই শূন্যের ওপর ঝুলছে। সবটাতেই ভারতের করুণার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ক্যাম্পে হাজার হাজার তরুণের মৃত্যুর সরল প্রস্তুতি,

অফুরন্ত মনোবল, আসন্ন সংগ্রামে সেটাই জাতিগতভাবে আমাদের সত্যিকার বিনিয়োগ। আমাদের ট্রেনিংরত মুক্তিযোদ্ধাদের জয়বাংলা রণধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যখনই ফেটে পড়েছে আমাদের শিরার রক্ত চলকে উঠেছে। সেই প্রেরণাদীপ্ত পরিবেশে যতক্ষণ থেকেছি, সমস্ত জাগতিক হিসেব-নিকেশ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আমরা বিশ্বাস করেছি আমরা জয়ী হব। জয়ী হব এই বিশ্বাসটুকুও যদি না রাখতে পারি, তা হলে আমাদের অস্তিত্বের মূল্য কী? এই কলকাতা শহরে আমরা কী করতে এসেছি। সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত সংশয়কে সবলে তাড়িয়ে দিয়ে মনের মধ্যে একটা আশাবাদের শিখা প্রাণপণ প্রয়াসে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে রাখতে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। আমরা জয়ী হব, আমাদের জয়লাভ করতে হবে। এই আশাটুকু না রাখতে পারলে মানুষের শরীর ধরে হেঁটে বেড়ানোর কোনো মানে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু একটা হিসেবি মনও তো ছিল। সেটা মাঝে মাঝে ভয়ানকভাবে বেঁকে বসত। ক্যাম্পের বাস্তব অবস্থা দেখে মনটা দমে যেত। পর্যাপ্ত খাবার নেই, গোলাবারুদ নেই। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালে, ক্যাম্পে সে অস্ত্র এসে পৌঁছুতে অনেক সময় সপ্তাহ, পক্ষ এমনকি মাস পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। কোনো সময় আদৌ পৌঁছাত না। নির্দেশনার প্রশ্নে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশী নেতৃত্বের মতবিরোধ লেগেই রয়েছে। থিয়েটার রোডের অস্থায়ী সরকারের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে বারবার নালিশ করেও সদুত্তর পাওয়া যেত না। প্রায় সবগুলো ক্যাম্পে একটা যাচ্ছেতাই অবস্থা। তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য অনেক সময় ক্যাম্প কমান্ডারেরা গামছায় কিছু গ্রেনেড বেঁধে দিয়ে বলত, যাও চোরাগোপ্তাভাবে পাকিস্তানি সৈন্যের ওপর আক্রমণ করো, রাজাকারদের খতম করো, তারপর ফিরে এসো। এভাবে শুধুমাত্র কিছু গ্রেনেডসহ তরুণ ছেলেদের দেশের ভেতরে পাঠানো যে প্রকারান্তরে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া একথা ক্যাম্প কমান্ডারেরাও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী? অতগুলো জোয়ান ছেলে ক্যাম্পে বসে থাকলে একসময়ে নিষ্ক্রিয়তা এসে ভর করবে। তখন তাদের মধ্যে কোনোরকমের গতি সৃষ্টি করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যে-কোনো রকমের অ্যাকশনের মধ্যে অন্তত একাংশকে ব্যস্ত না রাখতে পারলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

ক্যাম্পে গেলেই সকলে থিয়েটার রোডের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গালাগাল করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গণপ্রতিনিধিদের সংযোগ সমন্বয় খুবই ক্ষীণ। তাঁরা যে ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যান না তাও ঠিক নয়। মাঝে মাঝে সরকারের তরফ থেকে কেউ না কেউ যান। সব সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন না একজন তাঁদের সঙ্গে থাকেন। বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারেন না। ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় পারেন না। তাঁদের অবচেতন মনে সব সময় একটা ভীতি কাজ করে। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা তাঁদেরকে অন্যরকম কিছু মনে করেন। গণপ্রতিনিধিদের এই আঁটোসাঁটো দায়সারা মনোভাব মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাদের বেশির ভাগই আশা করে তারা যেভাবে প্রাণ দেয়ার জন্য এক পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের যাঁরা নেতা তাঁদের মধ্যে সেরকম খাঁটি জঙ্গি মনোভাব দেখতে পাবে।

তার বদলে যখন নাদুসনুদুস নেতারা স্নো-পাউডারচর্চিত মুখমণ্ডল এবং স্নিগ্ধ তেলঢালা শরীর নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পেছন পেছন হাজির হয়ে জনসভায় বক্তৃতার ঢঙে হাত উঠিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর নকল করে বলতে থাকেন, ভাইসব তোমরা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে। তোমরাই বাংলা জননীকে মুক্ত করবে। সেই দামাল ছেলেরা তখন তাঁদের অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে শালা বানচোত বলে গালাগাল করে। মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং সেক্টরগুলোর কমান্ডারদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। সর্বাধিনায়ক বুড়ো জেনারেল ওসমানী সত্যিকার যুদ্ধের চাইতে মিলিটারি আদব কায়দার প্রতি অত্যধিক যত্নশীল। যুদ্ধের কাজের অগ্রগতির চাইতে তাঁর হুকুম পালিত হল কি না প্রায় সময়ে সেটাই তাঁর মনোযোগের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাধিনায়ক এবং সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ কোনো কোনো সময়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে ওসমানী সাহেব তাঁর দীর্ঘ গোঁফে তা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু করার আছে সেকথা চিন্তা করতে পারেন না। যে যার মতো করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছেন, কারো পরিকল্পনার সঙ্গে কারো পরিকল্পনা মিলছে না। প্রায়ই সময়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয়েরা বাংলাদেশ কমান্ডের সঙ্গে কোনোরকমের যোগাযোগ না করেই বাংলাদেশী যুবকদের আলাদাভাবে ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সমস্ত ক্যাম্পে ক্ষোভ এবং অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। ওটা কেন ঘটছে থিয়েটার রোডে তাজুদ্দীন সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠিয়েও কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

থিয়েটার রোডের অস্থায়ী সরকারের কার্যালয়ে তাজুদ্দীন সাহেব যে খুব সুখে আছেন, সেকথাও ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ দলটির মধ্যে কোন্দলের অন্ত নেই। তাজুদ্দীন সাহেব অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আওয়ামী লীগের উচ্চাভিলাষী নেতাদের অনেকেই তাঁর ওপর বিরক্ত। সুযোগ পেলেই তাঁকে ল্যাং মারার তালে আছে। ভারত সরকার তাজুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু তিনি যে গোটা পরিস্থিতিটা সামাল দিতে পারবেন, তাঁর ওপর এই আস্থা স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীরও নেই। ভারত সরকার তাজুদ্দীনবিরোধীদেরও হাতে রাখার চেষ্টা করছে। তাজুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। নিজের স্বাধীনভাবে কোনোকিছু করার ক্ষমতা বিশেষ নেই। সব সময় ভারত যা বলছে, সায় দিতে হচ্ছে, যা চাপিয়ে দিচ্ছে তাই মেনে নিতে হচ্ছে। ভারতের মাটিতে প্রকাশ্যে তাজুদ্দীনের বিপক্ষে কেউ কিছু বলতে সাহস না করলেও আওয়ামী লীগের একাংশ আমেরিকার মাধ্যমে গোপনে ইয়াহিয়া খানের সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ সালাপ চালাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাদের যুক্তি একটাই ভারত কখনো বাংলাদেশের হয়ে যুদ্ধ করবে না, সুতরাং ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস মীমাংসায় আসাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী করতে যাচ্ছেন কেউ জানে না। ভারতীয় জনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অনুকূলে এবং বেশির ভাগ ভারতীয় জনগণ চায় শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদান করুন। কিন্তু যুদ্ধ করতে বললে তো যুদ্ধ করা যায় না। শ্রীমতী অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন। বিশ্বজনমত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতায় শিউরে উঠেছে একথা সত্যি,

কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বজনগণের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে শ্রীমতী গান্ধী একটা যুদ্ধ কাঁধে নিতে পারেন না। পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা আছে, আছে চীন। এই দুটো শক্তিশালী দেশ বারবার নালিশ করে আসছে ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে দুটুকরো করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একাংশকে তার ভূখণ্ডের মধ্যে ডেকে নিয়ে অনর্থক ওই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুলেছে। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশও পাকিস্তানের অবস্থানকে সমর্থন করে। ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ মনে করে চিরশত্রু পাকিস্তানকে চিরদিনের মতো দুর্বল করার এই একটা মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীর অনতিবিলম্বে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া উচিত। আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা থেকে তো আর যুদ্ধ বাধানো যায় না। সত্যি বটে পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কাজে ভারতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে। যদি একটা যুদ্ধ সত্যি সত্যি লাগে, পাকিস্তানের মিত্র চীন কিংবা আমেরিকা যদি পাকিস্তানের সমর্থনে এগিয়ে আসে, তা হলে একটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা এড়ানো অসম্ভব। ভারতবর্ষ কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একটা বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আপন কাঁধে নিতে পারে, বোধ করি শ্রীমতী গান্ধী চাইছিলেন যুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের সংকটের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হোক।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ভারতে চলে এসেছে। তার মধ্যে প্রায় আশি লক্ষ হিন্দু। যদি তাড়াতাড়ি কিছু একটা সমাধান খুঁজে বের করা না হয়, যেসকল মুসলমান ভারতে এসেছে তাদের অনেকেরই মনোবল ভেঙে যাবে। অন্য দিকে ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে শরণার্থীদের ডাকছে তোমরা ফিরে এসো। কোনো ভয় নেই। একটা সময় আসতে পারে মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ দেশে ফেরত চলে যেতে চাইবে। তখন ভারত অনেক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে। যা-কিছু করার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। যদি ভারত একটা যুদ্ধ মাথায় নেয় চীন আমেরিকা যে পাকিস্তানের সপক্ষে ছুটে আসবে না সে ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। একটা পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানের বন্ধুদের চাপে যদি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হয়, ভারতের লোকসান হবে অনেক বেশি। তখন পাকিস্তান এই আশি লক্ষের মতো হিন্দুকে ফেরত নিতে চাইবে না। আশি লক্ষ বাড়তি মানুষের চাপ সহ্য করতে গিয়ে ভারতের দম বেরিয়ে যাবে। শ্রীমতী গান্ধী একটা বিরাট মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন, যদিও তাঁর আচার-আচরণে সেকথা বোঝার উপায় নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বৃহত্তর শক্তির চাপে যদি মাঝপথে থামিয়ে দিতে বাধ্য হতে হয়, সবদিক দিয়ে ভারতের ক্ষতি হবে সবচাইতে বেশি। তখন এক পাকিস্তানের বদলে দুই পাকিস্তানের সৃষ্টি হবে। পূর্ব পাকিস্তানে একজনও হিন্দু অধিবাসী থাকবে না। ভারতের হাজার সমস্যা। তার ওপর যদি ওই আশি লক্ষ মানুষের বোঝা তার ওপর চাপে, ওই বাড়তি জনসংখ্যার চাপে ভারত থেঁতলে যাবে।

ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের লোকদের সঙ্গে যদি একটি সমঝোতায় এসে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করতেন, শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতেন, মানে মানে সমস্ত শরণার্থীকে ফেরত নিতেন, তা হলে সবদিক দিয়ে সেটাই হত উত্তম। ভারত ঘাড়ে একটা যুদ্ধ তুলে নেয়ার গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। শ্রীমতী গান্ধীর

জানার বাকি নেই, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে একটা আপস মীমাংসায় এলেও পাকিস্তান একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নিষ্ঠুর নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে, যে রক্তস্রোত বইয়েছে, যেভাবে অগ্নিসংযোগ এবং নরহত্যার আয়োজন করেছে, তাতে করে দুঅংশের জনগণের মধ্যে আস্থা এবং বিশ্বাসের শেষ সম্ভাবনাটুকু চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে আসন্ন সংকট হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান কখনো ভারতের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ভারত একটি দুর্বল পাকিস্তান চায়। বিনাযুদ্ধে যদি সে-উদ্দেশ্য পূরণ হয়, যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি খুঁজে পান না। তার পরেও শ্রীমতী গান্ধীর মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আশি লক্ষ হিন্দু পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বর আক্রমণের মুখে সব খুইয়ে প্রাণমাত্র সম্বল করে ভারতে পালিয়ে এসেছে, তারা নিরাপদে বসবাস করার নিশ্চিত নিরাপত্তা না পেলে কি পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যেতে চাইবে? যে-কোনো রাজনৈতিক সমাধান তাদের নিরাপদে দেশে ফেরার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা কি দিতে পারে? সেক্ষেত্রে তারা ভারতের মাটি থেকে কোনোক্রমেই দেশে ফিরতে চাইবে না। ভারত জোর করে তো হিন্দুদের ঠেলে দেশে পাঠাতে পারবে না। শ্রীমতী গান্ধী চোখ বুজলেই দেখতে পান একটি যুদ্ধ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার যত বিপদ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিপদ তার চাইতে অনেক কম। তিনি অনুভব করছিলেন, বল এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কোর্টে। ইয়াহিয়া খানের মাথায় যদি সুবুদ্ধির উদয় হয়, তা হলে হয়তো যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া আর কোনো বিকল্প তো তিনি দেখেন না।

ইসলামাবাদে বসে ইয়াহিয়া খান হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম চিন্তা করছিলেন। কার্যকারণ সবকিছু মিলিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কেননা তিনি সব সময় মদের নেশায় বিভোর থাকেন। সুন্দরী নারী এবং নর্তকী গায়িকা ছাড়া আর কারো কাছে স্বচ্ছন্দ হওয়ার ক্ষমতা তিনি ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছেন। যেটুকু চিন্তা করার ক্ষমতা এখনো অবশিষ্ট আছে, তাই দিয়ে মনে করেন তিনি একটা মরদের মতো কাজ করে ফেলেছেন। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যে-কাজটি করতে পারেননি তিনি একাই সে-কাজটি করে ফেলতে পেরেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার এমন সরল সমাধানের কথা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রপ্রধান চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেননি। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে এক কোটিরও বেশি হিন্দু বসবাস করে, সেটাই পূর্ব পাকিস্তানের আসল সমস্যা। এই হিন্দুদের প্ররোচনাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদ সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে। অস্ত্রের মুখে তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে ভারতে ঠেলে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল তিনি চিরদিনের মতো উৎপাটন করে ফেলেছেন। হিন্দুরা যখন নেই, আস্তে আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি পরিবেশ ফিরে আসবে। তিনি মনে করেন আরো একটি গ্রন্থিল এবং জটিল সমস্যার সমাধান তিনি প্রায় করে এনেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সবসময় আন্দোলন করে, কারণ সেখানে অনেক মানুষ। এই চিলতে একটু মাটি। সেখানে বসবাস করে কোটি কোটি মানুষ, পিঁপড়ের মতো পিলপিল করছে মানুষের সারি। প্রায় এক কোটি

মানুষকে তিনি অস্ত্রের মুখে সরিয়ে দিতে পেরেছেন। এই এক কোটি মানুষের বাড়িঘর, জমিজমা ব্যবসায় বাণিজ্য সব অন্যদের দখলে চলে যাবে। তাদের গায়েগতরে একটু হাওয়া লাগবে। তারা হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারবে। এই বাড়তি জমি বাড়ি ঘর পাওয়ার পর তাদের অসন্তোষ অনেক কমে আসবে। পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের প্রতি তাঁর মায়া হয়। তিনি মিছিমিছি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হাতের কাছে এমন সহজ সমাধান থাকা সত্ত্বেও আইয়ুব খান সাহেব কেন যে পূর্ব পাকিস্তানকে বাগে আনতে পারলেন না, তিনি বুঝতে পারেন না। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবেন কী বোকাই না ছিলেন আইয়ুব খান। অথচ তিনি কত সহজে সব সংকটের সমাধান প্রায় করে এনেছেন।

ইয়াহিয়া খান মাতাল হলেও তাঁর হিসেব খুবই পরিষ্কার। শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি কারাগারে পুরেছেন। থাকুক আরো কিছুদিন। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। যদি ইয়াহিয়া খানের কথা মানতে রাজি হন, ছেড়ে দেবেন। আর যদি বেঁকে বসেন দেশদ্রোহী হিসেবে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। আওয়ামী লীগের যে অংশটা দেশের মধ্যে আছে, তার একটা অংশকে খুন করা হয়েছে, একটা অংশকে জেলে পোরা হয়েছে এবং আর একটা অংশকে একেবারে সরাসরি তাঁবেদারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং দল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের কাছে যে সমস্ত দল সত্তুরের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল তাদের সবাইকে সাহস দিয়ে তিনি চাঙ্গা করে তুলেছেন। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি সমস্ত দক্ষিণপন্থী দল পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে উঠেপড়ে লেগেছে। শিগগির আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতারা ভারতে চলে যাওয়ার পর যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা তারা পূরণ করতে পারবে। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষকে দেখাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান তিনি করেছেন।

এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই পৃথিবীর মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিলেন ইয়াহিয়া খান সাহেব দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে উদ্ধার করেছেন। সামরিক একনায়ক হিসেবে কারো তাঁকে দুষতে পারা উচিত নয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বললেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী উঠিয়ে নিলে ভারত থেকে আগত দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে জনগণের জানমাল রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ইয়াহিয়া খান গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন খালি করছেন। আর ভাবছেন তাঁর মতো সুদক্ষ জেনারেল এবং প্রতিভাবান নেতা পৃথিবীতে বেশি নেই। তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ, তিনি বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করে ফেলতে পারেন। তাঁর সমস্ত জাগতিক বিষয়ে সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পরেও একটা জিনিস মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো জ্বলতে থাকে। ভারত যেসকল তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে, যারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে সৈন্যদের হত্যা করছে, পাকিস্তানের প্রেমিকদের বাড়িঘরে গ্রেনেড ছুড়ছে, ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করছে, পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে শায়েস্তা করার

জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে রাজাকার, আলবদর এবং আল শামস বাহিনী গঠন করেছেন। তারা এখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মাঠে নেমেছে এবং পাহারা দিচ্ছে। ভারত যত ইচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা পাঠাতে থাকুক, জান নিয়ে কেউ ফেরত যেতে পারবে না।

হ্যাঁ পৃথিবীর পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিওতে বিপুল পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানিদের ভারতে পালিয়ে যাবার কথা বলছে। এক কোটির মতো মানুষ গেছে। সুতরাং এই ধরনের কিছু কথা তো উঠবেই। কিন্তু ভারতে কারা গিয়েছে সেটা তো দেখতে হবে। ভারতে যারা চলে গেছে, তাদের তে. শতকরা পঁচাশি ভাগ হিন্দু। হিন্দুদের ভারত ডেকে নিয়ে গেছে। কেননা এই হিন্দুদের ডেকে নিয়ে ভারত পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধ্বংস করতে চায়। বাকি পনেরো ভাগ মুসলমান যারা ভারতে গিয়েছে, তাদের অধিকাংশই ভারতের অনুচর। আর কিছুসংখ্যক বিপথগামী। তথাপি পৃথিবীর মানুষ যদি বলে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিক, ইয়াহিয়া খান বলবেন, তারা ফিরে আসুক, যাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজের কোনো প্রমাণ নেই তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। কোনো ভয় নেই, শরণার্থীরা তাদের বাড়িঘরে ফিরে আসুক। ইয়াহিয়া খান সীমান্তের চৌকিগুলোর কাছাকাছি তাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলবেন। তিনি জানেন হিন্দুরা ফিরবে না। আর মুসলমান যারা গিয়েছে যদি ফিরে আসে খান সাহেবের তো আরো সুবিধে। তিনি পৃথিবীর মানুষদের সামনে দেখাতে পারবেন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু এবং ভারত সরকার মিলে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ভাঙার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। অন্যরা আসুক না-আসুক কিছু যায় আসে না। কিন্তু হিন্দুরা যে ফিরে আসবে না এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান সুনিশ্চিত। তিনি নতুন বোতলের সুরা গলাধঃকরণ করতে করতে ভাবেন এক ঢিলে তিন পাখি মেরে ফেলেছি। আমি আশি লাখ হিন্দুকে ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছি। তিনি ভাবেন আইয়ুব খানের মাথায় এ বুদ্ধি আসেনি কেন। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু না থাকলে আর কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেবে না। ভারত সব সময়ে পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছে। তার বদলে ইয়াহিয়া খান ভারতের ঘাড়ে এমন এক জনসংখ্যার বোঝা চাপিয়ে দিতে যাচ্ছেন, সে অর্থনৈতিকভাবে আর কখনো মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। মাঝে মাঝে তিনি অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। আর ভারত যদি যুদ্ধ করে সেখানেই তো আসল মজা। পাকিস্তানের বন্ধু আমেরিকা আছে, চীন আছে। তারা মদদ দিতে ছুটে আসবে। তবে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার খুব দহরম মহরম চলছে। ভাবে গতিকে মনে হচ্ছে যদি যুদ্ধ লাগে রাশিয়া ভারতকে সমর্থন করবে। তা করুক। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপার নিয়ে দুনিয়ার বড় বড় দেশগুলো একটা বিশ্বব্যাপী তৃতীয় মহাযুদ্ধ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেবে ইয়াহিয়া খান সাহেবের সেকথা বিশ্বাস হতে চায় না। ভারত-পাকিস্তানে একটি যুদ্ধ যদি লেগেই যায় বৃহৎ শক্তিগুলোর চাপে অল্পদিনের মধ্যেই থামিয়ে ফেলতে হবে। সে যুদ্ধে পাকিস্তান যদি বিশেষ সুবিধে করতে নাও পারে ইয়াহিয়া খান সাহেবের বিশেষ দুশ্চিন্তা নেই। তখন তিনি ভারতের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি করবেন। মধ্যস্থতা করতে আমেরিকা ছুটে আসবে। তথাকথিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটির কোনো গুরুত্বই থাকবে না। বাংলাদেশ বলে কিছু আছে নাকি? গোটা

ব্যাপারটাই ঘটছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে। মাঝখান থেকে বাংলাদেশের প্রশ্ন উঠবে কেমন করে? ভারত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসকল হিন্দুকে দেশের অখণ্ডতা ধ্বংস করার জন্য তার ভূখণ্ডে ডেকে নিয়েছে পাকিস্তান কস্মিনকালেও তাদের আর ফেরত নেবে না। আর যেসকল মুসলমান চলে গিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসতে চায় আসুক। ইয়াহিয়া খান সাহেব তাদের কথাটা ভেবে দেখবেন। তিনি গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করে উঠছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, হ্যাঁ সেই মেয়েমানুষটি। আমাকে ল্যাং মারতে চায়? তার লড়াই করার খায়েশ হয়েছে? আচ্ছা ঠিক হ্যায়, নজদিগ মে এক জঙ আগ্যায়া। ময়দান মে মোলাকাত হোগা।

মাঝখানে পরিস্থিতি একেবারে থিতিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। এভাবেই সবকিছু চলতে থাকবে। যেখানেই যাই, সর্বত্র থমথমে পরিবেশ, কী ঘটবে কী ঘটতে যাচ্ছে কেউ কিছু বলতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে যতই হতাশা বাড়ছে, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং দলাদলি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ওর বিরুদ্ধে বলছে, অমুক অমুকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কলকাতার মানুষেরা আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আর কত! বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, পার্কে, মাঠে, ময়দানে সর্বত্র জয় বাংলার মানুষ দেখে দেখে তাদের চোখ পচে গেছে। আমরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে ভীষণ সংকুচিত হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি। মানবিক মর্যাদা বোধটুকুও আস্তে আস্তে আমাদের লোপ পেতে বসেছে। লোহালক্কড় ফেলে রাখলে যেমন মরচে ধরে, আমাদের মধ্যেও তেমনি স্তরে স্তরে হতাশা জমে ক্রমাগত অমানুষ হয়ে উঠছি। আমরা বৌবাজারের হোস্টেলটিতে আট দশজন মানুষ থাকি। যখন এসেছিলাম, সকলের মধ্যে প্রাণখোলা সম্পর্ক ছিল। যতই দিন যাচ্ছে আমরা আর স্বাভাবিক থাকতে পারছিনে। তুচ্ছ সিগারেট নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। বালিশ, বিছানা, মশারি নিয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আমরাও দুতিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের এসব খুনসুটি দেখে হোস্টেলের ছাত্ররা হাসে। প্রকাশ্যে খারাপ মন্তব্য করতেও কেউ ছাড়ে না। অথচ আমরা যখন অভুক্ত অবস্থায় মুখে সাত পাঁচ দিনের আকামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, সকলে আমাদের বীরের সম্বর্ধনা দিয়েছিল, বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমাদের শরীরে ময়লা ছিল, জামাকাপড়ের যা অবস্থা ছিল বলার মতো নয়। কত মানুষ যেচে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে, কত বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। এখন কলকাতার জলহাওয়া লেগে আমাদের শরীরে লাবণ্য ফিরে এসেছে। অনেকেই ছিমছাম জামাকাপড় পরি। তথাপি কলকাতা শহরের মানুষ আমাদের প্লেগের জীবাণুর মতো এড়িয়ে চলে। কলকাতার জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তার জন্য আমরা দায়ী। ট্রাম, বাস, ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড় বাড়ছে, সে-জন্যও আমরা দায়ী। পার্ক মাঠ ময়দানের নির্জনতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সর্বত্র জয় বাংলার মানুষ গিসগিস করছে। কর্মহীন স্বপ্নহীন উদ্যমহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে আমরা একে অন্যের ওপর ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রতি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একই লোকের চেহারা দেখে দেখে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠেছি। একজনের মনের ময়লা অন্যজনের মনে লেগে লেগে স্রোতহীন বদ্ধকুয়োর পানির মতো আমাদের মনগুলোও দূষিত হয়ে পড়েছে। কলকাতা শহর যেন একটা উন্মুক্ত কারাগার। তার ভেতরে আমরা

ছেড়ে দেয়া কয়েদির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা সকালে কোথায় যাব, বিকেলে কোথায় কাটাব, সব একটা ছকের মধ্যে পড়ে গেছে। তবু আমাদের খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশের মানুষদের কাছে যেতে হয়। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাবে না তো কোথায় যাবে? যেখানেই থাকিনে কেন, সন্ধেবেলা পানের দোকানের সম্মুখে, ছোট ছোট রেস্টুরেন্টের দোরগোড়ায় স্বাধীন বাংলা বেতারে এম. আর. আখতার মুকুলের চরমপত্র পাঠ শোনার জন্য দাঁড়িয়ে যাই। কলকাতার মানুষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নবদ্বীপ হালদারের কমিক শুনে যেরকম মজা পায়, এম. আর. আখতার মুকুলের গলার আওয়াজ, বাংলা ভাষার রসিকতা, কথা বলার ভঙ্গি সবকিছু তেমনি উপভোগ করে। কিন্তু আমাদের কাছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এম. আর. আখতার মুকুলের চরমপত্রের আবেদন ভিন্নরকম। বাংলাদেশের ব্যাপারে সকলের উদাসীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তথাপি এম. আর. আখতার মুকুল যখন স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানে চরমপত্র পাঠ করেন তখন দোকানের সামনে আস্তে আস্তে লোক জমতে থাকে, তখন দোকানির আওয়াজটা বাড়িয়ে না দিয়ে উপায় থাকে না। লোকজন শোনে আর মুকুলের কড়া রসিকতা চিবিয়ে চিবিয়ে উপভোগ করে। এম. আর. আখতার মুকুল ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছেন, গানবোট ডোবাচ্ছেন, সৈন্যভর্তি ট্রেনসহ ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছেন, সেনা ছাউনিতে ছাউনিতে ত্রাসের সঞ্চার করছেন। এ পর্যন্ত তিনি যত পাকিস্তানি সৈন্য খুন করেছেন, যত জখম করেছেন, যত ট্যাঙ্ক অচল করেছেন, যত কনভয় ধ্বংস করেছেন সব মিলিয়ে যোগ করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে, তাতে করে একজনও পাকিস্তানি সৈন্য বাংলার মাটিতে থাকার কথা নয়। তার পরদিন সন্ধেবেলা আবার সৈন্য মারতে আসেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবি এত সৈন্য তিনি কোথায় পান। আমরা জানতাম, এম. আর. আখতার সাহেব যা বলছেন, তার দু-শতাংশও যদি সত্য হত, তা হলেও আমাদের যুদ্ধের পরিস্থিতি এরকম হওয়ার কথা নয়। সব মিথ্যে জেনেও আমরা পরের দিনের চরমপত্র পাঠ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আর কোথাও তো কেউ কিছু করতে পারছে না। অন্তত একজন মানুষ আছেন, যিনি কল্পনায় পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা করতে পারেন, ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিতে পারেন, বাক্যের মন্ত্রশক্তিতে বাংলার সপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য খরস্রোতা নদী, সুন্দরবনের বাঘ, বিষাক্ত সাপ, ঝাঁক বাঁধা মশা, ভাটি অঞ্চলের প্যাঁক কাদা পশুপক্ষী সবকিছুকে প্রতিরোধ সংগ্রামের ভূমিকায় শরিক করে নিতে পারেন। কার্যক্রম যতই অপ্রতুল হোক না কেন, এম. আর. আখতারের কণ্ঠ শুনে মনে একটা বিশ্বাস ঘনিয়ে উঠত। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের নদী, আমাদের বনাঞ্চল, আমাদের বাঘ, সাপ, আমাদের প্যাঁক কাদা পাকিস্তানি সৈন্য ধ্বংস করার অলৌকিক ক্ষমতা রাখে। কোথাও যখন কিছু ঘটছে না, কেউ কিছু করছে না আমরা এম. আর. আখাতার মুকুলের ওপর ভরসা ছাড়তাম না। আগামীকাল তিনি নতুন আক্রমণ এবং নতুন বিজয়ের কথা শোনাবেন। ডুবন্ত মানুষ তো প্রাণপণ শক্তিতে ভাসমান তৃণখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে।

হঠাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে একটা গতির সঞ্চার হল। কথাটা বোধ হয় সঠিক বললাম না। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের একটা নতুন মোড় নিল। ভারতের দূত ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি দেশে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ

করল। পাকিস্তানও বসে নেই। ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি ইউরোপীয় দেশগুলোতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং পাকিস্তানের অবস্থান সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ নয়াদিল্লিতে ঘনঘন যাওয়া আসা করছেন। বৈঠক করছেন। পত্রপত্রিকায় সেসকল সংবাদ ছাপা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বোধ করি মনস্থির করে ফেলেছেন, তাঁকে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাঁর কথাবার্তা, বিবৃতি, ভাষণের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কার ফুটে উঠছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের বেগও তীব্র হয়ে উঠেছে। কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলো খবর দিতে আরম্ভ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। পাউরুটির ভেতর ছুরির মতো পাকিস্তানি সৈন্যের বেষ্টনী ভেদ করে তারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তান রেডিও এ-কথা স্বীকার করে নিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করে নাশকতামূলক কাজকর্ম করে পালিয়ে যাচ্ছে। বি. বি. সি. এবং ভয়েস অব আমেরিকাও বলতে আরম্ভ করেছে, মুক্তিযোদ্ধারা সত্যি সত্যি দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে এখানে সেখানে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। আইয়ুব খানের সময়ের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা বাড়িতে ঢুকে গ্রেনেড ছুড়ে হত্যা করেছে। ভেড়ামারা কুষ্টিয়া, রংপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, বরিশাল এসকল অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী পিছু হটে এসেছে। বি. বি. সি.-র সংবাদদাতা আরো খবর দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যভর্তি লরিগুলো দিনেরাতে সীমান্ত অভিমুখে ছুটছে। সৈন্যরা সীমান্তের কাছাকাছি এলকায় বাঙ্কার নির্মাণ করছে এবং ট্রেঞ্চ কাটছে।

এরই মধ্যে একদিন শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত রাশিয়া সফরে গেলেন। ভারত এবং রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়ে গেছে সেটা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। রাশিয়ার কথাবার্তার মধ্যেও ভিন্ন একটা সুর লক্ষ করা যাচ্ছিল। বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং প্রেসিডেন্ট পদগর্নি সব সময়ে ইয়াহিয়া খানকে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার অনুরোধ করে আসছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফরের পর থেকে রাশিয়ান নেতাদের মন্তব্যের ধরনও বেশ পালটে গেল। ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। দুই দেশের যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রথম বারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব-বাংলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাশিয়া থেকে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিক্সনের সঙ্গে দেখা করলেন, বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছেন বলে মনে হল না। নিক্সন প্রশাসনের কাছ থেকে কোনোরকম ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলেন। নানা জায়গায় বক্তৃতা দিলেন। পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসে তিনি পশ্চিম জার্মানি সফর করলেন। তারপর ফ্রান্স এবং সবশেষে ইংল্যান্ড। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তির পরও শ্রীমতী পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন কেন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে তার কারণ অস্পষ্ট রইল না। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করে পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থের

পরিপন্থী কোনোকিছু করতে যাচ্ছেন না সে আশ্বাসটা ওসকল দেশের সরকার এবং জনগণের সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানও বসে নেই। ইয়াহিয়া খান চীন-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে দূতিয়ালি করছেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে উড়ে বেইজিং-এ পৌঁছেছেন। সেখানে চৌ এন লাই এবং মাও সেতুঙের সঙ্গে চীন-মার্কিন সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়টি পাকাপাকি করে ফেলেছেন। ইয়াহিয়া খান ধরে নিয়েছেন চীন-মার্কিন সম্পর্কোন্নয়নে ইয়াহিয়া খান যেহেতু মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করেছেন, তাই পাকিস্তানের বিপদের দিনে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বরাবর পাকিস্তানি অবস্থানের পক্ষেই কথা বলে আসছিলেন। আর চীন তো খোলাখুলি ভারতকে আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে অনেকদিন থেকেই ধমক দিয়ে আসছে। তবে একটা মজার ব্যাপার চীনা ড্রাগন শুধু লম্ফঝম্প করে, গর্জন করে কিন্তু সরাসরি কামড় দিতে ছুটে আসে না।

ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলি খান ভুট্টো সাহেবের নেতৃত্বে চীনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছেন। চীনা নেতারা ভোজসভায় অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। খোদ চৌ এন লাই আশ্বাস দিয়েছেন পাকিস্তান যদি ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হয় চীন পাশে এসে দাঁড়াবে। ভুট্টো সাহেব দেশে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেছেন তাঁর চীন সফর শতকরা একশো ভাগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

ভারত পাকিস্তানে সাজো সাজো রব চলছে। বাংলাদেশ ভারতের নৌকায় পা রেখেছে। সুতরাং ভারত যা করে বাংলাদেশকে অম্লানবদনে মেনে নিতে হবে। তার পরেও ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত একটি যুদ্ধ ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে। ভারতের স্বার্থ থাকে থাকুক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে ফিরে যেতে চাই এবং মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেখতে চাই। তার পরেও একটা প্রশ্ন যখন মনফুঁড়ে জেগে ওঠে, নিজের কাছেই নিজে বেসামাল হয়ে পড়ি। বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উনিশশো আটচল্লিশ থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। আসন্ন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটিই কি বাঙালি জাতির বিগত বাইশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের একমাত্র ফলাফল? এই যুদ্ধে হয়তো ভারত জয়লাভ করবে এবং ভারতের সহযোগিতায় আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হব। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এই পরিণতি। এটাই কি আমরা চেয়েছিলাম? কী জানি, ইতিহাস কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। আমাদের বাবারা পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন, আর আমরা পাকিস্তান ভাঙছি। এই যুদ্ধ সংঘাত রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাস কোন ভবিষ্যতের পানে পাড়ি দিচ্ছে কে জানে!

১৩

মাঝখানে তিনদিন হাসপাতালে যেতে পারিনি। ভেতর বাইরের চাপে একরকম হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। চারদিনের দিন হাসপাতাল যেয়ে যা শুনলাম তাতে আমি

তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। এই তিনদিনে তায়েবার অসুখ বাড়াবাড়ি রকমের বেড়ে গিয়েছিল। পরশুদিন তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যেতে হয়েছে। ডাক্তারেরা কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না। হাসপাতালের সামনে সেই মহানিম গাছের চারপাশের বাঁধানো গোলাকার চক্রটিতে সবাই বসে আছে। জাহিদুল, ডোরা, দোলা, হেনাভাই আরো দু-চারজন আত্মীয়স্বজন। দূরে একাকী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তায়েবার মা। এই বর্ষীয়সী মহিলাকে এইভাবে ভিড় থেকে দূরে একেবারে একাকী বজ্রাহত তরুর মতো বসে থাকতে দেখে আমার বুকটা আশঙ্কায় ধুকপুক করে উঠল। আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মহিলা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের কোনায় অশ্রুরেখা। আঁচলে মুছে নিয়ে বললেন, এই তিনদিনে তুমি একবারও হাসপাতালে আসনি। তোমার কি জ্বরজারি কিছু একটা হয়েছিল? আমি না বলতে যেয়েও পারলাম না। আমার অসুখবিসুখ হয়নি অথচ আমি আসিনি জানালে মহিলা ব্যথিত হবেন। তাই বললাম, আমার জ্বর হয়েছিল। মহিলা কিছু বললেন না। আমি তাঁর পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম।

একটু একটু শীত করছিল। হাসপাতালের লোকজন কমে আসতে শুরু করেছে। সন্ধেবেলা আলো জ্বলে উঠেছে। আমরা বাইরে বসে আছি, কী করব জানিনে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন ভূতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তায়েবাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। সকলেই জেনে গেছে তার আর বেশি সময় নেই। আমি দুহাতে মাথা ঢেকে তায়েবার এই পরিণতির জন্য কে দায়ী চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম। তায়েবার এই অকালমৃত্যুর জন্য আমি জাহিদুলকে মনে মনে দায়ী করলাম। পরক্ষণে ভাবলাম জাহিদুল দায়ী হতে যাবেন কেন? জাহিদুলের দোষ কী? জাহিদুল ডোরাকে বিয়ে করেছেন বলে তায়েবাকে মরতে হবে এটা কেমন করে হয়। তা হলে ডোরাই কি দায়ী? বিচার করে দেখলাম, ডোরারওবা কসুর কী? সে তো কাউকে না কাউকে বিয়ে করতই। জাহিদুলকে বিয়ে করে অন্যায়টা কী করেছে। তার ফলে তায়েবা মরতে যাবে কেন? হেনাভাই তায়েবার খোঁজখবর না নিয়ে নিজে একটা বিয়ে করেছেন বলেই কি তায়েবা মরতে বসেছে? হেনাভাই বিয়েটা না করলে তায়েবা বেঁচে থাকত তার নিশ্চয়তা কী? তা হলে তায়েবার মা-ই তার মৃত্যুর কারণ? খুব খুঁটিয়ে চিন্তা করার পর একটি জিনিস আবিষ্কার করলাম, মহিলা তায়েবার ঘাড়ে অত্যধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছিলেন, তাই বলে কি তায়েবাকে মরতে হবে? তা হলে দায়ী কে? তায়েবা কলকাতা এসেছিল, তাই কি তাকে মরতে হচ্ছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু না হলে তাকে কলকাতা আসতে হত না। এই স্বাধীনতা সংগ্রামই কি তায়েবার মৃত্যু ঘটাতে যাচ্ছে? আমি স্বাধীনতা সংগ্রামকেও-বা কেমন করে দায়ী করি? তা হলে তায়েবার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? তায়েবার মৃত্যুর জন্য কেউ না কেউ একজন তো দায়ী হবে। কাউকে দায়ী না করে আমার মন শান্তি পাচ্ছিল না তখনই আমার মনে পড়ে গেল, তায়েবা নিজের মুখে বলেছে, সে আমাকে ভালোবাসে, তা হলে আমিই কি তায়েবার মৃত্যুর জন্য দায়ী?

হাসপাতালের সামনের রাস্তায় হঠাৎ আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে তাকালাম। চারজন মানুষ একখানি খাটিয়ায় করে একটা শাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলে একসঙ্গে হরিবোল বলে চিৎকার করছে। এই দৃশ্যটা দেখে আমার মধ্যে

একটা দার্শনিক নির্লিপ্ততা জন্ম নিল। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যটা আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। মৃত্যু সর্বব্যাপী ওত পেতে রয়েছে। কেউ কারো জন্য দায়ী নয়। আমি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম, হেনাভাই এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর ডাকলেন, দানিয়েল এদিকে এসো। তিনি আমাকে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসালেন। বললেন, চা খাও। কাপে যেই চুমুক দিয়েছি, হেনাভাই বললেন, দেখি তোমার একটা চারমিনার দাও। সিগারেটটা ধরিয়ে বললেন, শোনো দানিয়েল আজ তোমাকে একটা কথা বলব। আমি বললাম, বলুন। তিনি বললেন, আগে চা-টা শেষ করো। আমি যখন সিগারেট ধরিয়েছি, তিনি বললেন, শোনো তিনদিন তুমি হাসপাতালে আসনি। এই তিনদিন তায়েবার কী কষ্ট হয়েছে সে আমি বলতে পারব না। গত পরশুদিন রাতে সে তিনবার জ্ঞান হারিয়েছিল। প্রতিবারই জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে তোমার কথা জিগগেস করেছে। তুমি বোধহয় এরই মধ্যে জেনে গেছ আমার বোনটি বাঁচবে না। তোমাকে যে-কথাটি আমি বলার জন্য ডেকেছি, তিনি একটুখানি ইতস্তত করলেন। হাতের পোড়া সিগারেটটি ফেলে দিয়ে আমার কাছ থেকে আরেকটি সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরালেন। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কোনো গোপন কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বললেন, আমার বোনটি তোমাকে খুবই ভালোবাসে। আমার কাঁধে হাত রাখলেন, ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সে আর বাঁচবে না। তাঁর চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করে উঠল। আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

আমরা হাসপাতালে ফিরে এলাম। এসে দেখি সে মহানিম গাছটির গোড়ায় কেউ নেই। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওরা সব গেল কোথায়। এই যে দানিয়েল সাহেব এইদিকে আসুন। লাল কংক্রিট বিছানো পথ বেয়ে ড. মাইতি হাসপাতালের গেটের দিকে যাচ্ছেন। আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, চলুন, আপনাকে খুঁজছিলাম। আমি ড. মাইতির পেছন পেছন তাঁর কোয়ার্টারে গেলাম। তিনি ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর স্টেথিসকোপ রাখলেন। তারপর বললেন, দানিয়েল সাহেব বসুন, আজকে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি। তিন-চারদিন থেকে আপনার দেখা নেই। আমি তাঁর উলটোদিকের সোফায় গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, দিন দেখি আপনার একটা চারমিনার। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই আমার সিগারেটের নেশা চেপে যায়। আমি প্যাকেটটা বের করে দিলাম। তিনি একটা ধরিয়ে খকখক কাশলেন এবং গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর, বলুন আপনাদের যুদ্ধের সংবাদ। সহসা ড. মাইতির কথার কোনো জবাব দিতে পারলাম না। তাই ফ্যালফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, আপনাদের যুদ্ধের সংবাদ আমার কাছ থেকে শুনুন। আপনারা খুব শিগগির দেশে চলে যাবেন এবং আপনাদের দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। এখন বলুন, আপনার আনন্দ হচ্ছে কি না। আমি বললাম, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে এবং আমরা দেশে ফিরে যাব। তিনি বললেন, এটাই তো আপনারা চেয়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, ড. মাইতি অন্য কিছু একটা বলতে চান, যুদ্ধসংক্রান্ত কথাগুলো ভণিতা মাত্র। আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত দুঃখের কোনো কিছু হয়তো বলবেন। আমার বর্তমান যা মানসিক অবস্থা কেউ যদি বলে আগামীকাল

সূর্য নিভে যাবে বোধহয় কোনো ভাবান্তর ঘটবে না। আমি মনে মনে বিরক্তি অনুভব করছিলাম। ড. মাইতি আমাকে আসল কথাটি না বলে ধানাইপানাই করছেন কেন। আমি জিগগেস করলাম, আপনি তায়েবার ব্যাপারে কিছু বলবেন? ইনটেনসিভ কেয়ারে সে কেমন আছে? ড. মাইতি টেবিল থেকে পেপারওয়েটটি উঠিয়ে নিয়ে ঘুরাতে থাকলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট তাই করে গেলেন। তারপর টেবিলের ওপর রেখে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করলেন, কোনো মূল্যবান জিনিস পেতে হলে দাম দিতে হয়, একথা আপনি বিশ্বাস করেন? আমি বললাম, অবশ্যই বিশ্বাস করি। সুতরাং আপনাকেও দাম দিতে হবে, মনে মনে প্রস্তুত হোন। আমি বললাম, একটু বুঝিয়ে বলুন, আমি এমন মূল্যবান কী বস্তু পেতে যাচ্ছি, যার জন্য দাম দিতে আগেভাগে প্রস্তুত হতে হবে। ড. মাইতি বললেন, ওই যে বললাম, আপনারা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছেন। আমি জবাব দিলাম, আমরা কি দাম দিইনি? তিনি বললেন, আপনার দেশের মানুষ দাম দিয়েছে, আপনি এখনো কোনো দাম দেননি। শুধু কলকাতা এসেছেন। আপনার কোনো পার্সোনাল ট্র্যাজেডি নেই। আপনার পার্সোনাল কন্ট্রিবিউশনের কোটা শূন্য। এইবার ঈশ্বর আপনাকে সে লজ্জা, সে অপমান থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন।

ড. মাইতির কথায় আমি চমকে উঠলাম। না না ড. মাইতি অমন করে বলবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে তায়েবা কেমন আছে, সেটা বলুন। অত উতলা হচ্ছেন কেন, আপনাকে তায়েবার কথা বলার জন্যই তো ডেকে এনেছি। একটু ধৈর্য ধরুন। বিএ ম্যান। তায়েবার অবস্থা এখন একটু ভালো। তাকে একটু আগে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সেই ব্রিদিং ট্রাবলটা এখন অনেক কন্ট্রোলড কিন্তু এটা স্থায়ী হবে না। অ্যাট এনি মোমেন্ট শি ক্যান গেট ব্যাক টু হার প্রিভিয়াস পজিশন। ইউ আর এ সিরিয়াস পার্সন অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ সিরিয়াসলি। আপনাকে একজন বন্ধু মনে করি। তাই বলছি, শি উইল নট লাস্ট ভেরি লং। বাট উই প্রে টু লর্ড সো দ্যাট হি গ্রান্টস হার লংজিবিটি টিল দ্যা ফ্রিডম অব বাংলাদেশ ইজ অ্যাচিভড। ড. মাইতি উঠে দাঁড়ালেন। আপনাকে চা দিতে বলি। আমি কাপড় ছাড়ি। আমি বললাম, ড. মাইতি এখন চায়ের ঝামেলা করে লাভ নেই। আমি যাই। অলরাইট আসুন। কিন্তু তিনি সাবধান করে দিলেন, বাট ইউ শুড নট ভিজিট হার টু ফ্রিকোয়েন্টলি, আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব ইমোশনাল। শি নিডস কমপ্লিট রেস্ট অ্যান্ড ফুল ট্রাঙ্কুয়িলিটি। সো টেক কেয়ার। অ্যাট দিস স্টেজ ইউ আর এ লায়াবলিটি টু হার।

ড. মাইতির কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি এরই মধ্যে নিজে কতটুকু বদলে যাচ্ছি সেকথা চিন্তা করে দেখলাম। তাঁর মুখে তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে সে সংবাদটি শুনেছি। এত বড় একটা দুঃসংবাদ শোনার পরও আমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হল না। আমি দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারছি। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু সামাল দিতে পারছি। আমার মানসিক ধৈর্য দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এই যুদ্ধ তলায় তলায় আমাকে কতটুকু বদলে দিয়েছে। সেই নিভৃত পথটুকু অতিক্রম করার সময় আমার চেতনায় ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজতে থাকল তায়েবার মৃত্যুদণ্ড তো ঘোষণা হয়ে গেছে। কিন্তু চূড়ান্ত ঘটনাটি কখন ঘটবে সেই তারিখটা জানায়নি। আমার মন বলল,

ওয়েল ইট ক্যান হ্যাপেন অ্যাট এনি মোমেন্ট। নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো আমি সেই নির্জন পারিবারিক রাস্তাটুকু অতিক্রম করে কখন বড় রাস্তায় এসে পড়েছি খেয়াল করতে পারিনি। আমার পেছনে হঠাৎ ঘটাং করে একখানা গাড়ি ব্রেক করল। ট্যাক্সি থেকে শিখ ড্রাইভার নেমে এসে দুটি সবল লোমশ হাতে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে বলতে গেলে একেবারে রাস্তার ওপর ছুড়ে দিল। তারপর গালাগালি দিতে থাকল, শালে লোক মরনেকা আওর কুয়ি মওকা নেহি মিলা। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সর্দারজি তার হাতের একটা প্রবল থাবা আমার কাঁধে বসিয়ে পুনরায় গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেল। গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমার চেতনা হল, আমি এই গাড়ির তলায় চাপা পড়তে যাচ্ছিলাম। সর্দারজির কৃপায় এযাত্রা বেঁচে গেছি। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এড়িয়ে আসার পরও আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারলাম না।

আমি রাস্তার ওপর দঁড়িয়ে চিন্তা করতে থাকলাম, এখন আমার কী করা উচিত। এই অবস্থায় আমি কী করব, কোথায় যেতে পারি। সমস্ত চিন্তাভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত চেতনায় ঘন্টারোলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আজ তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। কিন্তু কখন কার্যকর হবে তারিখটি আমি জানিনে। একজন মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। আধো আলো আধো অন্ধকারে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না কে হতে পারে। গলার আওয়াজ শুনে বুঝলাম অর্চনা। তাকে কোনো জবাব দেবার আগে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, অর্চনা এখানে কেন? সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল এবং বলল, দানিয়েল তোমার হয়েছে কী? একটু আগে তুমি গাড়িচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ। আর তায়েবাদির এখানেও তুমি তিনদিন আসনি। তোমাকে এমন উদ্ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে কেন? আমি স্বগতোক্তির মতো করে বললাম, অর্চনা তায়েবার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোনদিন কার্যকর হবে তারিখটি জানিনে। কী সব অলক্ষুনে কথা বলছ তোমার মাথার কোনো ঠিক নেই। আমি বললাম, জান অর্চনা, আমাকে ড. মাইতি বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব বলেছেন। কী বলেছেন? বলেছেন কোনো আশা নেই। এখন শুধু খাঁচা ছেড়ে পাখির উড়াল দেয়া বাকি। অর্চনা বলল, দানিয়েল এই সময়ে তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুবই প্রয়োজন। তায়েবাদির মা খুবই ভেঙে পড়েছেন। আমার তো ভয় হচ্ছে। মহিলা কেমন জানি হয়ে গেছেন, যেখানে বসেন, বসে থাকেন, ওঠার কথা ভুলে যান। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। এই তিনদিন জল ছাড়া কিছুই মুখে দেননি। আমি জিগগেস করলাম, এসব তুমি জানলে কেমন করে? অর্চনা বলল, দানিয়েল তুমি বোকার মতো কথা বলছ। এই তিনদিন আমি দুবেলা তায়েবাদিকে দেখতে এসেছি। যখন বাড়াবাড়িটা শুরু হল সকলে তো ভয়েই অস্থির। ভাগ্যিস মনীষদা কলকাতায় ছিলেন। পি.জি.-র ডিরেক্টর তাঁর বন্ধু এবং একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। তাঁকে ধরে কোনোরকমে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাবার সুযোগটা পাওয়া গিয়েছিল। আপাতত তায়েবাদি বিপদমুক্ত। কিন্তু এটা স্থায়ী কিছু না। লুকোছাপা করে তো লাভ নেই। ক্যান্সারের রোগীর শেষ পরিণতি তোমরাও তো অজানা থাকার কথা নয়। আরেকটা দরকারি কথা বলি মনে রাখবে। এখন তায়েবাদিকে ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। খুবই ভালনারেবল অবস্থা। সকলকে বলতে শুনলাম, তোমাকে

দেখলে তায়েবাদি ভয়ংকর আপসেট হয়ে পড়েন। সুতরাং তুমি হুট করে কেবিনে ঢুকে পড়ার আগে একটু খোঁজ খবর নিয়ো।

অর্চনার কথা শুনে হাজার দুঃখের মধ্যেও আমার কৌতুকবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি যে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, তায়েবার এই মৃত্যুর জন্য আমি একাই দায়ী। সকলে এই কথাটি বুঝে গিয়ে আমাকে সঠিক শনাক্ত করে ফেলেছে। আমি হো হো করে হেসে উঠতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। অর্চনা বললো, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আমি বললাম পাগল হয়ে যেতে পারলে ভালো হত। আর রাখো তোমার যত্তসব + ...। আমি বললাম অর্চনা এটা একটা চমৎকার নাটক, আমরা সকলে মিলে ঘটিয়ে তুলেছি। এখন শেষ অঙ্কে কী ঘটে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু আমি তোমাকে একটি সহজ কথা জিগগেস করব। জবাব দেবে? বলো তোমার সহজ কথাটা, যদি জানা থাকে জবাব দেব। আমি বললাম, আমি দেখতে পাচ্ছি এই নাটকে তুমিও একটা চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছ, এটা কী করে সম্ভব হল আমাকে বুঝিয়ে বলবে? দানিয়েল আসলে তুমি একটা সিনিক। সব ব্যাপারে ঠাট্টা করার স্বভাবটি তোমার মজ্জাগত। ঠিক বলছ অর্চনা ওই সিনিসিজমটা এখনো আমার মধ্যে আছে বলেই হাঁটাচলা করতে পারছি। কিন্তু সেটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। তখন অর্চনা বলল, তুমি সত্যি একটা অদ্ভুত মানুষ। তবু তোমার একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে, সেকথা আমি অস্বীকার করব না, তোমার আর তায়েবাদির সম্পর্কের একটি ইন্টারেস্টিং দিক আছে। সেটাই আমাকে ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল গোড়ার দিকে। তুমি যখন কোনোকিছু গম্ভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাক, কখন জান না নিজেই সে জিনিসটির অংশ হয়ে গেছ। এই ব্যাপারটা অল্প বিস্তর আমার ক্ষেত্রেও ঘটে যাচ্ছে। এমনিতে আমি রোগী-টোগী দেখতে পারিনে। কিন্তু তায়েবাদির মধ্যে আমি অন্যরকম একটা কিছু দেখেছিলাম, যা সচরাচর দেখা যায় না। সেটাই আমাকে টেনেছিল। তুমি যাই বল দানিয়েল তায়েবাদি একটা অসাধারণ মেয়ে। এমন আশ্চর্য হৃদয়ের মহিলা জীবনে আর একটিও দেখিনি। তায়েবাদিকে দেখলে ভালোবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়। আমি বললাম, অর্চনা সেসব কথা থাকুক। আমি এসব আর সহ্য করতে পারছিনে, তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে? সে এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল। তারপর ঘড়ি দেখল। তুমি একথা বলে খুবই ভালো করেছে। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম আজকে মহানগর নারী সংঘ রবীন্দ্রসদনে তোমাদের ঢাকার বীরাঙ্গনা শহীদ রওশন আরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রওশনআরা রজনী উদ্‌যাপন করছে। আমার মেজদি মহানগর নারী সংঘের একজন নেত্রী। তিনি আমাকে দুখানা টিকিট দিয়েছিলেন। সেগুলো ব্যাগের মধ্যেই পড়ে আছে। এখন মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে। চলো ওই তো রবীন্দ্রসদন। বড়জোর পাঁচ মিনিট। আমি ক্লান্ত ছিলাম, কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। অর্চনার পেছন পেছন রবীন্দ্রসদনে এসে হাজির হলাম।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে দশ পনেরো মিনিট আগে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয়া উপাচার্যার (নামটা মনে আসছে না) উদ্বোধনী ভাষণটি শোনা হয়নি। আমরা যখন প্রবেশ করলাম রওশন আরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কলকাতার একজন গুণী শিল্পী একটি গান পরিবেশন করছিলেন। গানের কথাগুলো ভারি সুন্দর। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে গাইছিলেন।

"শহীদ লক্ষ ভাই ভগিনী শহীদ রোশেনারা
তোমরাতো সব প্রাণের আগুন চোখের ধ্রুবতারা
রোশোনারা বোনটি আমার কোন গাঁয়ে যে ছিল তোমার ঘর
সেথায় কি আজ বুটের তলে আকাশ বাতাস রৌদ্রজলে
ধুধু করে পদ্মা নদীর চর।"

শিল্পীর কণ্ঠে গানটি যেই শেষ হল, এই বীরাঙ্গনা তরুণীর স্মৃতির প্রতি অপার সমবেদনায় উপস্থিত দর্শকদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এই কল্পকন্যাটির প্রতি মমতায় আমার মনটাও মেদুর হয়ে উঠল। গানের পর কলকাতার সবচেয়ে খ্যাতিমান আবৃত্তিকার বিখ্যাত কবি এবং সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর সুললিত ছন্দে লেখা একটি সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করলেন। তারপরে একজন মাঝবয়েসী মহিলা মঞ্চে এলেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে রওশন আরা সম্পর্কিত এ পর্যন্ত যেসব সংবাদ তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, একটা লিখিত বিবরণ পাঠ করলেন। রওশন আরার বাড়ি রাজশাহী জেলার নাটোর। তার বাবা পেশায় একজন পুলিশ অফিসার। এবং সম্পর্কে সে ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়া। পড়াশোনা করত ঢাকার ইডেন কলেজে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন পঁচিশে মার্চ তারিখে ঘুমন্ত ঢাকা নগরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, সে তখন নাটোরেই ছিল। তারপর উত্তরবঙ্গে যখন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়, রওশন আরা একক প্রচেষ্টায় একটি মহিলা ব্রিগেড গঠন করে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি কাজ করতে থাকে। এক রাতে ঘর্ঘর বিকট আওয়াজ শুনে রওশন আরার ঘুম ভেঙে যায়। সে তার গুপ্ত আস্তানার মহিলা কর্মীদের জাগিয়ে তোলে। সর্বনাশ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহীর দিকে এগিয়ে আসছে। এখন যদি কোনোরকম বাধা না দেয়া যায়, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রতিরোধ সংগ্রাম তছনছ হয়ে যাবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা একজন মুক্তিসেনাকেও জীবিত থাকতে দেবে না। ট্যাঙ্কের গতি কীভাবে রোধ করা যায়। মহিলা ব্রিগেডের কর্মীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। তারপর রওশন আরা এগিয়ে এসে সাথি মহিলাদের উদ্দেশে বলল, পাকিস্তানি ট্যাঙ্কের গতি কী করে থামিয়ে দিতে হয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মাথার ওড়নাটা খুলে নিয়ে ভালো করে বুকের সঙ্গে তিনটা মাইন শক্ত করে বেঁধে নিল। সাথি মহিলারা অবাক দৃষ্টিতে রওশন আরার কার্যকলাপ দেখতে থাকে। কারো মুখে একটিও শব্দ নেই। প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলে, তার প্রাণের বান্ধবী শিরিনকে জড়িয়ে ধরে বলল, শিরিন আমার মাকে বলিস। মুহূর্তের জন্য তার দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। পরক্ষণেই সামলে গিয়ে একমিনিট চুপ করে কী যেন ভেবেছিল। তারপর প্রাণপণ চিৎকারে জয় বাংলা ধ্বনি উচ্চারণ করে, সারা শরীর, ট্যাঙ্কের তলায় ছুড়ে দিয়েছিল।

এটুকু পর্যন্ত পাঠ করার পর হলের মধ্যে আহা উহু আফসোস ধ্বনি শোনা যেতে থাকল কোনো কোনো মহিলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠলেন। শোকের মাতম থিতিয়ে আসতে কমসে কম পাঁচ মিনিট সময় লেগে গেল। যিনি পাঠ করছিলেন, ধৈর্য ধরে সে সময়টুকু অপেক্ষা করলেন। ধীরে ধীরে হল শান্ত হয়ে এলে মহিলা জানালেন, সে রাত্রে রওশন আরা একটি ট্যাঙ্ক পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছিল। ট্যাঙ্কে যে তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাদের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদন

পাঠিকা ভদ্রমহিলা একেবারে শেষ পর্যায়ে জানালেন, রওশন আরার ছিন্নবিচ্ছিন্ন সালোয়ার কামিজের রক্তরঞ্জিত অংশগুলো উদ্ধার করে মহিলা ব্রিগেড তাদের পতাকা বানিয়েছে। বিদেয় নেয়ার আগে মহিলা ডান হাতের মুঠি ঊর্ধ্বে তুলে উচ্চারণ করলেন জয়বাংলা। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে জয়বাংলা, জয়বাংলা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

তারপর এলেন আরো এক মহিলা। তিনি এপর্যন্ত ভারতবর্ষের নারীসমাজ রওশন আরার আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তার একটা আনুষ্ঠানিক বিবরণ দাখিল করলেন। দিল্লিতে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বে একটি রওশন আরা ব্রিগেড গঠিত হয়েছে। তাঁরা পায়ে হেঁটে আগ্রা অবধি মার্চ করে গেছেন এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। পাটনায় রওশন আরা ব্রিগেডের কর্মীরা নিজের হাতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আড়াই হাজার উলের সুয়েটার বুনে দিয়েছে। এইভাবে এলাহাবাদ, বেনারস, জলন্ধর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, দিল্লির রওশন আরা ব্রিগেডের কর্মীদের বিস্তারিত কর্মসূচির বর্ণনা দিলেন। খোদ কলকাতা শহরে রওশান আরার নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বুঝলাম রওশান আরা নামটি সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে ভারতীয় নারীসমাজে উদ্দীপনার একটি শিখা হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছে। যে মেয়ে নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বুকে মাইন বেঁধে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিয়ে দুনিয়ার নারীসমাজে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তার নামে কিছু করতে পারাটা নারীজন্মের এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার, একথা কে অস্বীকার করবে।

তারপর যখন ঘোষিকা জানালেন, এখন কলকাতার একটি নামকরা নাট্য প্রতিষ্ঠান রওশন আরার আত্মদানের ঘটনাটি অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করবে। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। আমি পাশে বসা অর্চনাকে কানে কানে জানালাম, আমাকে এবার যেতে হবে। অর্চনা বলল, চলে যাবে? আমি বললাম, ভীষণ খারাপ লাগছে। সে বলল, যাও, আমি মেজদির সঙ্গে যাব।

যখন রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে এলাম, প্রায় দশটা বেজে গেছে। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও একা একা হাঁটতে থাকলাম। সমগ্র ভারতে রওশন আরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম থেকে এইরকম রওশন আরার মতো বীরকন্যা যদি সত্যি সত্যি জন্ম নিত, তা হলে আমাদের সংগ্রামের অবস্থা কী দাঁড়াত মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। আমার বন্ধু আগরতলার অধ্যাপক বিজন চৌধুরীর ছোট ভাই বিকচ চৌধুরীর তেজোদীপ্ত চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিকচের প্রকাণ্ড কল্পনা করার ক্ষমতা সঠিক খাতে প্রবাহিত হলে ও উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে কী অঘটনই না ঘটিয়ে তুলতে পারত। আগরতলা এম. বি. বি. কলেজের গ্র্যাজুয়েট বিকচ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভৌমিক চৌধুরীর জেন্টস পকেট রুমালের মতো দৈনিক পত্রিকাটিতে উর্বরা কল্পনাশক্তিপ্রসূত নতুন নতুন কল্পকাহিনীর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এখনো।

আমার এখনো সে সন্ধেটির কথা মনে আছে। সারাদিন খুব বিষ্টি ছিল। বিকচ প্রতিদিন সীমান্তে যেয়ে এটা সেটা সংবাদ এনে পেছনের চারটি কলাম ভরাট করত।

বিকচের মতো মানুষেরও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য আগরতলা সীমান্তে যেতে হত। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারণ বিকচ নিউজপ্রিন্টের প্যাড নিয়ে বসলেই গানবোট ডুবত, কনভয়ের পর কনভয় সৈন্য ধ্বংস হয়ে যেত; ট্রেন লাইন উড়ে যেত। তথাপি বিকচ সাইকেলটাতে প্যাডেল ঘুরিয়ে সীমান্ত অবধি যেত, কারণ প্রতিদিন যেতে যেতে ওটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিকচ তার ছোট্ট পত্রিকার পাতায় এত সৈন্য মেরেছে, এত ট্যাঙ্ক ছারখার করেছে, এত কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার বন্দি করেছে, আগরতলার মানুষ তার মারণক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে পাকিস্তানি সৈন্যের যম টাইটেল দিয়েছে। এপ্রিলের শেষের বৃষ্টিমুখর দিনটিতে, আধভেজা অবস্থায় অফিসে এসে দেয়ালে সাইকেলটি ঠেকিয়েই ঘোষণা দিয়ে বলল, এ বিষ্টিতে কোথাও যেতেটেতে পারব না। ধ্যাননেত্রে আগে একটু দেখে নিই বাংলাদেশে আবার নতুন কী ঘটল। হাতের সিগারেটটি আমাকে দিয়ে বলল, ততক্ষণে তুমি এটা টানতে থাকো। আমি একটু চোখ বুজে দেখি। সত্যি সত্যি কয়েক মিনিট চোখ বুজে রইল। চোখ খুলে আমাকে জিগগেস করল, সিগারেট কি সত্যি সত্যি শেষ করে ফেলেছ। আমি বললাম, তুমি সবটা পুড়িয়েই আমাকে দিয়েছিলে, একটান দিতেই সব শেষ। যাও দিপুকে দিয়ে মনার দোকান থেকে আমার নাম করে পাঁচটা চারমিনার আনতে বলো। সিগারেট এলে একটাতে অগ্নিসংযোগ করে লম্বা লম্বা কটা টান মেরে, নিউজপ্রিন্টের প্যাডে পুরো খবরটা সে রচনা করেছিল। বয়ান এরকম : ফুলজান নাম্নী এক যুবতী বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি সৈন্যের একটা আস্ত ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখিয়ে বলল, দেখো তো খবরটা কেমন হয়েছে। আমি বললাম, দ্যা আইডিয়া ইজ গ্র্যান্ড। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এরকম একটা বীরকন্যা জন্মাতে পারলে খুব ভালো হয়। বিকচ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল আমরা যদি না লিখি তা হলে জন্মাবে কেমন করে। 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে'। সে বাঁ চোখটা টিপে একটু হেসেছিল। আমি বললাম যে এক্ষেত্রে একটা সেকেন্ড থট দিতে হবে।

যে কোনো সংবাদ কী, কেন, কোথায়, কখন, কীভাবে এই এতগুলো কেনর জবাব দিতে না পারলে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। তোমার গল্প সেই শর্তগুলো পূরণ করেনি। ধরো নাম নির্বাচনের বিষয়টি। তুমি বলেছ ফুলজান। এই নামটি একেবারেই চলতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের নাম সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই ফুলজান শব্দটি তোমার কলমের মুখে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে ফুলজান যাদের নাম, তারা বড়জোর হাঁড়িপাতিল ঘষে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিতে পারে না। সুতরাং একটা যুতসই নাম দাও, যাতে শুনলে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগবে। রওশন আরা নামটি মন্দ কী। বঙ্কিম এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন। নামের তো একটি মাহাত্ম্য আছেই। রওশান আরা নাম যে মেয়ের সে যেমন হৃদয়াবেগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জয়সিংদের ভালো বাসতে পারে; তেমনি দেশ জননীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতিও দিতে পারে। নামটা মনে ধরেছিল বিকচের। তারপর গল্পের নিয়মেই বাকি ব্যাপারগুলো বেরিয়ে এসেছিল। তার বাড়ি নাটোর। তার বাবা পুলিশ অফিসার। সে ইডেনে পড়ত এবং শেখ মুজিবের আত্মীয়া ইত্যাদি। বিকচ যদি রওশন আরার বাবার মর্যাদা পায় আমাকে কাকা টাকা কিছু একটা বলতেই হবে।

সংবাদটি সামনের পাতায় বক্স করে আগরতলার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভৌমিক চৌধুরীর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আগরতলার মানুষ এটাকেও আরেকটা বিকচীয় উদ্ভাবন ধরে নিয়েছিলেন। কেউ হ্যাঁচ্চোটিও করেননি।

মাসখানেক বাদে আমি যখন কলকাতায় এলাম অবাক হয়ে লক্ষ করলাম এই কলকাতা শহরে বিকচের কল্পকন্যাটির নবজন্ম ঘটে গেছে। আকাশবাণীর দেবদুলাল বাবুর কল্যাণে রওশন আরার পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রওশন আরার আত্মীয় স্বজনরা রেডিয়োতে সাজানো সাক্ষাৎকার দিতে আরম্ভ করেছেন।

তার পর থেকে ভারতের পত্রপত্রিকাসমূহ রওশন আরাকে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। আনন্দবাজার যদি হেডলাইন করে, যুগান্তর ছাপাচ্ছে জীবনবৃত্তান্ত। অমৃত-বাজার উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করছে। মিতভাষী বলে স্টেটসম্যানের সুনাম আছে। এই সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রটি সম্পাদকীয় কলামে রওশন আরার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিল। পত্রপত্রিকার প্রচার একটু থিতিয়ে এলেই রওশন আরাকে নিয়ে কবি মশায়েরা কবিতা লিখতে এলেন। শিল্পীরা গান গাইতে থাকলেন। নাট্যদল নাটক করতে এগিয়ে এল। প্রথম প্রথম ওসব দেখে আমার ভীষণ মজা লাগত। যুদ্ধের প্রথম বলিই তো সত্য। কিন্তু আমি বা বিকচ ইচ্ছে করলেই রওশন আরাকে আবার নিরস্তিত্ব করতে পারিনে। আমরা যদি হলপ করেও বলি, না, ঘটনাটি সত্যি নয়, রওশন আরা বলতে কেউ নেই, সবটাই আমাদের কল্পনা—লোকজন আমাদের পাকিস্তানি স্পাই আখ্যা দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য ছুটে আসবে। এই সময়ের মধ্যে রওশন আরার ভীষণ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। সি.পি.আই..যদি করে রওশন আরা দিবস, কংগ্রেস পালন করছে রওশন আরা রজনী। আমাদের কী ক্ষমতা রওশন আরার অস্তিত্ব ধ্বংস করি।

আজকে ওই রওশন আরার ওপর অনুষ্ঠানটি দেখার পর আমার মনে একটা চোট লাগল। তায়েবা ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় আসাদ হত্যার দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পত্রপত্রিকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সবগুলো কাগজে পুরোপৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। আজ সে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুনছে আর অলীক রওশন আরার ভাবমূর্তি ভারতীয় জনমনে অক্ষয় আসন দখল করে আছে। হায়রে তায়েবা তোমার জন্য অশ্রু। হায়রে বাংলাদেশ তোমার জন্য বেদনা। কেন এরকম ভাবলাম বলতে পারব না। হয়তো ভাবলাম, একারণে যে যার অস্তিত্ব কস্মিনকালেও ছিল না, সেই রওশন আরার ভাবমূর্তি আকাশপ্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে। আর তায়েবা, একসময়ে যে বাংলাদেশে সংগ্রামের উষ্ণ নিশ্বাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, আজ কলকাতার হাসপাতালে সকলের অগোচরে মারা যাচ্ছে।

১৪

তায়েবার কথা প্রায় শেষ। একটি নারী দিনে দিনে নীরবে নিভৃতে কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে একটি কেবিনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা জানতাম সে মারা যাবেই। মারা যাবার জন্যই সে কলকাতা এসেছে। যুদ্ধ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, আর তায়েবাকে এখানে

রেখে যেতে হবে। তায়েবা অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল। স্বাভাবিক মানুষ যেমন করে জীবনের কর্তব্যগুলো পালন করার জন্য নিতান্ত সহজভাবে সংকল্প গ্রহণ করে, সেও তেমন আসন্ন মৃত্যুর কাছে মন প্রাণ সবকিছু সমর্পণ করে প্রতীক্ষা করছিল।

তায়েবার প্রাক মৃত্যুকালীন আনুষ্ঠানিকতা—অর্থাৎ একজন ক্যান্সার রোগীকে শেষ মুহূর্তে যে ধরনের চিকিৎসা করা হয়, ডাক্তারেরা করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তায়েবাকে একজন সাধারণ রোগীর চাইতে অধিক ভালোবাসতেন। তাই সকলে মিলে চেষ্টা করছিলেন, তার কষ্টটা যেন কম হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা হাজার চেষ্টা করেও তায়েবার কষ্ট কমাতে পারেনি। মৃত্যুর তিনদিন আগেই তাকে শুনতে হয়েছে, ফ্রি স্কুলের চাচার বাড়িতেই তার মা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছেন। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। যে বাড়ির মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে যৌবন ছিনে প্রাণপণ প্রয়াসে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আজ প্রায় দুযুগেরও বেশি পরে, সেই একই বাড়িতে তিনি একখণ্ড জড় পদার্থের মতো পড়ে আছেন।

ডিসেম্বরের চার তারিখ ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ঐদিন সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত গোটা কলকাতা শহরে বিমানহামলার ভয়ে কোনো আলো জ্বলেনি। সেই ব্ল্যাক আউটের রাতে তায়েবার কাছে কোনো ডাক্তার আসতে পারেনি। কোনো আত্মীয়স্বজন পাশে ছিল না। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে যে অন্ধকার কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে তায়েবা আত্মবিসর্জন করল।